বিশেষ সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ

আগস্ট-অক্টোবর, ২০১৮

স্বাস্থ্য পরিষেবা
সামগ্রিক উন্নয়নের হাত ধরে

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষের শুভ সূচনা

৬ জানুয়ারি, ২০১৪। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন করছেন, তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী গুলামনবি আজাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত আছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র

বর্ষ-৫১ সংখ্যা ৪-৬

আগস্ট-অক্টোবর ২০১৮

মূল্য : ৫০ টাকা

সূ • চি • প • ত্র

সম্পাদকীয় ৩

সংবাদ ৪

গান্ধীজির আদর্শে সম্প্রীতির বাঁধনে দেশকে এক করে রাখার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর ৪

গান্ধি ভবন, বেলেঘাটা ৬

সামগ্রিক উন্নয়নের হাত ধরে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ১২

গত সাত বছরে সামগ্রিক উন্নয়নের অঙ্গ হিসেবে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও। একদিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যেমন পাওয়া যাচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা, তেমনই অত্যাধুনিক চিকিৎসাও এখন হাতের মুঠোয়। একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষও আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত নন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ লেখায় এই সংখ্যাটি বিশেষভাবে সাজানো হল।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সামগ্রিক উন্নয়ন ও সুস্বাস্থ্য ১৪

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন জোয়ার ৩৪

ফটোফিচার: রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ৪২

সাত বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ৮৮

বিশেষ ক্রোড়পত্র

এসএসকেএম হাসপাতাল ১০৬

এসএসকেএম হাসপাতালের পরিচয় আজ শুধু ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি হাসপাতাল হিসেবেই নয়, রাজ্য তথা দেশের প্রথম সারির এই হাসপাতাল তথা গবেষণাকেন্দ্রে আধুনিকতম চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিতে এই দেশ ও প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে রোগীরা ছুটে আসেন প্রতিনিয়ত। এই হাসপাতালের বিবর্তনের ধারাবাহিকতার কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল এই ক্রোড়পত্রে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক
আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
সুপ্রিয়া রায়

সহ-সম্পাদক
রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য

বিশেষ কৃতজ্ঞতা :
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রথম প্রচ্ছদ পরিচিতি
গান্ধী জয়ন্তীতে বেলেঘাটার গান্ধীভবনে মুখ্যমন্ত্রী।

প্রচ্ছদ অলংকরণ- **সুরজিৎ পাল**

সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
বিতরণ শাখা, ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**

বিবর্তনের পথে পিজি হাসপাতাল ১০৬
রাজ্য জুড়ে নবজাতক পরিচর্যায় অত্যাধুনিক ব্যবস্থা: পথপ্রদর্শক পিজি হাসপাতাল ১১০
জন্মের পরেই নজর দিতে হবে শিশুর শ্রবণ সমস্যায় • *শাহীদুল আরেফিন* ১২০
কার্ডিও থোরাসিক সার্জারি: নতুন দিশা দেখাল পিজি হাসপাতাল ১২৬
গ্যাসট্রোএনটেরোলজি ও লিভারের চিকিৎসা ১৩০
ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পিজি-র পলিক্লিনিক, শুরু হচ্ছে লিভারের অত্যাধুনিক চিকিৎসা ১৩২
বাঙুর ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস ১৩৬
নতুন চেহারায় ফিরল রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতাল ১৩৮
মধুর স্নেহ ১৪২

বিশেষ প্রতিবেদন:

রাজ্যের স্টেট অব দ্য আর্ট, আরআইও-তে বিনামূল্যে চোখের সব ধরনের চিকিৎসা • *ডা. কে পি বৈদ্য* ১৪৪
সরকারি ডেন্টাল কলেজে উন্নত পরিষেবা ১৫২

ফিরে দেখা

ব্রেন ডেথ ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন:

ব্রেন ডেথ ও অঙ্গদান: জীবন মৃত্যুর মেলবন্ধন ১৫৪
মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে জীবনের জয়যাত্রা ১৬০
মস্তিস্ক মৃত্যু এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন ১৬৭

ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট ১৭৪

একগুচ্ছ প্রতিবেদন

মা ও শিশুর কল্যাণে বাংলা মাতৃপ্রকল্প ১৭৬
আপনি মা হতে চলেছেন? ১৮০
গর্ভবতী মহিলার দেহ থেকে সন্তানের দেহে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে বাংলা • *ডা. সুমন গাঙ্গুলি* ১৮২
সাপ্তাহিক আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সম্পূরণ প্রকল্প • *ডা. ভূষণ চক্রবর্তী* ১৮৪
গর্ভবতী মহিলাদের জন্য 'ওয়েটিং হাট' পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি উদ্ভাবনী পদক্ষেপ ১৮৮
আশা : স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সক্রিয় সেতু ১৯৬
ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট ১৯৮
খাদ্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ এবং পশ্চিমবঙ্গে FSSA আইন, ২০০৬ বলবৎকরণ ২০০
পশ্চিমবঙ্গে পুর স্বাস্থ্য মিশন ২০২
থ্যালাসেমিয়া : প্রয়োজন প্রতিরোধ ২০৬
সর্পাঘাত : প্রতিরোধ ও চিকিৎসা • *ডা. নিমাইচন্দ্র মণ্ডল* ২০৮

স • ম্পা • দ • কী • য়

সামগ্রিক উন্নয়নের গতিতে সম্ভব হচ্ছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতি

কোয়ালিটি লাইফ। কথার কথা নয় আর। বাঁচতে চাই বাঁচার মতো। এই স্বপ্নে মশগুল আজ রাজ্যের মানুষ। সঙ্গে আছে সরকার। ভালোভাবে বাঁচার সব রসদ নিয়ে হাজির।

বিনা পয়সায় সকলের জন্য উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে সরকার। দিচ্ছে নানা রকমের স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ। উদ্দেশ্য— রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্য ভালো হোক। রাজ্যের কর্মসংস্কৃতির হাল ফেরাতেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে 'স্বাস্থ্য'-র ক্ষেত্রটিকে উন্নত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষও পাচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট পরিষেবার সুযোগ। ঝাঁ-চকচকে সুপার বা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, বেসরকারি নার্সিংহোম-এ পা রাখতে পারছেন 'শিশুসাথী', 'স্বাস্থ্যসাথী'র কার্ড নিয়ে অথবা নানা স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ নিয়ে।

কোয়ালিটি লাইফ-এর ধারণা আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে কৃষকের কুটিরে, সমুদ্রপারের মৎসজীবীর ঝুপড়িতে, আবার ফ্ল্যাটবন্দি নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্তের ঘরে। সমতালে চলছে উন্নয়নের গতি। স্বাস্থ্য পরিষেবাও। সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে গতিতে কাজ চলছে রাজ্যবাসী তাতে উপকৃত হচ্ছেন। এইসব শুলুক-সন্ধান নিয়েই প্রকাশিত হল এই সংখ্যা।

আর থাকছে, ২ অক্টোবর ২০১৮ মহাত্মা গান্ধির জন্মদিনে তাঁর জন্ম সার্ধশতবর্ষের সূচনা উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের আগামী কর্মসূচির ঘোষণা ও অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

অনবধানবশত কোনও ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

গান্ধিজির আদর্শে সম্প্রীতির বাঁধনে দেশকে এক করে রাখার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

এক গভীর সংকট আর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দেশ চলছে। গান্ধিজির আদর্শ যাঁরা মেনে চলেন, তাঁরা প্রত্যেকে দেশের একতা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখতে এগিয়ে আসুন। দেশকে ভালো রাখার শপথ আজ সবাইকে নিতে হবে। সম্প্রীতির বাঁধনে দেশকে বেঁধে রাখতে হবে। মহাত্মা গান্ধির জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সূচনালগ্নে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। ২ অক্টোবর বেলেঘাটায়, গান্ধি জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এসে এভাবেই দেশকে এক করে রাখার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি বলেন, একদিকে দেশে বিমুদ্রাকরণের ফলে মানুষ সমস্যায় জর্জরিত। অন্যদিকে, পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের দাম হু-হু করে বাড়ছে। এই সময় সব থেকে বেশি প্রয়োজন, গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতৃত্বের। তবেই দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, বেলেঘাটায় গান্ধিজির স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করেছে

রাজ্য সরকার। গান্ধিভবন সংস্কারের জন্য ৩.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এখানে গান্ধি সংগ্রহশালা তৈরি হচ্ছে। গান্ধিজির নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন 'চেয়ার' রাখা হচ্ছে, তেমনি সেখানে তাঁর নামে চালু হচ্ছে 'মেধাবী বাঁচাও' বৃত্তি প্রকল্প। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মহাত্মা গান্ধির আত্মকাহিনি 'আমার জীবন কাহিনি' সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সাঁওতালি ভাষায় বইটির নাম ইঞাঃ জিয়ন কহৈনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধিয়ান স্টাডিজ সেন্টার থেকে প্রকাশিত বইটির অনুবাদক সত্যেশ্বর মুর্মু। এদিন গ্রন্থটি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন উপাচার্য সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, আগামী বছর ২ অক্টোবর গান্ধিস্মরণে 'ডান্ডিমার্চ' করা হবে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে প্রস্তাবিত মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, গান্ধিজি মানে সংহতি। গান্ধিজি মানে একতা। গান্ধিজি মানে সম্প্রীতি। গান্ধিজি মানে সকলকে নিয়ে চলা। গান্ধিজি হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন, তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে বাংলাও। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে, গান্ধিজি তখন বেলেঘাটার আশ্রমে। সেখান থেকেই সম্প্রীতির ডাক দিয়েছেন তিনি। আজ দেশের সমস্ত দলিত আদিবাসী-জৈন-হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রত্যেককে হাত ধরে এগিয়ে আসতে হবে। যদি কেউ সত্যিই গান্ধিজিকে শ্রদ্ধা করেন বলে দাবি করেন—তাঁর উচিত সর্বপ্রথম গান্ধিজির নীতি ও আদর্শকে মেনে চলা। সেজন্য মহাত্মা গান্ধির আদর্শকে সামনে রেখে সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ভাবনায় দেশকে বাঁধতেই হবে।

গান্ধি ভবন, বেলেঘাটা

গান্ধি ভবনের (হায়দারী মঞ্জিল), বেলেঘাটা বিবরণ:

- কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত ৩৪ নং ওয়ার্ডের অধীন
- জমির পরিমাণ – ১৫ কাঠা (আনুমানিক)
- গান্ধি ভবনের মধ্যে একতলায় ৩টি কামরা-বিশিষ্ট একটি ছোটো সংগ্রহালয় অবস্থিত।
- জন পরিসরে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, হায়দারী মঞ্জিল মূলত দাউদি বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের এক সদস্যের মালিকানাধীন ছিল। এই ব্যক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুরাট থেকে বাংলায় বাণিজ্যের সুবাদে আসেন। পরে এটি ‘গান্ধি ভবন’ নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে ভবনটি পূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে।

গান্ধি ভবনের গুরুত্ব

১৯৪৭ সালে যখন বেলেঘাটায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, গান্ধিজি চাইলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার কেন্দ্রে অবস্থান করতে। তিনি স্থির করেছিলেন মুসলমান-প্রধান এলাকার কোনও বাড়িতে থাকবেন। উঠে এল হায়দারী মঞ্জিল-এর নাম।

ইতিমধ্যে বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, অগ্নিসংযোগের ঘটনা, লুঠতরাজ ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

১২ আগস্ট বাপু কয়েকজন মাত্র অনুগামীকে নিয়ে বাড়িটিতে প্রবেশ করেন। স্বাধীনতা দিবসে বাড়িটিতে বাপু ছিলেন একাকী, অনশনরত ও মৌনী। যেহেতু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে

বাপু নিয়মিতভাবে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেহেতু বাপুর উপস্থিতিতে দাঙ্গার ভয়াবহতা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু ১ সেপ্টেম্বর আবার দাঙ্গার প্রাদুর্ভাব ঘটল। এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য গান্ধিজি 'সত্যাগ্রহ' শুরু করলেন। ৭৩ ঘণ্টা অনশনের পর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, হেমচন্দ্র নস্কর, এইচএস সুরাবর্দী, নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী, শরৎচন্দ্র বোস, বাংলার বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ এবং যুগলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে উভয় সম্প্রদায়ের স্থানীয় মানুষের লিখিত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে বাপু তাঁর অনশন প্রত্যাহার করেন। জাতির জনকের কাছে সাধারণ মানুষ তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭-এ মহাত্মা গান্ধি এই ভবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন যথাযথভাবেই গান্ধিকে বলেছেন,

‘একক সৈন্যবাহিনী’ (‘one man army’)।

বর্তমানে বাড়িটি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। ধাপগুলো মার্বেল দিয়ে বাঁধানো এবং মধ্যভাগের বড়ো হলঘরটিতে রয়েছে ১৯৪৬-৪৭ সালের কলকাতার সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা বিষয়ে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা দেওয়াল-চিত্র। পাশের ঘরগুলিতে আছে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বাংলার এবং হায়দারী মঞ্জিলে গান্ধিজির অবস্থান বিষয়ক বিভিন্ন বিরল আলোকচিত্র। দাঙ্গার বিবরণ সংবলিত সংবাদপত্রের ক্লিপিংস এবং গান্ধিজির চিঠিপত্রের প্রতিচিত্র সেখানে রাখা আছে। একটি ঘরের কাচে ঘেরা স্থানে মহাত্মার অবস্থানকালে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, যেমন—বিছানা, বিছানার চাদর, গদি, বালিশ, চটি, লণ্ঠন ও চরকা রাখা আছে।

প্রদর্শিত দুটি নির্দিষ্ট বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। একটি হল কাচের বাক্সে রাখা তিনটি তরবারি। এগুলি দাঙ্গাকারীরা গান্ধীজির পদপ্রান্তে সমর্পণ করেছিল। অপরটি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমর্থনে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালির একজন মুসলমান বালিকা কামারুন্নেসাকে গান্ধিজির বাংলায় লেখা চিঠির প্রতিচিত্র। রাজ্য সরকার, মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিরক্ষার্থে গান্ধি ভবনের সংস্কার সাধন ও

সেখানে গান্ধি সম্পর্কিত একটি আধুনিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মহাত্মা গান্ধির ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তাবিত কার্যসূচি

(১) গান্ধি ভবনের সংস্কার ও মানোন্নয়ন প্রকল্প এবং গান্ধি ভবনে গান্ধি মিউজিয়াম স্থাপন। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ৩.৩ কোটি টাকার ব্যয় সংবলিত (জীর্ণোদ্ধার বাবদ ১.৩ কোটি টাকা এবং মিউজিয়াম বাবদ ২ কোটি টাকা) একটি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) রচনা করেছে।

(২) গান্ধিজির নেতৃত্বাধীন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়কালে ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ থেকে ৮ আগস্ট, ১৯৪৪ পর্যন্ত বর্তমানের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে প্রতিষ্ঠিত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের কার্যকলাপ বিবেচনা করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধির ভূমিকা ও অবদান স্মরণে এবং বাংলায় স্বল্পস্থায়ী তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার গভীর প্রভাবের কথা মাথায় রেখে পূর্ব মেদিনীপুরে মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

(৩) রাজ্য সরকার ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটকে সাংস্কৃতিক পর্যটনের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘উৎস ধারা’ নামে একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কারসাধন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের কাজ হাতে নেবে। ৬টির বেশি সরকারি বিভাগ এই উন্নয়নের কাজে শামিল হবে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শহিদ মঙ্গল পান্ডে উদ্যান, ব্যারাকপুরের গান্ধি স্মৃতি সংগ্রহালয় প্রভৃতিও এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৪) তরুণ প্রজন্মকে গান্ধিজির আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে পরিচিত করে তোলার জন্য ব্যারাকপুরের গান্ধি ভবন ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে গান্ধিজির সর্বোত্তম প্রেরণাদায়ক উদ্ধৃতি/রচনা সমন্বিত ‘জাতির জনক’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে।

(৫) দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধিজির ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রেখে বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা, নাটক প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার মতো বিবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। মহাত্মা গান্ধির নামে একটি বৃত্তি/ভাতামূলক পরিকল্পও গ্রহণ করা হবে।

(৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে গান্ধিজির শান্তি ও অহিংসা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের নীতিসমূহের ওপর অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয় সাদৃশ্য বিশেষত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ঐক্যের বিষয়ে একদিকে মহাত্মা গান্ধির এবং স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ভারতের মহান সন্তানদের মধ্যে মত বিনিময়ের ক্ষেত্রগুলিকে তুলে ধরতে হবে। একই রকমভাবে রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি স্কুল ও তাদের অনুমোদনকারী বোর্ডগুলিকে গান্ধিজি, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে কিছু অধ্যায় প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হবে।

(৭) স্কুলের সিলেবাসে এই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে ২০১৯-এর শিক্ষাবর্ষ থেকে।

(৮) রাজ্য সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাত্মা গান্ধি নামাঙ্কিত একটি চেয়ার সৃষ্টি করবে যাতে গান্ধী-বিষয়ক প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ মহাত্মা গান্ধি-বিষয়ক পাঠদান ও গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন।

(৯) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাঁওতালি ভাষাতে 'মাই অটোবায়োগ্রাফি' প্রকাশ করবে।

(১০) নেপালি, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি ভাষায় অর্থাৎ যে সমস্ত ভাষায় বাংলার পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ কথা বলে এবং একই সঙ্গে অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাষায় গান্ধির গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ করা হবে।

(১১) প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চম্পারণ সত্যাগ্রহের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

(১২) সারা রাজ্যের যুব সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ রাজ্য/জেলা/ব্লকস্তরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধিজির অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরবে।

(১৩) নারী ও শিশু বিকাশ সমাজকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে কন্যাশ্রীর চলতি প্রচারে গান্ধিজির নারীজাতির স্বাধীনতা ও লিঙ্গ সমতার প্রতি উদার আহ্বানের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরতে হবে।

(১৪) অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণি, দলিত, হরিজন কুষ্ঠরোগীদের উন্নয়নের বিষয়ে গান্ধিজির অবদান স্মরণে রেখে সেই পথে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

(১৫) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ গান্ধিজি সংক্রান্ত এযাবৎ অপ্রকাশিত নথি/প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করে বেলেঘাটা গান্ধি ভবনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। এছাড়াও লোকপ্রসার প্রকল্পের অধীনে শিল্পীগণ তাঁদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গান্ধিজির অনন্যসাধারণ অবদান তুলে ধরবেন ও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন।

বিশেষ স্বাস্থ্য সংখ্যা

সামগ্রিক উন্নয়নের হাত ধরে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে গত সাত বছরে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রত্যন্ত ও দুর্গমতম স্থানে, দরিদ্রতম মানুষ, নারী ও শিশু এবং প্রবীণ মানুষদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ঢেলে সাজান হচ্ছে স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো। স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিখরচায় অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ পাচ্ছেন রাজ্যের সব মানুষ। চালু হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ সরকারি প্রকল্প। চালু হয়েছে স্বাস্থ্যবিমার নানা কর্মসূচি।

উল্লেখ্য, জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সামনে রেখে রাজ্যের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গত সাত বছর ধরে। সামগ্রিক উন্নয়নের হাত ধরে উন্নত হচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্র।

বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে সাজিয়ে তোলা হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক এই সংখ্যা। এসএসকেএম হাসপাতাল-এর কয়েকটি বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও পদক্ষেপ নিয়ে প্রকাশিত হল একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র।

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিশেষ সহযোগিতা ও পরামর্শে সংখ্যাটি প্রস্তুত করা হয়। এই বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত কয়েকটি প্রতিবেদনের পাশাপাশি ওই বিভাগের মুখপত্র 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' থেকে কয়েকটি তথ্যবহুল প্রতিবেদনও পুনর্মুদ্রিত হল।

সামগ্রিক উন্নয়ন ও সুস্বাস্থ্য

রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্য তথা সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে কতটা জোর দিয়েছে সেটি খুব স্পষ্টভাবে দেখানো যায়। গত সাত বছরে বর্তমান সরকার উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নিয়েছে। সমন্বয়ের উদ্যোগ। সামগ্রিক উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্য-বিষয়ক পরিকল্পনা বা প্রকল্পগুলির সাফল্য কখনই উল্লেখযোগ্য হতে পারে না।

আজ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকার যে গতিতে উন্নয়ন ঘটাতে পারছে, সেটির মূল কারণ বহুমুখী পরিকল্পনাগুলিকে একমুখী লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া ও সময়ভিত্তিক রূপায়ণে কড়া নজরদারি।

প্রতিটি ক্ষেত্রে মেলবন্ধনের ফলেই উন্নয়ন আজ চাক্ষুষ হচ্ছে।

রাজ্যে এক বিরাট সংখ্যক মানুষের আয় কম। অনেক মানুষের আয়ের সুযোগও ছিল না। নানা প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আয়-সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

এই কম আয় ও দরিদ্র মানুষ রাজ্যের সম্পদ। এদের এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সুপরিকল্পিতভাবে, একমুখী লক্ষ্যে যে কাজ গত সাত বছরে করা হয়েছে, তার ফলে এই মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রটি সার্বিকভাবে কিছুটা এগিয়েছে।

আমাদের রাজ্যটি ছোটো। কিন্তু জনসংখ্যার নিরিখে ভারতে চতুর্থ স্থানে বসে আছে। সবদিক থেকেই বৈচিত্র্যময়। ভূপ্রকৃতি, জনজাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা, সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, সামাজিক অবস্থান, মানসিক ও দৈহিক গঠন, পেশা বা কর্মবিন্যাস, সর্বোপরি বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক ধারা।

২০১১ সালে বর্তমান সরকার আসার আগে উন্নয়নের বিকেন্দ্রায়িত পরিকল্পনার ভাবনা ও কাজ এভাবে দেখা যায়নি। এই পরিকল্পনা-ভাবনার ছন্দটি একেবারেই নতুন যা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের উপস্থিতিতে ও তদারকিতে রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অঞ্চলে উন্নয়নের কাজকে গতি ও সাফল্য এনে দিচ্ছেন। দ্বিধাহীনভাবে তিনি হয়ে উঠতে পারছেন সমালোচনা-মুখর।

রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্তরে বিপুল কর্মীবাহিনী এই উন্নয়নের যজ্ঞে সংযুক্ত আছেন, অত্যন্ত দৃঢ় নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি তাঁদের সদর্থকভাবে পরিচালিত করতে পারছেন।

উন্নয়নের কাজে মুখ্যমন্ত্রী মানুষের মাঝে

‘আজ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকার যে গতিতে উন্নয়ন ঘটাতে পারছে, সেটির মূল কারণ বহুমুখী পরিকল্পনাগুলিকে একমুখী লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া ও সময়ভিত্তিক রূপায়ণে কড়া নজরদারি।’

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-নির্ভর রাজ্য। রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত। কৃষকের আয় বেড়েছে। কৃষকদের বার্ষিক গড় পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণেরও বেশি। কৃষিজমিতে খাজনা ও মিউটেশন ফি সম্পূর্ণ মকুব করা হয়েছে। ৬৯ লক্ষ কৃষককে কিষান ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে। 'বাংলা ফসলবিমা যোজনা'-য় প্রায় ১ লক্ষ কৃষককে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে বার্ধক্যভাতা দেওয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষিজ উৎপাদন। আধুনিক কৃষি গবেষণার সুফল বাংলার কৃষিক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানোর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিকে কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে জৈব কৃষির উপরও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বহুল ব্যবহারে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত, উদ্‌গ্রীব। সরকারি পরিকল্পনাতেও বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে, রাজ্য জুড়ে জৈব কৃষি খামার, জৈব কৃষির প্রদর্শন ক্ষেত্র, জৈব কৃষিজাত পণ্যের সুনির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি হচ্ছে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা নানা ধরনের কৃষিজাত খাদ্যের উপর নির্ভর করি।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রধান খাদ্য ভাত, যা ধান থেকে উৎপন্ন হয়। বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ঐতিহ্যশালী নানা ধরনের ধানের চাষ হত। রাজ্যের ধান-গবেষকরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেইসব ধান-চাষকে উৎসাহিত করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে সেই ধান থেকে প্রস্তুত চাল আমাদের বিদেশি মুদ্রাও এনে দিচ্ছে।

রাজ্য কোন্ ধরনের চাল কতটা উৎপন্ন করবে সেই ব্যাপারেও কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। বর্তমান সরকার স্বচ্ছল ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী সরু চাল যা অন্য জায়গা থেকে এখানে আমদানি করা হত এতদিন, সেই দামি সরু চাল রাজ্যেই উৎপাদন করছে। কৃষকেরা এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন। আগের থেকে বেশি লাভ পাচ্ছেন। ফলে কৃষকেরা লাভজনক চাষের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শিখেছেন। বংশপরম্পরায় গতানুগতিক চাষবাসের কাজটিকে তাঁরা অন্য মাত্রা যুক্ত করছেন। তাঁদের মানসিকতার এই যে পরিবর্তন তার মূলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ আছে।

আজকের কৃষক-প্রজন্ম অনেকটাই শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত, তথ্য-সন্ধানী। তার সঙ্গে রয়েছে সর্বস্তরে সরকারের সহযোগিতা এবং রাজ্যজুড়ে কৃষি ও অন্যান্য বিভাগের কর্মী, গবেষক, আধিকারিকদের নিরলস প্রয়াস।

রাজ্যে কৃষি-অর্থনীতির এই সাফল্য রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

একসময় এই রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল অপচয় হত। চাহিদা-ভিত্তিক ধান উৎপাদনের বিষয়টি ছিল অবহেলিত। ফলে চাহিদার তুলনায় ধানের উৎপাদন বেশি হওয়ায় অবিক্রিত চালের পরিমাণ বেড়ে যেত। কৃষক হত ক্ষতিগ্রস্ত।

বর্তমানে সরু চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে সরকার ভরতুকি দিয়ে চাল কিনে রাজ্যবাসীর খাদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। ফলে অপচয় বন্ধ হয়েছে। অনাহার-ক্লিষ্ট মানুষকে ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হচ্ছে খাদ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে।

'খাদ্যসাথী' প্রকল্প রাজ্যকে দু-ভাবে উপকৃত করে চলেছে। কৃষক ধান, চাল বিক্রি করে ন্যায্য পয়সা পাচ্ছে। ধানের অভাবী বিক্রি বন্ধ করে সরকার নিজে তা কিনে নিচ্ছে।

অন্যদিকে মানুষদের কাছে স্বল্পমূল্যে চাল পৌঁছে দিয়ে সরকার এক বিরাট সংখ্যক রাজ্যবাসীর খিদের মুখে দুটো খাবারের ব্যবস্থা করেছে। বাজার-দরের চেয়ে অনেক কমে, ন্যূনতম মূল্যে এই খাদ্যের ব্যবস্থা হওয়ায় তাদের 'আসল আয়' (real income) বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দরিদ্র মানুষের পাশে গিয়ে দাড়াচ্ছে সরকার। তবে, মনে রাখা দরকার, শুধু দু-মুঠো অন্নেই 'স্বাস্থ্য' রাখা যায় না।

সরকার এই ব্যাপারেও উদ্যোগী। ধান, গমের পাশাপাশি সবজি ও উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মাছ, ডিম, মুরগি, ছাগল, দুধ উৎপাদনেও এই সাত বছরে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। সারা বছর চাষের জন্য 'জল সঞ্চয়'-এর ভাবনা রূপ পেয়েছে জলতীর্থ, জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের মাধ্যমে। ১০০ দিনের প্রকল্পের উপর যথাযথ ব্যবহারের ফলে এইসব প্রকল্পের কাজে গতি এসেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে এই উন্নয়নের সঠিক চিত্র।

সাত বছরে

কৃষিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- **ভারত সরকার রাজ্যকে পরপর পাঁচ বছর 'কৃষি কর্মণ' পুরস্কারে ভূষিত করেছে, যা রাজ্যের রেকর্ড —**
  - **ডাল উৎপাদনের জন্য (২০১১-১২ ও ২০১৫-১৬-তে)**
  - **মোট খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য (২০১২-১৩-তে)**
  - **মোট দানা শস্য উৎপাদনের জন্য (২০১৩-১৪-তে)**
  - **তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য (২০১৪-১৫)-খাদ্যশস্য উৎপাদনে ধারণযোগ্য বৃদ্ধির পর**
- **কৃষকের আয় :**
  - বাজারের চাহিদা কেন্দ্রিক উৎপাদন ও কৃষিকার্যে উত্তম ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে **বাংলার কৃষকের বার্ষিক পারিবারিক আয় ২০১০-১১-এর ৯১০০০ টাকা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮-তে ২,৯০,০০০ টাকা হয়েছে।**
  - ২০১২ সাল থেকে বিভিন্ন পরিকল্পে কিষান ক্রেডিট কার্ড/কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ভরতুকি হস্তান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- **ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি :**
  - **২০১৭-১৮ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৯৭.৯ লক্ষ মেট্রিক টন। তুলনায় ২০১০-১১ সালে এটি ছিল ১৪৮.১ লক্ষ মেট্রিক টন।** গত ৭ বছরে (২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮-তৃতীয় আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী) বার্ষিক গড় উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭২.৪ লক্ষ মেট্রিক টন। পূর্ববর্তী ৭ বছরে (২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১১) যা ছিল ১৫৮.২ লক্ষ মেট্রিক টন।
  - **ভারতের মধ্যে চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। ২০১০-১১-তে ১৩৩.৯ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় ২০১৭-১৮-তে মোট চাল উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ১৫৮.৯ লক্ষ মেট্রিক টন।** গত সাত বছরে (২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮) বার্ষিক গড় উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ১৫৪.৮ লক্ষ মেট্রিক টন। তুলনায় তার পূর্ববর্তী ৭ বছরে (২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১১) যেটি ছিল ১৪৫.২ লক্ষ মেট্রিক টন।
  - **পোল্ট্রির ও মাছের খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ২০১৭-১৮ সালে ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩.৩ লক্ষ্যে মেট্রিক টন, তুলনায় ২০১০-১১-তে এটি ছিল ৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন।** গত সাত বছরে (২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮) বার্ষিক গড় উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৬.৯ লক্ষ মেট্রিক টন। তুলনায় তার পূর্ববর্তী ৭ বছরে (২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১১) যেটি ছিল ২.৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

- **২০১০-১১-তে ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় ২০১৭-১৮ তে ডাল উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৪.৪ লক্ষ মেট্রিক টন।** গত সাত বছরে (২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮) বার্ষিক গড় উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন। তুলনায় তার পূর্ববর্তী ৭ বছরে (২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১১) যেটি ছিল ১.৬ লক্ষ মেট্রিক টন।
- **২০১০-১১-তে ৭.০ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় ২০১৭-১৮ তে তৈলবীজ উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ১০.৫ লক্ষ মেট্রিক টন।** গত সাত বছরে (২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮) বার্ষিক গড় উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৮.৭ লক্ষ মেট্রিক টন। তুলনায় তার পূর্ববর্তী ৭ বছরে (২০০৪-০৫ থেকে ২০১০-১১) যেটি ছিল ৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

উদ্যান পালন

- প্রায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি সমেত উদ্যানজাত ফসলের (ফল, সবজি, ফুল, মশলা ও বাগিচা ফসল) এলাকা ২০১০-১১-র ১৩,০৫,৩৩৯ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮-য় ১৪,৩৬,০২৩ হেক্টরে পৌঁছেছে।
- প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি সমেত উদ্যানজাত ফসলের (ফল, সবজি, ফুল, মশলা) উৎপাদন ২০১০-১১-র ১৭১,০৭,৪৭২ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮-য় ১৯০,০৮,৬৫০ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।
- উচ্চ খাদ্যগুণ সম্পন্ন, বিদেশজাত ও উচ্চমূল্যের সবজি যথা চিনা বাঁধাকপি, পাকচই, টেবল র‍্যাডিশ, সেলেরি, ব্রাসেলস স্প্রাউট, চেরি টমেটো, রঙিন ক্যাপসিকাম, ফেনেল প্রভৃতি সফলভাবে বাজারজাত হয়েছে এবং ব্রকোলি, লাল বাঁধাকপি, লেটুস ইত্যাদির ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- খারিফ পেঁয়াজ চাষ ২০১২-২০১৩ থেকে শুরু করা হয়েছে এবং পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হয়েছে। খারিফ পেঁয়াজের বীজ, যা আগে মহারাষ্ট্রে উৎপন্ন হত, এখন বাঁকুড়ার তালডাংরায় একটি অগ্রণী প্রকল্প হিসেবে সফলভাবে উৎপাদিত হচ্ছে।
- বিগত সাত বছরে উদ্যানজাত শস্যের জন্য সঠিক গুণমানের রোপণ উপাদান তৈরি করতে মোট ৯৬টি নার্সারি ও ৪টি টিস্যু কালচার গবেষণাগার চালু করা হয়েছে। এখন অবধি ৮৪টি নার্সারি জাতীয় উদ্যানপালন পর্ষদ (এনএইচবি) কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে।
- কৃষকদের কাছে শাকসবজি/পান বরজ/টিস্যু কালচার্ড চারার জন্য উন্নতপ্রযুক্তিসম্পন্ন শেড নেট ও পলি গৃহ নির্মাণ করে চাষ করার পদ্ধতি ক্রমেই জনপ্রিয় ও লাভজনক হয়ে উঠেছে। বিগত সাত বছরে ৩২,১৯,৪০০ বর্গমিটার শেড নেট গৃহ তৈরি করা হয়েছে। পলি গৃহের ক্ষেত্রে, ৪,৩৩,০০০ বর্গমিটার ক্ষেত্র মার্চ ২০১৮ অবধি ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে, যা এখন জারবেরা, অ্যানথুরিয়াম, অর্কিড, রঙিন ক্যাপসিকাম প্রভৃতি মূল্যবান ফসল উৎপাদনে ব্যবহার হয়।
- রপ্তানি পরিদর্শন ও উদ্ভিদস্বাস্থ্য শংসায়নের মান্য চালনা পদ্ধতি অনুযায়ী ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলিতে টাটকা উদ্যানজাত দ্রব্যের রপ্তানির জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের নিবন্ধীকরণ, যা ভারত সরকার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল, পানের মতো টাটকা উদ্যানজাত দ্রব্য, ওকরা, চালকুমড়োর মতো সবজি এবং আম ও লিচুর মতো ফল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানিতে উৎসাহ দিতে, পশ্চিমবঙ্গে চালু করা হয়েছে।

- আবহাওয়াভিত্তিক ফসল বিমা প্রকল্প (WBCIS) উদ্যানজাত শস্যের ক্ষেত্রে চালু করা হয়েছে।

- পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে লাল-ল্যাটেরাইট, শুষ্ক এবং এযাবৎ পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ২০১৭-১৮ থেকে একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, নাম ''পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে উদ্যান পালন উন্নয়ন'', যা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানের মতো ৬টি জেলায় চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২৯৫৩.৪৬ হেক্টর এলাকা আনা হয়েছে, যেখানে মোট ১১,৪২,৪৪৪টি চারা রোপণ করা হয়েছে (আম, পেয়ারা, লেবু, মুসম্বি, ডালিম, কুল, নাগপুরি কমলা) এবং ২১৩৮.৪৩ মেট্রিক টন জৈব সার ২০১৭-১৮ সময়কালের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় ৬০০০ সুবিধা ভোগী পরিবারকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

- উদ্যানপালন উন্নয়নের জন্য নেওয়া প্রকল্পগুলির সঙ্গে অন্যান্য দপ্তরের সমন্বয়ে গ্রামীণ এলাকায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিদ্যালয়গুলিতে, গৃহহীনদের আবাসে, সংশোধনাগার গুলিতে পৌষ্টিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং পূর্ব বর্ধমান জেলায় চালু করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন

- **কৃষক বাজার : গ্রাম্য কৃষি-বাজার আজ বিশ্ব কৃষি-ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত**

২০১১ সালের আগে প্রতিযোগিতামূলক কৃষি বিপণন ও সর্বাধিক ভরতুকি দেওয়া ফসলের জন্য রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন কোনো গ্রামীণ প্রাথমিক বাজার ছিল না। বর্তমানে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন পর্ষদ** এখনও পর্যন্ত ১৮৬টি কৃষক বাজার গড়ে তুলেছে, যেখানে রয়েছে নিলাম কেন্দ্র, স্টল, বিপণি-তথা-গুদাম, কৃষক সহায়তা কেন্দ্র, ব্যাংক-এর জায়গা, প্রশাসনিক ভবন, সংগৃহীত শস্য মজুত করার জন্য গুদাম, পানীয় জল, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। এই ধরনের ১৭টি কৃষক বাজার ই-পরিষেবা যুক্ত জাতীয় কৃষি বাজারের সঙ্গে কৃষকদের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে বিপণনের প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে এই খাতে প্রকল্প-ব্যয়ের পরিমাণ ১,১৭১.২০ কোটি টাকা।

- **সুফল বাংলা : ক্রেতাদের সঙ্গে সংযুক্ত কৃষকদের নিজস্ব মূল্য-শৃঙ্খল**

স্থায়ী ব্যবসায়িক ধরনে বাজারে পরোক্ষ হস্তক্ষেপের জন্য ২০১৪ সাল থেকে কৃষি উৎপাদন বিক্রির জন্য প্রত্যক্ষ ব্যবসায়িক উদ্যোগ সুফল বাংলা শুরু হয়। এই প্রয়াসের লক্ষ্য হল উৎপাদকের সর্বোচ্চ লভ্যাংশ বজায় রেখে যুক্তিগ্রাহ্য দরে ক্রেতাদের হাতে সতেজ তথা নষ্ট হবার সম্ভাবনাহীন কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া। এর **মূল্য-শৃঙ্খল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন পর্ষদের** আয়ত্তাধীন। ৬১টি ভ্রাম্যমান ভ্যান, ২৩টি হাব ও ৬৭টি স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান বিপণির ওপর এখনও পর্যন্ত এই পরিষেবা থাকলেও এই সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে যাতে সারা রাজ্যকে এই পরিষেবার আওতায় এনে বাড়িতে সামগ্রি পৌঁছে দেওয়া ও অনলাইনে কেনা বেচার ব্যবস্থা করা যায়। কৃষক ও ক্রেতাদের সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য বর্তমানে সংগ্রহ তথা ক্রেতাদের দেয় মূল্য প্রতিদিন **'সুফল বাংলা'** অ্যাপের মাধ্যমে ও www.sufalbangla.in ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে। শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২১.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- **বাজারে হস্তক্ষেপ ও মূল্য নির্দিষ্টকরণ : কৃষকের খুশি, ক্রেতাদের হাসি**

২০১৭ সালে অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে আলু বিপণনের সময়ের শুরু থেকেই আলুর দাম পড়তে থাকে। বাজার দর নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার আন্তঃরাজ্য ব্যবসা তথা রপ্তানির বিষয়কে উৎসাহিত করার জন্য ১৪.০৩.২০১৭ তারিখ থেকে 'রেল, জল, সড়কপথে আলুর পরিবহণের ক্ষেত্রে পরিবহন ভরতুকি প্রকল্প' চালু করে। ১৬.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে রেল ও সড়কপথে রাজ্যের অভ্যন্তরে আলু পরিবহণের জন্য কুইন্টাল প্রতি ৫০ টাকা ও রেল এবং জলপথে আলু রপ্তানির জন্য কুইন্টাল প্রতি ১০০ টাকা পরিবহণ ভরতুকি প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে সারা বছর ধরে আলুর বাজার দর নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। ২০১১ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়া থেকে ২৭.৬১ কোটি টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে আলু সংগ্রহ ছাড়াও মিড ডে মিল এবং সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আইসিডিএস) এ ব্যবহারের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি আলু সংগ্রহ করা হয়। এজন্য ২০১১ সাল থেকে মোট ১৮.১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

২০১৫-১৬ সালে পেঁয়াজের বাজার দর হঠাৎ করে বেড়ে যায়। ফলে রাজ্য সরকার পেঁয়াজের দরে হস্তক্ষেপ করে বাজারদর নির্দিষ্ট করার প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ভরতুকি-দত্ত ২৬টি সুফল বাংলা বিপণি থেকে ৫০, ৪৫ ও ৪০ টাকায় ক্রেতাদের পেঁয়াজ জোগান দেওয়া হয়। একইভাবে ২০১৬-১৭ সালে আলুর দর বেড়ে যাওয়ায় ৩০টি সুফল বাংলা বিপণির মাধ্যমে ভরতুকি দিয়ে ১৪ টাকা দরে আলু বিক্রি করা হয়।

২০১৭-১৮ সালে পেঁয়াজের দর আবার হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ৬৭টি সুফল বাংলা বিপণির মাধ্যমে ৪২ টাকা থেকে ৪৯ টাকা কিলো দরে পেঁয়াজ সরবরাহ করা হয়। একটি কাস্টম মিলড রাইস (সিএমআর) সংস্থা হিসেবে পরিগণিত এই দপ্তরের অধিগৃহীত সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন নিগম লিমিটেডকে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ খরিফ মরশুমে বাঁকুড়া ও হুগলি জেলায় ধান সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়। এই সংস্থা ২০১৭-১৮ খরিফ মরশুমে ২০৬৫.৭৬৩ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করে ও ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (নেফট)-এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫৫০ টাকা কুইন্টাল প্রতি সংগ্রহ মূল্য প্রদান করে।

মৎস্য

- মৎস্য উৎপাদন, ২০১০-১১-তে ১৪.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮-তে ১৭.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে
- মাছের চারা উৎপাদন ২০১০-১১-তে ১৩,৪৫৩ লক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮-তে ২০,১৭৭ লক্ষ হয়েছে
- **মাছের চারা বণ্টন :** ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত ১,২১,০০০ পুকুরে ১৭০০ লক্ষ মাছের চারা বণ্টন করা হয়েছে।
- **মাছের চারা বণ্টন :** ২০১৪-১৫ থেকে নিখরচায় ভারসাম্যযুক্ত ভাসমান খাদ্য দেওয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ পর্যন্ত ১৪,০০০ মৎস্য খামারে ২৭,০০০ মেট্রিকটন মাছের চারা দেওয়া হয়েছে।
- আরও এলাকাকে মৎস্য চাষের অধীন আনা : 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে খনন করা ৭৬,০০০ পুকুরে মৎস্যচাষ শুরু হয়েছে।

- **বিভিন্ন জেলায় ময়না মডেলের অনুকরণ :** এই প্রকল্পে ১২ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টর হারে বড় আকারের মাছ উৎপাদন করতে ও এলাকায় বড় আকারের মাছের চাহিদার জোগান মেটাতে এই প্রকল্প চালু হয়। প্রায় ১১৩টি প্রগতিশীল মৎস্য খামার ও ৯০ হেক্টর পুকুর এই প্রকল্পাধীন।

- **দেশজ মাছের সংরক্ষণ :** স্থানীয় দেশজ মাছ প্রজাতি সংরক্ষণ করতে বিল, বাড়ির পেছনের পুকুর ইত্যাদিতে দেশজ মাছ (যেমন- পাবদা, সরল পুঁটি, দেশি ট্যাংরা, মৌরলা, চিতল, ফলুই ইত্যাদি) চাষ চালু করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশি মাগুর উৎপাদনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

- **নতুন প্রজাতির মাছ চাষ চালু করা :** গত সাত বছরে অনেক নতুন প্রজাতির মাছ যেমন সিলভার পমপানো, নোনা ট্যাংরা, কোবিয়া, চানোস চানোস (দুধ মাছ) ও সাগরের কাঁকড়া অল্প লোনা জলে চাষ ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের উষ্ণ জলাশয়ে বোরোলি মাছ চাষ করার চেষ্টাও শুরু হয়েছে।

- **ইলিশ সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র (এইচসিআরসি):** গত কয়েক দশক ধরে ইলিশের সংখ্যা কমে যাওয়া ঠেকাতে ডায়মন্ড হারবারের সুলতানপুরে এক নিবেদিত সংস্থা ইলসা কনজারভেসন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (এইচসিআরসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 'বদ্ধ জলাশয়ে ইলিশ প্রজনন' নামে এক প্রকল্পের জন্য নরওয়েজিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফুড ফিসারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার রিসার্চ (নোদিমা) নামে এক নরওয়েজিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

- বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন/বণ্টন
  - ২০১০-১১ সালে বার্ষিক ডিম উৎপাদন ৪০০.১ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৭৬০.৪ কোটি হয়েছে; অর্থাৎ ৯০% বৃদ্ধি।
  - ২০১০-১১ সালে বার্ষিক ডিম উৎপাদন ৫.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৭.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে; অর্থাৎ ২৯% বৃদ্ধি।
  - ২০১০-১১ সালে বার্ষিক দুগ্ধ উৎপাদন ৪৪.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৫৩.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে; অর্থাৎ ২০% বৃদ্ধি।
  - বাসস্থান সংলগ্ন পশ্চাদ্‌ভূমিতে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার গড়তে বিপিএল পরিবারগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য গত ৭ বছরে ৩৫১.৮৮ লক্ষ হাঁস-মুরগির ছানা এবং ১.৮৫ লক্ষ ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

- বাণিজ্যিক লেয়ার পোলট্রি ফার্ম এবং পোলট্রি ব্রিডিং ফার্ম-এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রোৎসাহন পরিকল্প (ইনসেনটিভ স্কিম), ২০১৭রাজ্যকে ডিম উৎপাদনে স্বয়ম্ভর করতে নতুন প্রোৎসাহন পরিকল্প প্রবর্তন করা হয়েছে।
  - ৮ লক্ষ টাকা মূলধনী অনুদান/ভরতুকি (প্রত্যেক ১০,০০০ লেয়ার পোলট্রির জন্য) দেওয়া হবে, তবে ৮০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বসীমার মধ্যে।

- অতিক্ষুদ্র (১০,০০০—২০,০০০ লেয়ার বার্ড উৎপাদনে ক্ষমতা সম্পন্ন) ও ক্ষুদ্র (২০,০০০—১ লাখ লেয়ার বার্ড উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন) খামারের ক্ষেত্রে ৫ বছরে মেয়াদি ঋণের ৭৫ শতাংশের উপরে যে সুদ দেওয়া হয়েছে তার**৪০ শতাংশের** সুদ ভরতুকি হিসেবে দেওয়া হবে যেখানে **মাঝারি খামার-এর** ক্ষেত্রে সুদ ভরতুকির পরিমাণ হবে **২৫%** (উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ)।
- **বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড়** দেওয়া হবে **৭৫%**।
- **অতিক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র খামারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য প্রতি কিলোওয়াট-এ ছাড় ১.৫০ টাকা ও মাঝারি খামারের ক্ষেত্রে ১.০০ টাকা।**
- **খামারের জমির রেজিস্ট্রেশন এবং স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ ব্যয়ের ৫০% ভরতুকি দেওয়া হবে।**
- **পাঁচ বছরের মেয়াদে** উপরোক্ত **ভরতুকির পরিমাণ ২০৫.৬০ কোটি টাকা।**
- **১৬.৪৬ লক্ষের অধিক লেয়ারের জন্য ১৬০.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই ৪২টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে।**
- রাজ্যে ডিমের চাহিদা ও যোগানের ব্যবধান দূর করার জন্য বিশেষ প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। এই কারণে সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে বাণিজ্যিক হাঁস তথা লেয়ার মুরগির খামারগুলি স্থাপন/শক্তিশালী করা ও হাঁস তথা মুরগীর প্রজনন খামার প্রতিষ্ঠা করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে; সেই সঙ্গে বাসস্থান সংলগ্ন স্থানে হাঁস-মুরগির খামার তৈরির জন্য গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে হাঁস-মুরগীর ছানা বিতরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই ফাঁকা জায়গায় খামার গড়ার জন্য ২০১৭-১৮ সালে খামার মালিকদের**মধ্যে ৬৮.৫৮ লক্ষ হাঁস-মুরগীর ছানা বিতরণ করা হয়েছে।**

স্বাস্থ্য চর্চা

রাজ্যের মানুষের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি সঠিক স্বাস্থ্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। এই স্বাস্থ্যচর্চার বিষয়টি নানা অভিমুখে নতুন পথের সন্ধান দিতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা ও উদ্যোগ আজ সকলের কাছ থেকেই কুর্নিশ আদায় করছে।

রাজ্যের ক্লাবগুলিকে তিনি এই স্বাস্থ্যচর্চার কেন্দ্র করে তুললেন। খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর গঠন হয়। আর্থিক অনুদান দিলেন ক্লাবগুলিকে। যন্ত্রপাতি কিনে বিভিন্ন ক্লাব 'জিম' চালু করেছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সবথেকে আবশ্যক আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা, নানারকম অসূয়াভাব দূর করা, আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য ক্লাবগুলিতে নানা ধরনের উদ্যোগ নিতে সর্বদা আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে। নানা ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি, রক্তদান উৎসব ও স্বাস্থ্য-শিবির আয়োজন করছে ক্লাবগুলি।

এছাড়া, পাহাড় ও দুর্গম অঞ্চলে অভিযান, ট্রেকিং— এসবের মাধ্যমে যুব-সম্প্রদায়কে মজবুত শরীর গঠন, কর্মদক্ষ, সাহসী, স্বনির্ভর করে তুলছে যুব কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে। শরীর ও মন চর্চার এই জরুরি বিষয়গুলি এতদিন অবহেলিত ছিল। সংবর্ধনা ও পুরস্কারের মাধ্যমে সফল অভিযাত্রীদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি রাজ্যের ক্লাবগুলিকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পর্বত-অভিযান, ট্রেকিং, রক-ক্লাইম্বিং কোর্স করার জন্য আর্থিক অনুদান খুবই জরুরি ছিল। আজ সে ব্যাপারে ক্লাবগুলি অনেকটাই সাহায্য পাচ্ছে। এমনকি, নিখরচায় প্রান্তিক ও আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন কোর্স (রক-ক্লাইম্বিং করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধও থাকছে। ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের এও আর এক বড়ো দৃষ্টান্ত।

সমাজ-মুখী উন্নয়নে সমাজের সব বয়সের মানুষের শরীর ও মনের উন্নয়নে সরকার সমানভাবে এগিয়ে এসেছে।

অন্যদিকে, পৌর ও পঞ্চায়েত এলাকায়, প্রবীণ মানুষদের জন্যও নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সকাল ও সন্ধ্যায় ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত, নিরাপদ স্থান বা পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। সৌন্দর্যায়ন কর্মসূচি আজ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। অবসর জীবন যাতে সুন্দরভাবে কাটানো যায় তার আয়োজন চলছে চারপাশে।

প্রবীণ মানুষেরা আমাদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা সর্বদা চাইব তাঁরা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দীর্ঘজীবী হোন। তাঁদের জন্য নানা ভাতার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিনা পয়সার চিকিৎসার পাশাপাশি ন্যায্যমূল্যে ওষুধ যাতে তাঁরা পান তার চেষ্টা হয়েছে। অসহায় প্রবীণদের জন্য 'হোম' তৈরি হচ্ছে।

সমাজ-মুখী উন্নয়নে সমাজের সব বয়সের মানুষের শরীর ও মনের উন্নয়নে সরকার সমানভাবে এগিয়ে এসেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিকর খাবার, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, ন্যায্যমূল্যে ওষুধ, বিভিন্ন ধরনের ভাতা, অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প— রাজ্যের স্বাস্থ্যচিত্রে এনেছে নজরকাড়া পরিবর্তন।

সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বিভিন্ন বিভাগের 'সমন্বয়'। উদ্দেশ্য যখন উন্নয়ন, লক্ষ্য যখন এগিয়ে যাওয়া, অবশ্যম্ভাবীরূপে সেটা স্বাস্থ্য-ক্ষেত্রের উন্নয়নে নতুন পালক সংযুক্ত করে। গত সাত বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সহজ হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের কাছে যেমন উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তেমনই উন্নয়নের কর্মসূচি প্রস্তুতি ও রূপায়ণে তাঁদের চাহিদা, ভাবনা ও অংশগ্রহণ বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কয়েকটি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। তাছাড়া, অন্যান্য বিভাগের প্রকল্পগুলিও পরোক্ষে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সদর্থক প্রভাব ফেলছে। এইসব প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশিত হল যার ভিত্তিতে রাজ্যবাসী এই প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রকল্পের নাম: স্বাস্থ্য সাথী

- **দপ্তর:** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর

- **উদ্দেশ্য:** উন্নতমানের আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রত্যেক প্রান্তিক মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়া। এবং সেটি স্বচ্ছতা ও আধুনিকতার পাশাপাশি অত্যাধুনিক ই-প্রযুক্তি ব্যবহার করে। রাজ্যের কয়েক লাখ আইসিডিএস কর্মী, আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, হোমগার্ড, গ্রিন পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, অর্থ দপ্তরের অনুমতিক্রমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মুখে আজ হাসির ঝিলিক।

অন্যান্য স্মার্ট কার্ডের মতো এই কার্ড নিয়ে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল-সহ ৭০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতালে যেতে হবে। ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওই কার্ডধারীর পরিবারের যে কেউ, বছরে চিকিৎসা পাবেন, ক্যাশলেস হিসেবে। বিশেষ জটিল রোগের ক্ষেত্রে ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার আওতায় থেকে চিকিৎসা করা যাবে।

এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় ১৯০০-র বেশি ধরনের রোগের চিকিৎসার সুবিধা দিচ্ছে সরকার। হাসপাতালে থাকাকালীন সমস্ত চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ, খাবার দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। এছাড়া যাতায়াত ভাড়া বাবদ ২০০ টাকা এবং ভর্তির একদিন আগে ও ছাড়া পাওয়ার পরের ৫ দিনের ওষুধও বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে চালু হয়ে গিয়েছে মোবাইল অ্যাপস। রয়েছে ফেসবুক, ট্যুইটার এবং টোল-ফ্রি নম্বরে (১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪) সমস্ত তথ্য জানা এবং অভিযোগ জানানোর সুবিধা। এছাড়াও ওয়েব পেজ: www.swasthasathi.gov.in-এ সমস্ত তথ্য জানা যাবে। একদম প্রান্তিক এলাকাতেও কোন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, চিকিৎসকের নাম, কাছাকাছি কোথায় কোন ধরনের সুপার স্পেশালিটি রয়েছে, কোন হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স—আইসিইউ রয়েছে ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি তথ্য হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। ইতিমধ্যে ৪৮ লক্ষেরও বেশি

মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ৩১-০৭-১৮ পর্যন্ত ২.৮৬ লক্ষ রোগী ২৭৮ কোটি টাকার ক্যাশলেস পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।

- **কারা আবেদন করবেন:** সিভিক ভলান্টিয়ার্স, গ্রিন ভলান্টিয়ার্স, ভিলেজ ভলান্টিয়ার্স, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বল (এনভিএফ), হোমগার্ড, আইসিডিএস কর্মী ও সহকারী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পঞ্চায়েতিরাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা-শ্রমিক, পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আশা কর্মী, অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স, অর্থ দপ্তরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা-শ্রমিকেরা আবেদন করবেন। স্বামী/স্ত্রী, তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পিতামাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ি এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ে প্রত্যেকে এই স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাবেন। এছাড়াও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবার এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

- **যোগাযোগ:** প্রতি জেলায় ব্লকস্তরে বিডিও অফিস, শহর ও শহরতলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরসভা এবং অবশ্যই ২৪ ঘণ্টা চালু থাকা টোল-ফ্রি নম্বর— ১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪।

প্রকল্পের নাম: শিশুসাথী

- **দপ্তর:** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই রাজ্যের শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে চিন্তাশীল। এরই ফলশ্রুতিতে কমেছে শিশুমৃত্যু হার। রাজ্যের প্রতিটি শিশুর সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য তিনি একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগেই নতুন সংযোজন শিশুসাথী প্রকল্প। এই প্রকল্পের নামও দিয়েছেন নিজে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে পথ চলতে শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্প।

জন্মের পর কি শিশুর হার্টের সমস্যা ধরা পড়েছে? হার্টে ফুটো, কোনও ভালভ ঠিকমতো তৈরি না হওয়া, হার্টে রক্ত চলাচলে সমস্যা ইত্যাদি যে কোনও রোগ অর্থাৎ চিকিৎসক কি কনজেনিটাল কার্ডিয়াক ডিফেক্ট (Congenital Cardiac Defect) জাতীয় কিছু বলেছেন? একদম চিন্তা না করে চলে আসা যাবে কলকাতার ২টি সরকারি এবং ৬টি বেসরকারি হাসপাতালের যে কোনওটিতে। তবে সেটি অবশ্যই জেলার বা ব্লকস্তরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে, সরাসরি নয়।

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ওই শিশুর হার্টের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। শুধু তাই নয়, শিশু-সহ বাড়ির একজনের থাকা, সমস্ত ধরনের জটিল অস্ত্রোপচারের সব দায়িত্বই রাজ্য সরকারের। হার্টের বিভিন্ন জটিল সমস্যার চিকিৎসা বিনামূল্যে করিয়ে বাবা-মা, শিশুকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন।

সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাওয়া যায়।

- **কারা এই সুযোগ পাবেন:** এককথায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত রাজ্যের যে কোনও শিশু। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী, শিশুর পরিবারের আয়ের কথা মাথায় রাখতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, পরিবারের যত কম বা যত বেশি আয়-ই হোক, এপিএল বা বিপিএল—তা হিসেবের মধ্যে ধরা হবে না। শিশুটি রাজ্যের, এটাই শেষ কথা।
- **যোগাযোগ:** কলকাতার এসএসকেএম (পিজি হাসপাতাল) এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অর্থাৎ CMOH এবং ব্লকস্তরে BMOH-এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম: মাভৈঃ (ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট–২০১৬)

- **দপ্তর:** তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** সরকারি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড-প্রাপ্ত বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হয়েছে এই প্রকল্পে। সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত। এই মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ও শ্রদ্ধাশীল। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এই পেশাকে ক্রমশ চ্যালেঞ্জবহুল করে তুলেছে। এই পেশার কর্মপরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ও কর্ম পদ্ধতিতেও হয়ে চলেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কর্ম বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যম হয়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড–প্রাপকদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকে রাজ্যে সাংবাদিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ সুবিধা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় চালু হয়েছে এই স্বাস্থ্য বিমা। রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো সরকার স্বীকৃত এবং তালিকাভুক্ত, রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক এবং চিত্র-সাংবাদিকদের জন্য এই নতুন স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হয়েছে। এই বিমার আওতায় নির্দিষ্ট সাংবাদিক এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা প্রতিটি সরকারি এবং তালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারবেন।

  পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য বলতে স্ত্রী (যিনি নিজে মেডিক্যাল অ্যালাওয়েন্স পান না), বাবা-মা যাঁদের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার কম, ছেলেমেয়ে, অবিবাহিত/বিধবা/ডিভোর্সি বোন এবং নাবালক ভাইবোন এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আসবেন।
- **কারা আবেদনের যোগ্য:** জেলা হোক বা কলকাতা, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা (Govt. Accredited Journalist) রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করা যায়।
- **যোগাযোগ:** জেলার ক্ষেত্রে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের হেল্প ডেস্কে নির্দিষ্ট ফর্মেই আবেদন করতে হবে। এই আবেদন, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, সেখানকার সম্পাদক বা সমমর্যাদা সম্পন্ন কোনও ব্যক্তি সই করে দিলে তবে সেটি জমা করা যাবে।

প্রকল্পের নাম: সমাজসাথী

- **দপ্তর:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যাদের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমার আওতায় নিরাপত্তা দেওয়াই (১৮-৬০ বছর বয়স পর্যন্ত) এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। দুর্ঘটনার সময় উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আচমকা যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়, তার মোকাবিলা করতেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ও তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার।

- **কারা প্রকল্পের সুবিধা পাবে:** এই প্রকল্পে প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য বা সদস্যা বিনামূল্যে বছরে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা পরিষেবা পাবেন। প্রকল্পের আওতায় দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসার খরচ, হাসপাতালে ভর্তির খরচ ছাড়াও চিকিৎসার সময় আরও কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। কাজে অনুপস্থিত থাকার দরুণ দৈনিক পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হন সেই ব্যক্তি। এর ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয় সমাজসাথী প্রকল্পে। এছাড়া বিমা সংস্থা সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করবে—তথ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, নাম নথিভুক্ত করানো, স্মার্ট কার্ড সরবরাহ করা ইত্যাদি। বিমা প্রকল্পটি রাজ্যের সবক'টি জেলাতেই কাজ করবে।

প্রকল্পের নাম: নিজ গৃহ নিজ ভূমি

- **দপ্তর:** ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুর্নবাসন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** রাজ্যের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের স্থায়ী আশ্রয় এবং আশ্রয়কে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন। এটি একধরনের পুনর্বাসন প্রকল্প।

সরকারের খাস জমি ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে ৫ শতক করে চাষ ও বাসের জন্য দান করা হচ্ছে। ওই জমিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাড়ি তৈরি, রাস্তা তৈরি, জল-আলো-নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাড়ি সংলগ্ন জমিতে চাষবাস, প্রাণীপালন, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, সংলগ্ন অঞ্চলে পুকুর কেটে মাছ চাষ করানো, স্থানীয়ভাবে সুলভ কাঁচামাল ব্যবহার করে নানা পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ ও বিক্রির ব্যবস্থা—এইসব নানা কাজের মধ্যে দিয়ে এই 'ভূমি-দান' প্রকল্প একটি বহুমুখী প্রকল্প হিসেবে সার্থক হয়ে উঠছে। ২০১১-র ১৮ অক্টোবর এই প্রকল্পটি চালু করা হয়। বহুসংখ্যক মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে তাঁদের জীবনযাপনের মান উন্নত করে চলেছেন। ৩ লক্ষ বাস্তুজমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। ১২৭৪.৮৯ একর কৃষিজমি বিলি করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৮-র মার্চ পর্যন্ত ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৫০ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। ২১ হাজারেরও বেশি NGNB প্রকল্পের জমিতে জীবিকার উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সংযুক্ত হয়েছে।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** কৃষি-কাজ, প্রাণীপালন, মৎস্য চাষ, হস্ত ও কুটিরশিল্প প্রভৃতি চিরাচরিত পেশার সঙ্গে আবহমান কাল ধরে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আজও যাঁরা একটুকরো জমির মালিক হতে পারেননি এবং বসতজমি কেনার ক্ষমতাও নেই তাঁরাই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রান্তিক মানুষজনও এই সুবিধা পাবেন।
- **যোগাযোগ:** সংশ্লিষ্ট বিএল অ্যান্ড এলআর অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম: খাদ্যসাথী

- **দপ্তর:** খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** সুলভ মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের ৮ কোটি ৬২ লক্ষ মানুষ অর্থাৎ রাজ্যের ৯৪ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় এসেছেন।

  জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন এবং রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার, বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত পরিবার ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা-১ এর তালিকাভুক্ত পরিবারের সমস্ত মানুষের কাছে রাজ্য সরকার দুটাকা কেজি দরে খাদ্যশস্য পৌঁছে দিচ্ছে।

  খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণায় ৪০ লক্ষের বেশি মানুষের জন্য বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে। জঙ্গলমহল, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার, চা-বাগানের সমস্ত পরিবার, দার্জিলিং-এর পাহাড়বাসী, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক পরিবার, টোটোপাড়ার আদিম জনজাতিভুক্ত পরিবার এই বিশেষ প্যাকেজের আওতায় আছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন শিশু, মা ও তাদের পরিবারের জন্য মাসে ৫ কিলোগ্রাম চাল, ২.৫ কিলোগ্রাম গম, ১ কিলোগ্রাম মুসুর ডাল ও ১ কিলোগ্রাম ছোলা বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে 'বিশেষ কুপন' চালু করে। গণবণ্টন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য ডিজিটাল রেশন কার্ডের প্রচলন ও সার্বিক কম্পিউটার ব্যবস্থাপনার সফল প্রয়োগ গত পাঁচ বছরে সম্ভব হয়েছে। বর্তমান খরিফ মরশুমে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর প্রায় ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ জুট ব্যাগ ক্রয় করেছে যার মূল্য প্রায় ২১১ কোটি টাকা।

  বর্তমান খরিফ মরশুমে (২০১৭-১৮) সরকার প্রায় ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কৃষকের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে রাজ্যে ধানের অভাবী বিক্রি বন্ধ হয়েছে। খাদ্য মজুতের ক্ষমতাও গত সাত বছরে ১৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮ লক্ষ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানের সফল পদক্ষেপ হল খাদ্যসাথী।
- **যোগাযোগ:** খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের শুল্কমুক্ত ফোন নং: ১৯৬৭ এবং ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা।

প্রকল্পের নাম: মিশন নির্মল বাংলা

- **দপ্তর:** পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাকে মুক্ত শৌচবিহীন হিসাবে ঘোষণা করা। দেশের মধ্যে প্রথম এই রাজ্যেই 'নদিয়া' জেলা এই শিরোপা পায়। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের ফলে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য নানা ভাবে বিঘ্নিত হয়। বিভিন্নভাবে জনসচেতনতা শিবির, আলোচনাচক্র ও প্রচারের ফলে এই রাজ্যের একের পর এক জেলাকে 'মুক্ত শৌচবিহীন' ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা, কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলি জেলা এই স্বীকৃতি অর্জন করেছে। মালদা ও হাওড়া জেলার পর দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম, ও মুর্শিদাবাদ জেলাও এই স্বীকৃতির অপেক্ষায়।

- **কারা আবেদন করবেন:** গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী যাঁদের বাড়িতে শৌচালয় নেই তাঁরা শৌচালয় নির্মাণে টাকা পাবেন।
- **যোগাযোগ:** পঞ্চায়েত অথবা পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

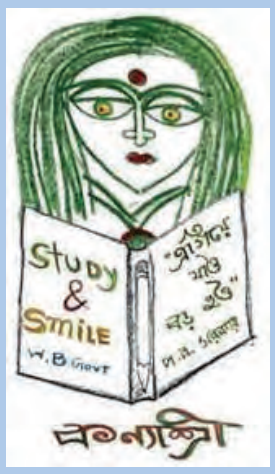

প্রকল্পের নাম: কন্যাশ্রী

- **দপ্তর:** নারী ও শিশু উন্নয়ন রএবং সমাজকল্যাণ দপ্তর, উচ্চশিক্ষা দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** কন্যাশ্রী একটি আর্থিক উৎসাহদান প্রকল্প। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা হয় মূলত কন্যা সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। দরিদ্র মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং উচ্চশিক্ষায় ধরে রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

  মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়নে অনেকগুলি যুগান্তকারী প্রকল্প চালু করেছেন। তাঁর স্বপ্নের প্রকল্পগুলির মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পটি অন্যতম। এই প্রকল্পের নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। লোগোটিও তিনিই ডিজাইন করেছেন।

  নারীশিক্ষার উন্নয়নে নতুন দিশা কন্যাশ্রী প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই প্রকল্প চালু হয় ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর তারিখে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র কন্যাশিশুদের শিক্ষায় উৎসাহিত করা হয়। 'কন্যাশ্রী' ভাতাপ্রাপ্ত ছাত্রীরা একটি নিজস্ব পরিচয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-এ টাকা সরাসরি জমা হয়।

  ১৮ বছর পর্যন্ত মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক গঠন চলতে থাকে। ভবিষ্যতে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাই তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এই সময়ই উপযুক্ত। 'কন্যাশ্রী'-র মেয়েদের নানা প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের তৈরি পণ্য বিক্রিরও ব্যবস্থা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্রীড়া ও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে। 'কন্যাশ্রী ফুটবল প্রতিযোগিতা'-ও আয়োজিত হচ্ছে। তাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার এবং জীবনের সমস্যাগুলোকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য কন্যাশ্রী ক্লাব, কন্যাশ্রী সংঘ ও কন্যাশ্রী যোদ্ধা গড়ে তোলা হচ্ছে।

  এই প্রকল্প কন্যাশিশুর জীবনকে আলাদা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে তাদের। কন্যাশ্রী-র মেয়েরাই গ্রামে গ্রামে সঠিক বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা বলছে, স্কুল-ছুট মেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনছে, মেয়েদের পড়াশোনা করানোর সুফল অভিভাবকদের বোঝাচ্ছে এবং আলাপ-আলোচনা ও নাটকের মাধ্যমে তারা জনমতও তৈরি করছে।

  এর ফলে নারী শিক্ষার হার ও সঠিক বয়সে বিয়ের হার দুটিই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কমছে লিঙ্গ-বৈষম্যও। নারীরা স্ব-নির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। সার্বিক উন্নয়নে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

প্রায় ৫০ লক্ষ ছাত্রী এই রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (২৭-০৮-২০১৮ পর্যন্ত)।

রাষ্ট্রপুঞ্জ কন্যাশ্রী প্রকল্পকে বিশ্বসেরা প্রকল্পের শিরোপা দিয়েছে ইতিমধ্যেই। বিশ্বের ৫৫২টি প্রকল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জের '২০১৭ জন পরিষেবা পুরস্কার' অর্জন করেছে এই প্রকল্প। ২৩ জুন, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন পরিষেবা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডস-এর হেগ শহরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

- **কারা আবেদন করতে পারবে:** সরকার স্বীকৃত নিয়মিত বা সমতুল মুক্ত বিদ্যালয়ে বা সমতুল বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা কেবলমাত্র অবিবাহিতা মেয়েরাই আবেদন করতে পারবে। বার্ষিক ভাতার জন্য K-1 ফর্মে এবং এককালীন অনুদানের জন্য K-2 ফর্মে আবেদন করতে হবে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরতা মেয়েদের জন্য K3 শুরু হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের বৃত্তিপ্রাপকেরা বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে/কমার্সে পড়াশোনার জন্য মাসে যথাক্রমে ২৫০০ ও ২০০০ টাকা করে অনুদান পাচ্ছে।

  আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয়ের নির্দিষ্ট সীমা বর্তমানে তুলে দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে। আবেদনকারীকে যে কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে এই প্রকল্পের জন্য একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। বার্ষিক ১,০০০ টাকা হারে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বয়স হতে হবে ১৩ থেকে ১৮ বছর। এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যালয়, কলেজ বা বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা অবিবাহিতা মেয়েদের, আবেদন করার সময় যাঁদের বয়স ১৮ বছরের বেশি এবং ১৯ বছরের কম। K-3-র জন্য এই বয়ঃসীমা প্রযোজ্য নয়।
- **যোগাযোগ:** বিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রকল্পের নাম: সবলা

- **দপ্তর:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** কিশোরীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জীবনশৈলী ও কর্মসংস্থানগত উন্নতি ঘটিয়ে তাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি খাবার অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের মাধ্যমে কিশোরীদের সরবরাহ করে। এইভাবে অপুষ্টি দূর করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কৈশোর-জনিত প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, পরিবার ও শিশুর সুরক্ষা এবং যত্নের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে কিশোরীদের মধ্যে। রাজ্যের ৭টি জেলায় 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করে এই প্রকল্প চলছে। গৃহকর্মে ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোরীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার কাজ চলছে এই প্রকল্পে। তাদের 'কিশোরী কার্ড' নামে একটি কার্ড দেওয়া হচ্ছে যেখানে তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে।

- **কারা আবেদন করতে পারবেন:** ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি অবিবাহিতা কিশোরী কন্যারা। বর্তমানে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পুরুলিয়া, কলকাতা, মালদা এবং আলিপুরদুয়ার এই ৭টি জেলায় এই প্রকল্প চলছে।
- **যোগাযোগ:** গ্রামের অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে এবং ব্লকের সিডিপিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বর্তমানে এই প্রকল্পের নাম— "কিশোরীদের জন্য প্রকল্প" (Scheme for Adolescent Girls) হয়েছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় ১১–১৮ বছর বয়সি এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত কিশোরী মেয়েদের জন্য 'সবলা' প্রকল্পের সমস্ত পরিষেবা সারা রাজ্য জুড়ে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে দেওয়া হবে।

প্রকল্পের নাম: মানবিক

- **দপ্তর:** নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ যাঁদের প্রতিবন্ধকতা ৫০% অথবা অধিক, তাঁদের এই পেনশন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা। মানবিক প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তা প্রতি মাসে ১,০০০(এক হাজার) টাকা করে ভাতা পাবেন।
- **কারা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন:** প্রতিবন্ধী বা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ এই পেনশন প্রকল্পের আওতায় আসবেন যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করেন—
  (১) আবেদনকারীর প্রতিবন্ধকতা ৫০% বা তার অধিক হতে হবে।
  (২) আবেদনকারীর পারিবারিক আয় বার্ষিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার কম হতে হবে।
  (৩) আবেদনকারীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং কমপক্ষে দশ বছর পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে হবে (পেনশনের আবেদনের তারিখ ভিত্তি ধরে)।
  (৪) আবেদনকারীর বয়স দশ বছরের কম হলে বসবাসের সময় নির্ধারিত হবে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ এবং আবেদনের তারিখের ব্যবধান সময়ানুযায়ী।
  (৫) আবেদনকারী রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অন্য কোনও সূত্র থেকে বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, কৃষি ভাতা, পারিবারিক পেনশন প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা পেলে, মানবিক প্রকল্পের আওতায় ভাতা পাবেন না।
- **যোগাযোগ:** উপভোক্তারা স্থানীয় ব্লক অফিস অথবা গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং শহর এলাকায় পৌরসভায় যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রকল্পের নাম: সবুজশ্রী

- **দপ্তর:** বন দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে জন্মগ্রহণের পরপরই একটি মূল্যবান গাছের চারা দেওয়া হচ্ছে।

ওই চারাটি শিশুর নামে লাগাতে হবে এবং শিশুর সঙ্গে সঙ্গে চারাটি বড়ো হবে। শিশুর পরিবার চারাটিকে ও শিশুকে সযত্নে লালনপালন করবে। শিশু বড়ো হলে শিশুর প্রয়োজনে ওই চারা থেকে বেড়ে ওঠা বৃক্ষটিকে আর্থিক কারণে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে শিশুটির ভবিষ্যতের আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি গাছটি 'জীবজগৎ'-কেও এতগুলো বছর ধরে অনেক কিছুই দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬-র ১৯ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের সূচনা করেন।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের প্রতিটি নবজাতক এবং পরোক্ষভাবে প্রতিটি রাজ্যবাসী। এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'সবুজ বাংলা' গড়ে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃতি ও মানবসন্তান-এর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও অনুভূতি গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে তা অভিনব। ইতিমধ্যে ১৫ লক্ষেরও বেশি চারাগাছ এই প্রকল্পে লাগানো হয়েছে।

- **প্রকল্পের সুযোগ কারা পাবেন:** রাজ্যের নবজাতকেরা।
- **যোগাযোগ:** প্রতিটি শিশু জন্মানোর পর বনদপ্তর থেকে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই চারা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যে স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও পরিকাঠামোয় নতুন জোয়ার

মা-মাটি-মানুষের সরকার ‘পশ্চিমবঙ্গ’-কে নতুন করে গড়ে তোলার অঙ্গীকারে পথ চলা শুরু করল ২০১১-তে।

রাজ্য জুড়ে শুরু হল কাজের জোয়ার। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দুটি বিষয়েই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল।

দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে কম খরচে, কখনও বা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হল। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে চিকিৎসার জগতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। কিন্তু এইসব পরিষেবার সুযোগ কেবল বিশাল পরিমাণ অর্থের বদলেই মুঠোবন্দী করা যায়। দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত মানুষই যে এক্ষেত্রে অসহায়তা বোধ করে তাই নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারেও অনেক রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসা-পরিষেবা ক্রয়ের ক্ষমতা থাকে না।

রোগের কাছে মানুষ, সে ধনী-নির্ধন যাই হোক, বড়ো অসহায়। অর্থ দিয়ে কেউ মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন। কেউ বা পারেন না অর্থহীনতার কারণে। সরকার এখন জনকল্যাণের ক্ষেত্রে মস্তবড়ো ভূমিকা নেয়। পশ্চিমবঙ্গ-এ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই ‘ত্রাতা’-র ভূমিকা নিয়ে দেখা দিল।

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে একে একে কার্যকরী পদক্ষেপ করা হল। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে—এই লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে ‘পরিবর্তন’-এর সরকার পরিবর্তন আনার কাজ শুরু করল।

রাজ্যে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার পাশাপাশি সবর্ত্রই ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যেহেতু রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টাই স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনীয় সুযোগ নিতে মানুষ এখন সহজেই পৌঁছে যেতে পারছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে। সময় নষ্ট না করে অসুস্থ মানুষকে নিয়ে এইভাবে পৌঁছে যাওয়ার যে সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন—এটাই একটা বড়ো পরিবর্তন।

আগে হাসপাতালে কিছু ফ্রি বেড ছিল, এখন সকলের জন্যই ফ্রি বেড। ফলে, দরিদ্র মানুষদের মন থেকে হীনমন্যতাও অনেকটা দূর হয়েছে। সকলের মধ্যেই এসেছে আস্থা।

সকলের জন্য স্বাস্থ্য—এই ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব হল এভাবেই। ফলে, অনেক বেশি বেশি মানুষ রাজ্যের চিকিৎসা-পরিষেবার সুযোগ নিতে এগিয়ে আসতে লাগল। বিনা চিকিৎসায় ঘরে বসে থাকার দিন শেষ হয়ে এল। এইভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির আমূল সংস্কারের পাশাপাশি নতুনভাবে প্রয়োজনমুখী প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ খোলার ভাবনা।

রাজ্যের সর্বত্র উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার বড়ো চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে।

যে কোনও কাজের পরিচালনায় ‘নজরদারি’ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর, পদক্ষেপও বটে। রাজ্য পরিচালনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ‘ব্যক্তিগত নজরদারি’-র যে পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটালেন তার ফলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও অবশ্যম্ভাবিরূপে সাফল্য দেখা দিল।

রাজ্যের নামী হাসপাতালে আচমকাই ঢুকে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা বললেন, রোগী ও তাঁদের পরিজনদের

সঙ্গে। তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালের পরিবেশ নিয়েও তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা ও মতামত প্রকাশ করলেন। নিতে বাধ্য করলেন জরুরী পদক্ষেপ। স্বাস্থ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর এই আচমকা হাসপাতাল-পরিদর্শন সেদিন চমকে দিয়েছিল রাজ্যবাসীকে। কিন্তু এইভাবেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন—নতুন সরকারের কর্ম-পরিচালনার-নীতি কিভাবে রূপ পাবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার খোলনলচে পাল্টাতে গেলে কোথায় আগে কাজ শুরু করতে হবে এটা আগে বোঝা ও বোঝানো দরকার। অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে এটা তিনি করতে পারলেন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি অনেক জেলাতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সেগুলির সংস্কার করলেন গত সাতবছরে। ভেঙে পড়া ঘর-বাড়ির পাশাপাশি চিকিৎসক-নার্স-কর্মীদের থাকার জন্য কোয়ার্টারেও সংস্কার ও নির্মাণ করা হচ্ছে। এটা খুব জরুরী বিষয়। কারণ দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার পরিষেবা পাওয়া যাবে যে কেন্দ্র থেকে সেখানের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী না থাকলে মানবসেবার এতবড়ো কাজ সফলভাবে করানো সম্ভব নয়। তাই তাঁদের সুবিধার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। ধাপে ধাপে এই কাজ চলছে।

উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে সর্বত্র। রোগনির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 'রোগনির্ণয়'—যে একটি প্রয়োজনীয় কাজ সেকথা সব মানুষ আজ বুঝতে পারছেন। মানুষের মধ্যে শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনার প্রসার ঘটায় চিকিৎসার কাজও এখন অনেকটাই সঠিকভাবে করা যাচ্ছে। এর ফলে, চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যেও সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বেশিরভাগ মানুষ প্রাথমিক পর্যায়েই সঠিক চিকিৎসার সুযোগ পেলে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে যেতে পারেন। অযথা হয়রানি হয় না তাঁদের।

যাঁদের আরেকটু চিকিৎসার দরকার, যে পরিষেবা তাঁরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাবেন না, সেই পরিষেবার জন্য তাঁদের ক্রমান্বয়ে উপরের দিকের পরিষেবা-কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে। এই ব্যবস্থাকেই 'রেফারেল-সিস্টেম' বলা হয়। এই ব্যবস্থা ঠিকভাবে পরিচালিত হলে বড়ো হাসপাতালগুলিতেও চাপ অনেক কমে।

তাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতাল, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, মাল্টি/সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, বিশেষ রোগের হাসপাতাল—রাজ্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিস্তৃত প্রেক্ষাপট জুড়ে চলছে উন্নয়নের জোয়ার।

বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ এ যেসব সুবিধা পাওয়া যায়

- এমার্জেন্সি পরিষেবা
- মেডিসিন
- কার্ডিওলজি
- চেস্ট
- পেড্রিয়াটিক মেডিসিন
- নিওনেটোলজি
- ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট
- ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট
- এনডোক্রিনোলজি (এসএসকেএম, মেডিক্যাল কলেজ, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ, আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ)
- রিউম্যাটোলজি(এসএসকেএম)
- নেফ্রোলজি (এসএসকেএম, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ)
- সাইকিয়াট্রি (ইনস্টিটিউট অব সাইকিয়াট্রি-তে ২৪ ঘণ্টা এমার্জেন্সি পরিষেবা)
- নিউরোমেডিসিন
- ডার্মটোলজি
- গ্যাসট্রোএনটেরোলজি (এসএসকেএম হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ)
- কুষ্ঠ
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- হেমাটোলজি
- ব্লাড ব্যাংক
- রেডিওথেরাপি
- ইমিউনাইজেশন ক্লিনিক
- অ্যাডোলোসেন্ট ক্লিনিক
- জেনারেল সার্জারি
- পেডিয়াট্রিক সার্জারি
- প্লাসটিক সার্জারি
- থোরাসিক সার্জারি
- ইউরোলজি
- অর্থোপেডিক
- ইএনটি
- চক্ষু বিভাগ
- দন্ত বিভাগ
- অবস্টেট্রিকস অ্যান্ড গাইনোকোলজি
- নিউক্লিয়ার অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল মেডিক্যাল সায়েন্সেস
- নিউরোসার্জারি
- এসডিএলডি (এসএসকেএম)

উন্নয়নের নতুন দিশা

রাজ্য সরকারের ঘোষিত নীতি অনুসারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষের কাছে সুলভ হতে পারে এবং রাজ্যের দূরতম প্রান্তেও দরিদ্র মানুষ এই স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পরিকল্পনা বাজেট ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে বাজেট বরাদ্দ ৭,৬০৩.৮২ কোটি টাকা থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বাড়িয়ে ৮,৭৭৩.৫২ কোটি টাকা করা হয়েছে। এটি ২০১০-১১ অর্থবর্ষে বরাদ্দকৃত ৬৮২.২৮ কোটি টাকার তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি সূচিত করছে।

১. ২৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৮২টি ৩০০/৫০০ শয্যা বিশিষ্য মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩৯টি হাসপাতালে বহির্বিভাগ চালু হয়ে গেছে। ৩৬টি মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অন্তর্বিভাগও চালু হয়ে গেছে। অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই হাসপাতালগুলিতে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)-গুলির জন্য ৫৭৩টি জিডিএমও, ১০৪৫টি বিশেষজ্ঞ এমও, ১১টি নার্সিং সুপার, ২৮৪টি ওয়ার্ড সিস্টার এবং ৪৫০৪টি স্টাফ নার্স পদ তৈরি করা হয়েছে।

২. ৫টি পিছিয়ে পড়া জেলায় জেলা হাসপাতালকে উন্নীত করে (কোচবিহার, রায়গঞ্জ, রামপুরহাট, পুরুলিয়া এবং ডায়মন্ড হারবার) সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি এবং আরামবাগে দুটি নতুন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হচ্ছে। এর ফলে এমবিবিএস কোর্সে আরও ৭০০ আসন সংখ্যা বাড়বে।

৩. ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ১০ থেকে বেড়ে ১৪টি (ইএসআই ও জোকা মিলিয়ে) হয়েছে এবং বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে ১ থেকে ৪ করা হয়েছে। এমবিবিএস এবং বিডিএস মিলিয়ে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ২২০৫ থেকে ৩৭৫০ করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর আসন ৮৮০ থেকে বেড়ে ১২৯৭ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও ৮০ জন ছাত্র ডিপ্লোমেট অব ন্যাশানাল বোর্ড-এর অধীনে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠন করতে পারবেন। পোস্ট ডক্টরাল আসন সংখ্যা ২০১১ পর্যন্ত ছিল ১০৭টি। তা থেকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে ১৪৭ করা হয়েছে।

২০১৭ সালে ৯৩ জন শিক্ষক/ডেমনস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১২ থেকে এখনও পর্যন্ত অতিরিক্ত ২০৯৫ জন শিক্ষক/ডেমোনস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং কলেজ অব মেডিসিন, সাগর দত্ত হাসপাতালে ৩টি টার্সিয়ারী কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে।

মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে ১৫০ কোটি টাকা PMSSY-I & III-র অধীনে অনুমোদন করা হয়েছে।

৪. হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ৮৯৭ জন মেডিক্যাল অফিসার, ১০৩ জন BMOH এবং ৪৭ জন অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট, ৩১৯৪ জন নার্সিং পার্সোনেল এবং ১০৩৭ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বর্তমান আর্থিক বর্ষে নিয়োগ করা হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে হেলথ রিকক্রুটমেন্ট বোর্ড ৬১১৫ জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর মধ্যে রয়েছেন ৫০৬১ জন মেডিক্যাল অফিসার, ২৬৭ জন বিএমওএইচ এবং ২১৭ জন দন্ত-শল্য চিকিৎসক। হেলথ্ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আরও ৮ জন আরএসও তথা ফিজিসিস্ট, ১১৫০৪ জন নার্সিং পার্সোনেল, ১১০ জন অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট,

৮৩৩ জন ফার্মাসিস্ট এবং ১০৩৭ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করেছেন। মেডিক্যাল এবং প্যারা-মেডিক্যাল মিলিয়ে মোট ১৯৬০৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

৫. ৭২টি অনুমোদিত ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে, মেডিক্যাল কলেজ ও সেকেন্ডারি স্তরের হাসপাতাল ও একটি প্রাইমারী লেভেল হাসপাতাল মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৬০টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) চালু করা গেছে। এর পাশাপাশি আরও ১৪টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট মাল্টি/সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং বকখালির ট্যুরিস্ট স্পট (ফ্রেজারগঞ্জ প্রাথমিক হেলথ সেন্টার)-এ স্থাপন করা হবে।

গত ৩ বছরে ১ লক্ষের বেশী লোক এখানে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। ২০১৫ সাল থেকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসা পরিষেবা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যেমন— ২০১৫-তে ২৩০২৭ জন পরিষেবা পেয়েছেন,

২০১৬-তে ৪০০৪৫ জন পরিষেবা পেয়েছেন,

২০১৭-তে ৪২০১৪ জন পরিষেবা পেয়েছেন।

৬. বর্তমানে ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ রোগীদের কাছে আশীর্বাদরূপে দেখা দিয়েছে যেখানে চালু হওয়ার পর থেকে ৩৬৪.২৭ লাখেরও বেশি রোগী ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম অধিক ছাড়ে পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন।

৭. বর্তমানে ৮৭টি 'ফেয়ার প্রাইস ডায়গনস্টিক সেন্টার' কার্যকর রয়েছে। ৫৪টি রোগ নির্ণয় কেন্দ্র (ডায়গনস্টিক ইউনিট) (১২টি সিটি স্ক্যান, ৫টি এমআরআই এবং ৩৭টি ডিজিটাল এক্সরে) এবং ৩৩টি ডায়ালিসিস ইউনিট ইতিমধ্যেই পিপিপি মডেলে কাজ শুরু করেছে।

৮. এসএসকেএম হাসপাতাল, আইডি অ্যান্ড বিজি. হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৪টি নার্সিং কলেজ এবং সিউড়ি সদর হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আরও ২টি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল তৈরির কাজ চলছে। ২০১৭-১৮-তে মোট ৮টি (আটটি) নতুন জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জিএনএম) স্কুল অব নার্সিং চালু হয়েছে যার আসন সংখ্যা প্রত্যেকটিতে ৬০। জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জিএনএম) কোর্সে আসন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১৭৫।

৯. এইমস, কল্যাণী—৯৭০ শয্যাবিশিষ্ট এবং ১০০ আন্ডার গ্রাজুয়েট (এমবিবিএস) আসন বিশিষ্ট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে ১৭৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে।

১০. মেট্রো ব্লাড ব্যাঙ্ক, সেন্টার অব এক্সেলেন্স ইন ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, রাজারহাট, কলকাতা তৈরি হচ্ছে ৪০৩.৯৪ কোটি টাকা বিনিয়োগে।

১১. পশ্চিমবঙ্গে শিশু মৃত্যুর হার কমে হয়েছে প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর মধ্যে ২৫ যা কিনা জাতীয় গড় ৩৪ এর চেয়ে অনেক কম। শিশুমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে নবজাতকদের বিশেষ পরিষেবা প্রদান করার জন্য রাজ্যে ৬৮টি (আটষট্টি) এসএনসিইউ কার্যকর আছে এবং ৩০৭ (তিনশো সাত) সিক নিউবর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট (এসএনএসইউ) চালু করা হয়েছে।

১২. ডা. বি সি রায় পিজিআইপিএস এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদন সহ ১৩টি (তেরো) মেডিক্যাল কলেজে ১১টি (এগারো) পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং ৪টি (চার) পিআইসিইউ স্থাপন করা হচ্ছে।

১৩. গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ এবং আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য ৭টি (সাতটি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠান কাজ করছে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতাল, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, নদিয়া জেলা হাসপাতাল, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আরও একটি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব মুর্শিদাবাদ জেলার অনুপনগরে চালু করা হবে।

১৪. দপ্তরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ২০১০-এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৬৫% থেকে বেড়ে ২০১৭-তে হয়েছে ৯৫%-র বেশি।

১৫. এ রাজ্যের শিশুদের স্বাস্থ্যকর তথা রোগহীনভাবে বেড়ে ওঠার জন্য টীকাকরণ কর্মসুচিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যে ৯৪% শিশুর সম্পূর্ণ টীকাকরণ করা হয়েছে।

১৬. রোগীর বেশি চাপ থাকা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির প্রতিষ্ঠান, যেখানে বছরে ৩০০০-এর বেশি প্রসব হয়, সেইরকম ৬৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাতৃত্ব, নবজাতক এবং শিশুরোগ পরিষেবার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পিএসসি), কমিউনিটি হেলথ সেন্টার (সিএসসি), মহকুমা হাসপাতাল (ডিএস), স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (এসজিএস) এবং গ্রামীণ হাসপাতাল (আর এস)-এ প্রসব কক্ষ, অপারেশন থিয়েটার, শৌচাগার, পাওয়ার ব্যাকআপ এবং পানীয় কলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির উদ্যোগ নিয়েছে যার আনুমানিক খরচ ১৩২.৬৬ কোটি টাকা।

১৭. ডা. আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে পিপিপি মডেলে কোন বিম কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (সি বি সি টি) সহ রেডিওলজিকাল ডিপার্টমেন্ট চালু হয়েছে। ভারতের কোনও সরকারি হাসপাতালে এমন পরিষেবা এই প্রথম। সারা পশ্চিমবঙ্গে তিনটি ডেন্টাল কলেজ ছাড়া মেডিক্যাল কলেজ, জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতালের দন্তবিভাগে ২০০টিরও বেশি নতুন, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং সজ্জিত ইলেকট্রনিক্স ডেন্টাল চেয়ার স্থাপন করা হয়েছে। ডা. আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত ৫টি ডিজিটাল ক্লাসরুম আছে। ডা. আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের দুটি ক্যাম্পাসেই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ডব্লুবিডিএস-এ ২১৭ জন ডেন্টাল সার্জন এবং ডব্লুবিডিইএস-এ ৭২ জন ক্লিনিকাল টিউটরের নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়েছে। ডা. আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে সম্পূর্ণ ওয়াই-ফাই সুবিধাসহ একটি ই-লাইব্রেরি তৈরি করা হয়েছে।

১৮. সারা রাজ্যে হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদ এবং ইউনানি ডিসপেনসারির জন্য এসএমএস বেসড অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। কলকাতা হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ৫০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং পরিষেবা চালু হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি

পতঙ্গবাহিত অসুখগুলি (ভেক্টর বর্ণ ডিজিজ) হল একগুচ্ছ অসুখ যা মশা এবং অন্যান্য পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ যেমন ভারতবর্ষের মানুষেরা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া, জাপানী এনকেফালাইটিস, লিম্ফ্যাটিক ফাইলারিয়াসিস এবং কালাজ্বর-এ আক্রান্ত হন এবং মারা যান। পতঙ্গবাহিত রোগ মানুষ ও পতঙ্গের সংযোগের মাত্রার ওপর নির্ভর করে, তা আরো বৃদ্ধি পায় পতঙ্গের সদস্য বৃদ্ধি, তাদের নতুন পরিবেশে অভিযোজন এবং আবহাওয়া পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে।

নিবিড় পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে পতঙ্গ প্রতিরোধে, এছাড়া ভবিষ্যতে প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করতে পতঙ্গবাহিত রোগের উপর নজর রাখা হচ্ছে, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যে পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধে পয়েন্ট অ্যকশন প্ল্যান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পৌর ও নগরান্নোয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, স্কুলশিক্ষা দপ্তর, নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজসেবা দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনারদের নিয়ে পতঙ্গবাহী অসুখের জন্য স্টেট নোডাল মনিটরিং কমিটি তৈরি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, প্রত্যেক জেলায় জেলা শাসকের নেতৃত্বে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মনিটরিং টিম (ডিএলএম টি) গঠন করা হবে। ডিস্ট্রিক্ট ভেক্টর বর্ণ ডিজিজ কন্ট্রোল প্ল্যান-এর নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে এবং সকল জেলা শাসক এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তা জানানো হয়েছে এবং সকল নজরদারি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। রাজ্যের সকল পৌর এলাকায় সারা বছর ধরে পক্ষকালব্যাপী বাড়ি বাড়ি ঘুরে নজরদারি চালানো হবে। এছাড়া সব মিউনিসিপ্যালিটির সব ওয়ার্ডে ছয় সদস্যের ভেক্টর কন্ট্রোল টিম তৈরি করা হয়েছে যারা মশা/ পোকামাকড় যেখানে জন্মায় সেইগুলি চিহ্নিত করবে এবং সেগুলি ধ্বংস করবে।

মানসিক স্বাস্থ্য

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্যপ্রকল্প এনএমএইচপি-র অধীনে জেলা মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি (ডিএমএইচপি) বর্তমানে রূপায়িত হচ্ছে ৭টি জেলায় (উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও নদিয়া। দূরবর্তী ১০২০টি স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৪০,০০০ জন রোগী পরিষেবা পেয়েছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে ইনস্টিটিউট অব সাইকিয়াট্রিক-কে সেন্টার অব এক্সসেলেন্স হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতীয় ক্যানসার, ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার অসুখ এবং স্ট্রোক প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনপিসিডিসিএস):

ক্যানসার, ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার অসুখ এবং স্ট্রোক প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনপিসিডিসিএস) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলায় যথা— দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, আলিপুরদুয়ার-এ রূপায়িত হচ্ছে জেলা এনসিডি ক্লিনিক এবং এনসিডি সেল-এর মাধ্যমে। বাকি ৭ (সাত) টি জেলা (বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, ঝাড়গ্রাম, নন্দীগ্রাম, বিষ্ণুপুর, পশ্চিম বর্ধমান, রামপুরহাট) অনুমোদন পেয়েছে এবং এপ্রিল ২০১৮-এর মধ্যে চালু হবে। ৮ (আট) টি ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট

(সিসিইউ) তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলি জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, পুরুলিয়া, কোচবিহার, তমলুক, রামপুরহাট জেলা হাসপাতাল এবং ডায়মন্ড হারবার হেল্‌থ ডিস্ট্রিক্ট-এ ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা হাসপাতাল স্তর পর্যন্ত কেমোথেরাপি চালু করা হবে। এর জন্য মেডিক্যাল অফিসার ও নার্সদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

জনসংখ্যাভিত্তিক পরীক্ষা (পপুলেশনবেসড স্ক্রিনিং):

ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ এবং তিনটি সাধারণভাবে বেশি দেখা যায় এমন ক্যান্সার, যেমন মুখ, বক্ষ এবং সারভাইকাল ক্যান্সার দ্রুত নির্ণয়ের জন্য ৩০ বছরের বেশি বয়সি সমস্ত জনসংখ্যার জন্য জনসংখ্যাভিত্তিক পরীক্ষা আলিপুরদুয়ার, বীরভূম, আসানসোল এবং হাওড়া পুরসভার জন্য চালু হয়েছে। জেলায় কর্মীদের টিওটি (TOT) প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হয়েছে। আশা এবং এএনএম-দের প্রশিক্ষণ শাঘ্রই শুরু হবে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সব পাইলট উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ হয়েছে।

বয়স্কদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা (এনপিএইচসিই):

এই কর্মসূচিটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলায় চলছে (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর)। বয়স্কদের সমস্যার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে তাদের শারীরিক এবং মানসিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ ধরনের ওষুধ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার (এনপিপিসি):

দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের পরিষেবা দিতে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার (এনপিপিসি) প্রকল্প অনুসারে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, আলিপুরদুয়ার) পরিষেবা চালু হতে চলেছে। ২০১৭-এর ডিসেম্বরে জেলায় প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টার খোলার জন্য জেলা হাসপাতালগুলিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পূর্ণ হয়েছে।

পিপিপি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান ও রোগনির্ণয় কেন্দ্র

পিপিপি-তেও এসেছে পরিবর্তন। সম্প্রতি পিপিপি পরিচালিত কেন্দ্র থেকে পরিষেবা নিতেও রাজ্যবাসীকে কোনও অর্থ দিতে হচ্ছে না।

২০১২ সালে ৯১টি ন্যায্য রোগনির্ণয় কেন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল। সবকটিই চালু আছে। ক্যাপেক্স বাই গর্ভনমেন্ট মোডে। এর অর্থ, সরকারের জায়গা ও যন্ত্র। অংশীদার শুধু যন্ত্র চালানো ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করবে। এরমধ্যে ৬টি এম আর আই, ১৩টি সিটি স্ক্যান, ৩৪টি ডায়ালিসিস এবং ৩৮টি ডিজিটাল এক্সরে। এগুলি ছাড়াও আরও ৩৬টি ইউনিট ক্যাপেক্স বাই পার্টনার মোডে কাজ করছে নানা হাসপাতালে। এর মধ্যে ২৩টি সিটি স্ক্যান, ১১টি এমআরআই, ১টি ডিআর ও ১টি পেটস্ক্যান। ক্যাপেক্স বাই পার্টনার শব্দের অর্থ, সরকারের জায়গায় অংশীদারের যন্ত্র চলছে। যন্ত্র চালানোর দায়িত্ব অংশীদারের। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের মধ্যে ১১৬টি চালু হয়েছে। গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালস্তরে আরও ৪টি অনুমোদনের অপেক্ষায়। ২টি কেন্দ্রায়িত মেকানাইজড লনড্রি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ও বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে কার্যকর। সেখান থেকেই ৩৮টি হাসপাতালের কাজ পরিচালনা করে তারা। আরও একটি লনড্রি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চালু হয়েছে।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনলে ৪৮%-৭৭% ছাড় পাওয়া যায় বিক্রয়মূল্যের ওপর।

সূচনাকাল থেকে ২০১৮-র ৩০জুন পর্যন্ত মোট ১৯৭৯.৩২ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়েছে এইসব দোকানে। ৪৪০.৩৫ লক্ষ প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে। বিক্রয়মূল্যের ওপর ১২৪৭.৭৫ কোটি টাকার ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এই পরিমাণ অর্থমূল্যের সুবিধা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন।

কলকাতা ছাড়া অন্য জেলাগুলিতে ২০১৬ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত ২৭ লাখ রোগী বিনাপয়সায় সিটিস্ক্যান/এমআই/ডিআর সার্ভিস পরিষেবার সুযোগ পেয়েছেন। ১৫০৩৫ জন রোগীর সেবায় ৩১১২৬৭টি বিনামূল্যের ডায়ালিসিস সেশন চলেছে।

জেলাগুলিতে বিনা পয়সায় পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতি মাসে ৮.৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করছে সরকার।

কলকাতায় বর্তমানে পিপিপি মডেলে ২৩টি ইউনিট চালু আছে - ৩টি ডায়ালিসিস, ৫টি এমআরআই, ৬টি সিটি স্ক্যান, ৭টি ডিআর, ১টি পেট স্ক্যান এবং ১টি এভি ক্লিনিক। প্রতি মাসে প্রায় ৬৫০০০ রোগী সিটি/এমআরআই-এর সুবিধা পাচ্ছেন এবং ৩০০০টি ডায়ালিসিস সেশন-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কলকাতার জন্য বিনামূল্যের পরিষেবার ব্যবস্থা হয়েছে সম্প্রতি।

তথ্যসূত্র : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, স্বাস্থ্যভবন

নার্সিং এডুকেশন

নার্সিং পরিষেবায় উন্নতিসাধনের জন্য ২০১৭-১৮ সালে ৫৬.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এসএসকেএম হাসপাতাল এবং আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল (NTS) স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া এসএসকেএম হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ-এ সিওএন (CON) তৈরির কাজ হচ্ছে এবং সিউড়ি সদর হাসপাতাল ও নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল (NTS) তৈরির কাজ চলছে।

• ইউ কে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে নার্সিং ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে।

এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে :

(ক) WBIPH Knowledge Partnership যৌথভাবে লন্ডন স্কুল অব হাইজিন ও ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং ইনসটিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতা রূপায়ণ করবে।

(খ) UK-INDIA Joint Project on Nursing Skilling and Up-skilling যৌথভাবে হেলথ এডুকেশন ইংল্যান্ড, ইউ কে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মধ্যে ১৫ নভেম্বর, ২০১৭-তে স্বাস্থ্যভবনে একটি MoU (চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(গ) একটি দু'বছর মেয়াদি কর্মসূচি MSDE-UKIERI Project-III অনুমোদিত হয়েছে। এটি 'নার্সিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট টু ইমপ্রুভ কোয়ালিটি অব মেন্টাল হেলথ কেয়ার' বিষয়ক প্রকল্প। হেলথ এডুকেশন ইংল্যান্ড এই প্রকল্পের অন্যতম সহযোগী। প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

ইউ কে-ইন্ডিয়ার সঙ্গে এই যৌথ উদ্যোগে ফলাফল হিসাবে যেসমস্ত উন্নতিগুলো হবে সেগুলো হল :

ক) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষজ্ঞদের বিনিময়

খ) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার রিভিউ

গ) শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন ও পরিবর্ধন

ঘ) প্রশিক্ষণমূলক বিষয়ে পরিকল্পনা ও উদ্ভাবন

ঙ) উচ্চমানের পরিকাঠামোর উন্নয়নে সহায়তা ও মূল্যায়ন।

চ) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

ছ) স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষজ্ঞদের পশ্চিমবঙ্গ এবং ইউ কে-তে নিয়োগ ও বিনিময়

• ২০১৭-১৮-তে ৫২ জন ছাত্রী এমএসসি (নার্সিং)-এ, ৪৪৪ জন ছাত্রী বেসিক বিএসসি (নার্সিং)-এ এবং ২১৭৫ জন ছাত্রী জিএনএম কোর্সে ভর্তি হয়েছে। জিএনএম-এর আসন সংখ্যা ১২১৫ থেকে বাড়িয়ে ২১৭৫ করা হয়েছে।

• ৬৫৬২ জন স্টাফ নার্স গ্রেড-II নিয়োগ করা হয়েছে।

• ১৭২ জন হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট (মহিলা) কে নিয়োগ করা হয়েছে।

• ২০১৭-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতাল, বসিরহাট জেলা হাসপাতাল, ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল, জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল, কলেজ অব মেডিসিন ও সাগর দত্ত হাসপাতালে প্রতিটি ৬০ আসন সম্বলিত ৫টি জিএনএম (নার্সিং) স্কুল ২২.০৯.২০১৭ তারিখে চালু হয়েছে। উলুবেড়িয়া (হাওড়া), বারাসাত (উত্তর ২৪ পরগনা) এবং তমলুকে যে ৩টি জিএনএম (নার্সিং) সরকারি হাসপাতাল বাড়িগুলিতে চালু আছে সেগুলির জন্য নতুন ভবন তৈরির কাজ চলছে। লালগড় (পশ্চিম মেদিনীপুর)-এ আর একটি নতুন জিএনএম (নার্সিং) স্কুল চালু হয়েছে সেখানে ২০১৭-১৮ সালে আসন সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা হয়েছে। সিওএন (CON), বিএসএমসিএইচ (BSMCH) এবং আইডি অ্যান্ড বিজি (ID & BG)-এর নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। জিএনএম কোর্সে ৯৬০টি আসন বাড়ানো হয়েছে। হোস্টেল সহ ৫টি জিএনএম নার্সিং স্কুল তৈরি করা হয়েছে। আইডি অ্যান্ড বিজি (ID & BG) হাসপাতাল এবং বিএসএমসিএইচ (BSMCH)-এ ২টি নার্সিং কলেজের নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছে। ৩০টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত উন্নতিসাধন, নার্সদের জন্য প্রয়োজনীয় নার্সিং শিক্ষা প্রকল্প, এবং স্টাফ নার্সদের বর্তমান খালি পদগুলিতে নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত ২০১৮-১৯ সালের বাজেট বক্তৃতা।

উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন

১) স্নায়বিক সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের সুচিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১৭ সাল থেকে রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতাল (বাঙুর ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এর শাখা) কাজ শুরু করে। স্বাস্থ্য দপ্তর এই হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় ভবন নির্মাণ এবং কর্মীদের আবাসন নির্মাণের জন্য ১৯,১১,৯৫,৮২৪ টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এই হাসপাতালে সর্বোচ্চমানের নিউরোলজিক্যাল ক্লিনিক এবং রোগ নির্ণয় কেন্দ্র চালু করা হবে। কলকাতা পৌর নিগমকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকার এই প্রকল্প শেষ করার জন্য ২ বছরের সময়সীমা ধার্য করেছে।

২) 'রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অব নিওন্যাটোলজি'- পূর্বভারতে এই ধরনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এখানে ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত শিশুর চিকিৎসার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এই ভবনটির ৫ম -৮ম তল পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ২৬,২৭,৯৪,৪৫৯ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে আরো বেশি সংখ্যক বাবা-মা অসুস্থ নবজাতককে এখানে ভর্তি করতে পারবেন। এই ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২ বছর।

৩) IPGME&R-SSKM হাসপাতাল এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পরিষেবার চাপ কমানোর জন্য হাসপাতালগুলির সংস্কার করা হয়েছে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের 'ক্যাজুয়ালটি ভবনটি' পুনরায় সাজান, হাসপাতালের আয়তন বৃদ্ধি এবং সংস্কারের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই ২৬,০২,৫৫,২৫৭ টাকা বরাদ্দ করেছে। হাসপাতালের নতুন ভবনের নির্মাণ এবং সংস্কারের পর অস্থি চিকিৎসা বিভাগ, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ এবং রিহ্যাব (PMR) এবং তার সঙ্গে যুক্ত রোগ নির্ণয় বিভাগ এবং রিহ্যাব পরিষেবা, রেসপিরেটরি মেডিসিন (ফুসফুস/বক্ষ) বিভাগ এই ভবনে স্থানান্তর করা হবে। PWD এই সংস্কার এবং নির্মাণের কাজ করছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

৪) নদিয়া জেলার কল্যাণীতে AIIMS হাসপাতাল স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন- ওই এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, জল পৌঁছানোর ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা, সড়ক পরিকাঠামো নির্মাণ এবং ভূতল জল সরবরাহ পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। এর জন্য রাজ্য বাজেট থেকে ১১৫৮,৫৬,৬০,০০০ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এই প্রকল্প শেষ করার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে ২০২১ সাল।

৫) ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের আরো ভালো চিকিৎসার জন্য—মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ, বহরমপুর, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান এবং কলেজ অফ মেডিসিন এবং সাগর দত্ত হাসপাতালে CSS মডেলে তিনটি টারশিয়ারি ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। এই কাজের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখিত তিনটি হাসপাতালের জন্য যথাক্রমে— ২০৮,৫২,২০,৯৬৮ টাকা, ৩১,৯২,৫৫,৭১৫ টাকা এবং ৪২,২৪,১৬,৩৬৭ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কাজ শেষ করার জন্য সময়সীমা ধার্য হয়েছে ২—২.৫ বছর।

৬) এই তিনটি 'টারশিয়ারি ক্যানসার কেয়ার সেন্টার' (TCCC) ছাড়াও, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে একটি আঞ্চলিক ক্যানসার সেন্টার গড়ার অনুমোদনও স্বাস্থ্য দপ্তর দিয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৪৭,৮২,৩৭,১৫৬ টাকা। এই প্রকল্প শেষ করার সময়সীমা ধার্য হয়েছে ২ বছর।

তথ্যসূত্র : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, স্বাস্থ্যভবন

'মা ও শিশুর যত্ন পরিষেবা কেন্দ্র'

গর্ভবতী মায়েদের জন্য সরকারি হাসপাতালে নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থার জন্য ১২টি প্রতীক্ষাশালা অনুমোদন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা গ্রামীণ হাসপাতাল, ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলা মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতাল, বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার খুলনা গ্রামীণ হাসপাতাল, কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল, মুর্শিদাবাদ জেলার মহিষেল, তেঘড়ি ও শক্তিপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতাল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রামপাড়াছেঁচড়া, মালদা জেলার রতুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে এগারোটি প্রতীক্ষাশালা চালু করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর লাটাবাড়িতে তৈরি প্রতীক্ষাশালাটি মার্চ ২০১৮-এর মধ্যে চালু হয়ে যাবে।

ব্লাড সেফটি

৭৪টি কার্যকরী রাজ্য সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে। ১৩টি রাজ্য সরকারি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট (BCSU)-এ রক্তের উপাদান আলাদা করার কাজ ৫৫% বেড়েছে। রক্ত উপাদানের বাড়তি ও দ্রুত সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে ২৫টি নতুন বিসিএসইউ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যাতে প্রতি জেলায় অন্ততঃ একটি বিসিএসইউ থাকে।

আলিপুরদুয়ার

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

১৩

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৫

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

২

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

১

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

১

ফটো ফিচার

রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

ফালকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল

বাঁকুড়া

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

২৩

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

২

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

১৪

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

০

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

৩

* গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতাল
* বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিট

জেলা হাসপাতালে ফেকো ইউনিট

তালডাংরায় ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতাল

খাতড়া ব্লাড ব্যাঙ্ক

তালডাংরায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

বীরভূম

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৩৫

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

২

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৯

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

* নিরাময় টিবি স্যানিটোরিয়াম

সি টি স্ক্যান মেশিন

অসুস্থ নবজাতকদের পরিষেবা কেন্দ্র

সিউড়ী সদর হাসপাতাল

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

কোচবিহার

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

২৯

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৫

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৭

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

৪

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

০

এম জে এন হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স রে মেশিন

মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতাল

এম জে এন হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

অসুস্থ নবজাতকদের পরিষেবা কেন্দ্র

এম জে এন হাসপাতালে ডায়লাসিস রুম

দক্ষিণ দিনাজপুর

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

১৮

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

১

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৭

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

রক্ত সংগ্রহের ঘর

গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাল

গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

সি টি স্ক্যান সেন্টার

দার্জিলিং

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

১৬

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

১০

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৩

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

২

জেলা হাসপাতাল (DH)

২

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

০

* দার্জিলিং টিবি হাসপাতাল
* এস বি দে টিবি স্যানেটোরিয়াম(কার্শিয়াং)
* উ: ব: মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

নকশালবাড়ি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র

মিড-ডে মিল সহায়িকাদের অ্যাপ্রন বিতরণ

ফাঁসিদেওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মানবশৃঙ্খল

কালিম্পং

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৫

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৩

মহকুমা হাসপাতাল, কালিম্পং

কালিম্পং জেলা হাসপাতাল

রামবি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কালিম্পং

হুগলী

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৬০

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

১০

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৮

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

১

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

৩

জেলা হাসপাতাল (DH)

২

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

* ইমামবাড়া সদর হাসপাতাল

ডায়লাসিস ইউনিট

অসুস্থ নবজাতকদের পরিচর্যাকেন্দ্র

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

হাওড়া

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৪১

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

২

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

১৩

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

৬

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

১

* সত্যবালা দেবী আইডি হাসপাতাল (সালকিয়া)

অসুস্থ নবজাতকদের পরিচর্যাকেন্দ্র

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট

হাওড়া জেলা হাসপাতালে ডায়ালাসিস ইউনিট

আমতা গ্রামীণ হাসপাতাল

নার্সিং ছাত্রীদের হোস্টেল, উলুবেড়িয়া

জলপাইগুড়ি

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

২৫

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৪

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৩

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

সদর হাসপাতালে ডায়লাসিস ইউনিট

সদর হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

ঝাড়গ্রাম

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)	২৫
ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)	১
গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)	৭
স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)	০
মহকুমা হাসপাতাল (SDH)	১
জেলা হাসপাতাল (DH)	১
সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)	২

ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

লালগড়ে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল

নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

মালদা

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৩৪

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৪

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

১১

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

০

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

১

* ইবিএম মাতৃ সদন (ইংলিশ বাজার), মালদা
* মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যাকেন্দ্র

নৌক অ্যাম্বুলেন্স 'আমার তরী'

নদিয়া

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৪৮

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

১০

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৭

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

৩

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

২

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

০

* ড. বিসি রায় চেস্ট স্যানেটোরিয়াম (ধুবুলিয়া)
* গান্ধি মেমোরিয়াল হাসপাতাল (কল্যাণী)
* নেতাজি সুভাষ স্যানেটোরিয়াম (কল্যাণী)
* কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্হ জেএনএম হাসপাতল

নদিয়া জেলা হাসপাতালে এম সি এইচ হাব

উত্তর ২৪ পরগনা

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

২৭

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

১০

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

২

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

৭

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

৩

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

* কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হাসপাতাল

জেলা হাসপাতালে সি সি ইউ

বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নবজাতক পরিচর্যাকেন্দ্র

অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র

দিঘড়া উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বসিরহাটে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল ও হোস্টেল

পশ্চিম বর্ধমান

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৩৪

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৯

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

২

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

১

অসুস্থ সদ্যজাতদের পরিষেবাকেন্দ্র

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট

ডায়লাসিস ইউনিট

ন্যায্য মুল্যের ওষুধের দোকান

পশ্চিম মেদিনীপুর

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৫৭

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৩

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

১৮

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

২

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

৫

* এমআর বাঙ্গুর টিবি স্যানেটোরিয়াম, দিগরি
* মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

সিটি স্ক্যান ইউনিট

অসুস্থ নবজাতকদের পরিচর্যাকেন্দ্র

অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র

জেলা হাসপাতাল

শালবনীতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

পূর্ব বর্ধমান

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৭২

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

০

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

১৯

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

২

জেলা হাসপাতাল (DH)

০

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

১

* বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বর্ধমান মেডিকেল কলেজে সি সি ইউনিট

বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নবজাতক পরিচর্যাকেন্দ্র

কালনা হাসপাতাল

পূর্ব মেদিনীপুর

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

২৯

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

১২

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

২

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

২

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

জেলা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিন

জেলা হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট

জেলা হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ডায়ালাসিস পরিষেবা কেন্দ্র

এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

পূর্ব মেদিনরপুর জেলাহাসপাতাল

পুরুলিয়া

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

৫৩

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

১৫

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৪

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

০

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

* ইন্সটিটিউট অফ মেন্টাল কেয়ার
* দেবেন মাহাত সদর হাসপাতাল
* বংশগড় সি এইচ সি

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট

ডিজিটাল এক্স রে পরিষেবা

ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান

দেবেন মাহাত সদর হাসপাতাল

পুরুলিয়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

উত্তর দিনাজপুর

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

১৮

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৪

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৫

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

১

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

জেলা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান ইউনিট

জেলা হাসপাতালে ডায়লাসিস ইউনিট

অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র

জেলা হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট

রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল

রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

স্বাস্থ্যজেলা

নাম	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)	ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)	গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)	স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)	মহকুমা হাসপাতাল (SDH)	জেলা হাসপাতাল (DH)	সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)
বসিরহাট	২৩	৫	৫	০	০	১	০
বিষ্ণুপুর	২৩	১	৫	০	০	১	১
ডায়মন্ডহারবার	২৮	৪	৯	০	১	১	২
নন্দীগ্রাম	২২	১০	১ (রেয়াপাড়া)	১ (দিঘা)	১ (কন্টাই)	১	১
রামপুরহাট	২৩	২	৬	০	০	১	১

বসিরহাট জেলা হাসপাতাল

বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট, ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল

সদ্যজাতদের বিশেষ পরিষেবা ইউনিট, ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল

বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

মুর্শিদাবাদ

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

২৮

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৪

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৯

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

বহরমপুর মেন্টাল হাসপাতাল

ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

সকলের জন্য স্বাস্থ্য

বিশেষ স্বাস্থ্য সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ ২০১৮

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC)

২৮

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (BPHC)

৪

গ্রামীণ হাসপাতাল (RH)

৯

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল (SGH)

০

মহকুমা হাসপাতাল (SDH)

১

জেলা হাসপাতাল (DH)

১

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH)

২

বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল

ক্যানিং হাসপাতাল

বিদ্যাসাগর হাসপাতাল

কলকাতা

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

- রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতাল
- নর্থ সুবার্বন হাসপাতাল
- বিসি রায় পোলিও হাসপাতাল
- লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল
- ইন্দিরা মাতৃসদন
- অবিনাশ দত্ত মেটারনিটি হোম
- রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অব অপথালমোলজি
- ক্যালকাটা পাভলভ হাসপাতাল
- পাতিপুকুর টিবি হাসপাতাল
- ইন্সটিটিউট অব সাইকিয়াট্রি
- ক্যালকাটা ন্যাশানাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
- এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল
- আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ
- এসএসকেএম হাসপাতাল
- বিসি রায় পিজিআইপিজিএমআর চিলড্রেন
- চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হাসপাতাল
- আইডি অ্যান্ড বিজি হাসপাতাল
- স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন
- বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অব নিউরোলজি

স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন

বিসি রায় শিশু হাসপাতাল

এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কলেজস্ট্রিট

আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ

সাত বছরে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

পরিকল্পনা খাত (টাকায়)

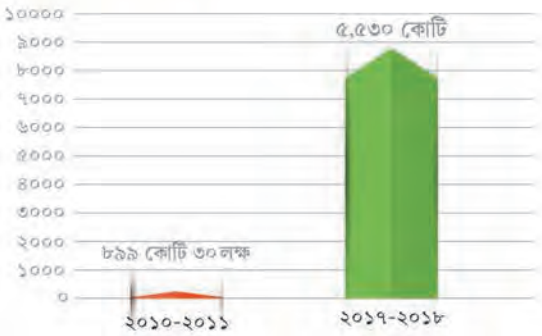

- ৬ গুণের বেশি বৃদ্ধি
- পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও এবং আরও বেশি সম্পদ

সম্পূর্ণ টীকাকরণ

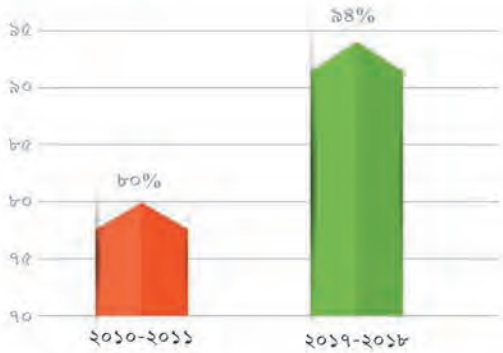

- টীকাকরণের ব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি
- শক্তিশালী ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব

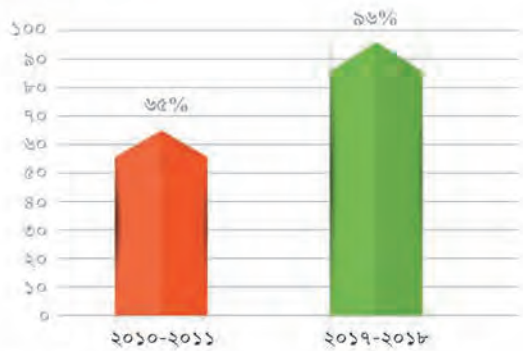

- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষায় আরও মনোযোগ

প্রসবকালীন মৃত্যুর অনুপাত

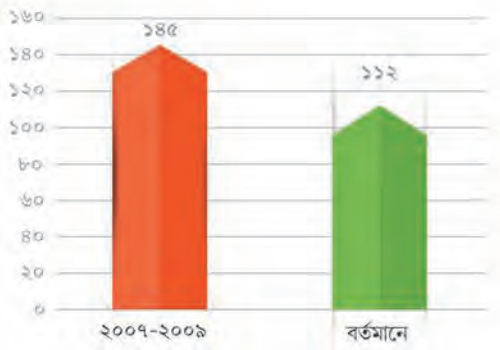

- প্রসবকালীন মৃত্যুর উল্লেখযোগ্য হ্রাস
- মায়েদের স্বাস্থ্যের উপর আরও মনোযোগ

শিশু মৃত্যুর হার

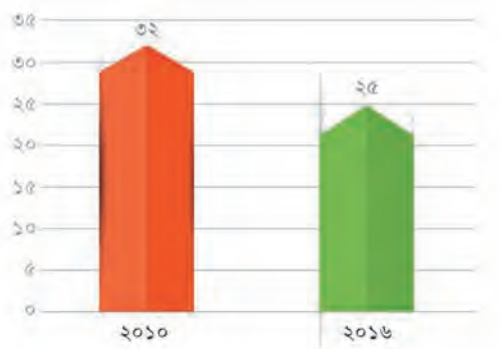

- শিশু মৃত্যুর উল্লেখযোগ্য হ্রাস
- স্বাস্থ্যকর মানবসম্পদ গঠন

হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা

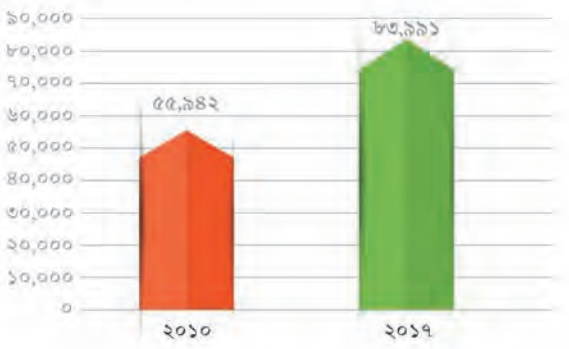

- ২৮ হাজারেরও বেশি শয্যার বৃদ্ধি
- স্বাস্থ্য পরিসেবা এখন আরও সহজে

ব্লাড ব্যাংক

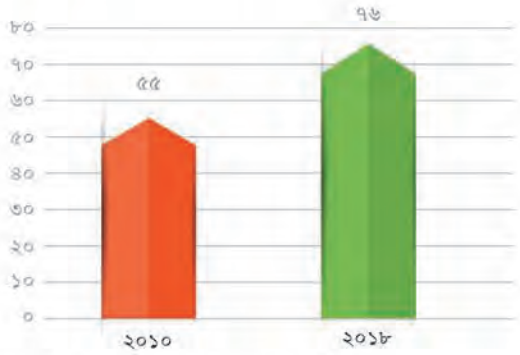

- ব্লাড ব্যাংকের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি
- জরুরিকালিন সময়ে সহজলভ্যতা বৃদ্ধি

অসুস্থ নবজাতক স্থিতিশীলতা কেন্দ্র (এসএনএসইউ)

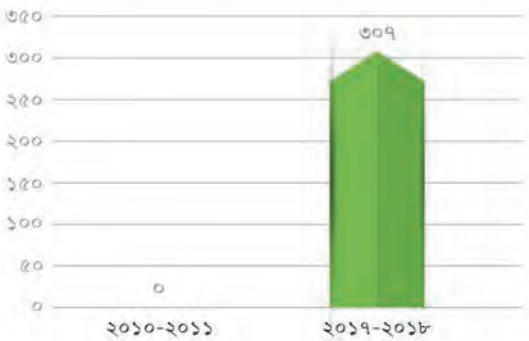

অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র (এসএনসিইউ)

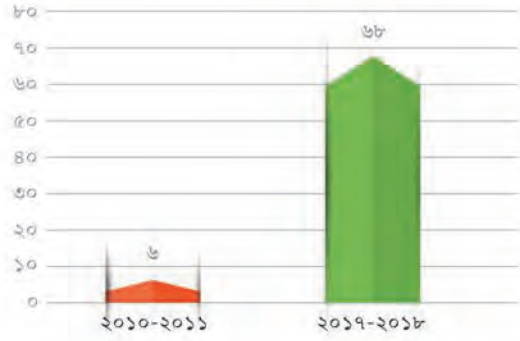

- সদ্যোজাতের বহুবিধ যত্নের দিকে আরও দৃষ্টিনিক্ষেপ
- শিশুমৃত্যুর হারের হ্রাসে এই ফলের প্রতিফলন ঘটছে

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বাজেট, নীতি ও পরিকাঠামো

- **বাজেট :** সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে যা ছিল ৮৯৯.৩ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫,৫৩০ কোটি টাকা। ৭ বছরে বিপুলভাবে ৬ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি হয়েছে।
- **বিনামূল্যে চিকিৎসা নীতি :** ২০১৩ সালের প্রথম থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত রাজ্য সরকারি হাসপাতালে সবার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য, রোগীদের খরচ কমানো, তা সে যে কোনো আয়ের লোকই হোক না কেন। এর মধ্যে রয়েছে ওষুধপত্রের দাম, ব্যবহার্য জিনিস, শরীরে বসানোর যন্ত্র, রোগ নির্ণয় খরচ, শয্যার ভাড়া ও আরও অন্যান্য তাৎক্ষণিক খরচ যা এতদিন রোগীরাই বহন করতেন।
- **দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপ্যারেন্সি) অ্যাক্ট, ২০১৭ :** ১৭ মার্চ, ২০১৭ থেকে দেশের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ও সবচেয়ে কার্যকরী আইন চালু হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের লক্ষ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

  চিকিৎসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে ১৭ মার্চ, ২০১৭ থেকে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিসমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং তা এখন কাজ করছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবার ঘাটতি এবং/অথবা রোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খরচ নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি প্রদানের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে এই কমিশন।
- **শয্যা সংখ্যা :** পুরনো ও নতুন সরকারি হাসপাতালে ২৮,০০০ এর উপর নতুন শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে—বর্তমানে সর্বমোট শয্যার সংখ্যা **৮৩,৯৯১টি**।
- **মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (এসএসএইচ) :** প্রতিটি হাসপাতালে ৩০০/৫০০ শয্যা রয়েছে, এরকম ৪২টি মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চালু হতে চলেছে। এর প্রকল্প খরচ ২,৭১৪ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে ৩৯টি হাসপাতাল কাজ শুরু করেছে। এই বছরের শেষাশেষি বাকিগুলি কাজ শুরু করবে।

- **ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান :** ১১৫টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। এই দোকানগুলি সর্বাধিক খুচরো মূল্যের (এমআরপি) উপর ৪৮- ৭৭.২% ছাড় দিচ্ছে। ২০১৭ এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪ কোটি মানুষ ১,১০০ কোটি টাকারও বেশি এই ছাড়ের সুবিধা নিয়েছে।
- **ন্যায্য মূল্যের রোগ নির্ণয়কেন্দ্র :** ইতিমধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে ৮৮টি ইউনিট (১২টি সিটি স্ক্যান, ৫টি এমআরআই, ৩৮টি ডিজিটাল এক্স রে এবং ৩৩টি ডায়ালিসিস ইউনিট) চালু রয়েছে।
- **নতুন জেলা ও স্বাস্থ্য জেলা তৈরি :** নন্দীগ্রাম, বিষ্ণুপুর, রামপুরহাট, ডায়মন্ড হারবার ও বসিরহাটে ৫টি নতুন স্বাস্থ্যজেলা সহ আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান চারটি নতুন জেলা তৈরি করা হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য জেলার সংখ্যা ১৯ থেকে ২৮টি হয়েছে। এটি জেলা স্তরের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রশাসনকে শৃঙ্খলায় বাঁধতে ও উন্নত করতে সাহায্য করেছে।
- **নার্সিং প্রশিক্ষণ স্কুল :** লভ্য নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের সংখ্যা ২০১১ সালের ২৫ থেকে ২০১৮ সালে ৩৯-তে উন্নীত করা হয়েছে। এর সঙ্গে আসন সংখ্যা ৮৫০ (২০১১) থেকে বেড়ে ২১৭৫ (২০১৮)-তে আনা হয়েছে। আরও একটা নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে নার্সিং কলেজের সংখ্যা ৯ থেকে বেড়ে ১০ হয়েছে। এর আসন সংখ্যাও ৩৩০ থেকে বেড়ে ৮৬০ করা হয়েছে।
- **স্বাস্থ্য সাথী :** ইতিমধ্যে ৪৫ লক্ষ পরিবারকে এই প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে। স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীর সদস্য, আইসিডিএস কর্মী, আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার বাহিনী, অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবী, নির্বাচিত চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত কর্মী, কেবল টিভি অপারেটর ইত্যাদি পেশায় মানুষরা বর্তমানে এর অন্তর্ভুক্ত।
- **আরএসবিওয়াই (রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা) :** ৬৩ লক্ষের বেশি পরিবার এই রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতাভুক্ত। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা অধীন তালিকা ভুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা গত বছরের ১,২৯৩ থেকে বেড়ে ১৩০৮ তে আনা হয়েছে।
- **ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাল্যায়েড মেডিক্যাল অ্যান্ড প্যারা মেডিক্যাল কাউন্সিল:** সহযোগী মেডিক্যাল ও প্যারা মেডিক্যাল পেশাদারদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সুসমন্বিত উন্নয়নের জন্য দি ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাল্যায়েড মেডিক্যাল অ্যান্ড প্যারা মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ২০১৫ পাশ করা হয়েছে।

  প্যারা মেডিক্যাল ও অ্যাল্যায়েড মেডিক্যাল সায়েন্সেস ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার মান বজায় রাখাই এই কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য।

- প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য
  - **প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব :** রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের পরিমাণ ২০১০-১১ এর ৬৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-২০১৮ তে ৯৬% হয়েছে।
  - **সম্পূর্ণ টীকাকরণ :** রাজ্যে সম্পূর্ণ টীকাকৃত শিশুর সংখ্যা ২০১০-১১ সালে যেখানে ছিল ৮০% সেখানে ২০১৭-১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪% হয়েছে।
  - **প্রসবকালীন মৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) :** রাজ্যে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এক লক্ষ জীবিত প্রসবের ক্ষেত্রে ২০০৭-০৯-এ এই মৃত্যুর হার ছিল ১৪৫। এই পরিসংখ্যান এখন ১১২। এটা জাতীয় গড় ১৬৭ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো।
  - **শিশু মৃত্যুর হার (আইএমআর) :** পশ্চিমবঙ্গে শিশু মৃত্যুর হার খুবই হ্রাস পেয়েছে। ২০১০-এ ১,০০০ জীবিত প্রসবের ক্ষেত্রে এই মৃত্যুর হার ছিল ৩২। ২০১৬-তে তা ২৫ এ নেমে এসেছে। এটা জাতীয় গড় ৩৪ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো।
  - **অসুস্থ নবজাতক স্থিতিশীলতা কেন্দ্র (এসএনএসইউ) :** সদ্যোজাতের বিভিন্ন ধরনের যত্নের জন্য সব মিলিয়ে ৩০৭টি এসএনএসইউ চালু করা হয়েছে। ২০১১-এর আগে সরকারি কোনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোনও এসএনএসইউ ছিল না।
  - **অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র (এসএনসিইউ) :** সদ্যোজাতদের বিশেষ যত্ন নিতে এখন রাজ্যে ২,২১৭টি অতিরিক্ত শয্যাসহ ৬৮টি এসএনসিইউ কাজ করছে। এগুলো অবশ্যই সদ্যোজাত ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে সাহায্য করেছে। কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল ও শ্রীরামপুর মহকুমা হাসপাতালে আরও ২টি এসএনসিইউ এই বছরের শেষাশেষি কাজ শুরু করবে। ২০১১ এর আগে রাজ্যে মাত্র ৬টি এসএনসিইউ ছিল।

    সারা ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক অসুস্থ নবজাতকদের পরিচর্যার শয্যা ও ইউনিট আছে পশ্চিমবঙ্গেই।
  - **মাদার ও চাইল্ড হাব :** ১৬টি মা ও শিশু হাবের মধ্যে অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধাসহ ৭টি ইউনিট চালু হয়ে গেছে।
  - **প্রসব কেন্দ্রগুলোর ব্যাপক উন্নতিকরণ :** ১৩২ কোটি টাকা খরচ করে মাতৃত্ব, সদ্যোজাত ও শিশু রোগ সংক্রান্ত পরিষেবাগুলোর ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নতিবিধান করা হয়েছে। যে সমস্ত স্থানে এই উন্নতিবিধান করা হয়েছে সেগুলো হল - ধাত্রী কক্ষ, ধাত্রী শল্যকক্ষ, মাতৃত্ব ওয়ার্ড, সদ্যোজাত ওয়ার্ড, শিশু রোগ চিকিৎসা ওয়ার্ড ও অন্যান্য সাহায্যকারী পরিষেবাক্ষেত্র। এগুলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতাল স্তর পর্যন্ত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের অংশস্বরূপ ৩০২টি ধাত্রীকক্ষ, ৩৮৯টি শল্যকক্ষ, ১০৭৫টি টয়লেট ব্লক ও ৯৭৫টি পানীয় জলের ইউনিটের ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও, প্রতিবছর ৩০০০টি প্রসব করানোর ক্ষমতা সম্পন্ন ৬৮টি হাসপাতালের উন্নতিবিধান করা হচ্ছে। যার মধ্যে ৩৮টিতে কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বাকিগুলোতে কাজ চলছে।

- **হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক :** পূর্ব ভারতে প্রথম হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক এসএসকেএম হাসপাতালে স্থাপিত হয়েছে। নাম 'মধুর স্নেহ'। এসএনসিইউ/এনআইসিইউ তে ভর্তি থাকা ১,৫৫০টি সদ্যোজাত এই দুগ্ধ ব্যাংক থেকে ২০১৭ সালে পাস্তুরাইজড্ বা জীবাণুমুক্ত দুধ পেয়েছে।

- **শিশু সাথী :** শিশু সাথী নামক এক অভূতপূর্ব প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের (১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত) নিখরচায় শল্য চিকিৎসা দেওয়া হয়। শিশুর জন্মগত হৃদরোগজনিত রোগ, কাটা ঠোঁট ও জোড়া আঙুল এই চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। সূচনালগ্ন থেকে ১৩ হাজারের অধিক শিশু এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।

- **পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র (এনআরসি) :** গত ৭ বছরে বিভিন্ন জেলায় ৫১টি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য চরমভাবে অপুষ্টির শিকার হওয়া শিশুদের চিকিৎসা করা ও এই পরিবারগুলোকে পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদান।

- **স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র :** হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস ইত্যাদি ছোঁয়াচে নয়, এরকম রোগসহ ব্যাপক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করতে ১০,৩৫৭টি উপকেন্দ্রগুলোকে ৫ বছরের মধ্যে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

  এগুলো যাদের দ্বারা পরিচালিত হবে তাঁরা হলেন কমিউনিটি স্বাস্থ্য আধিকারিক, কমিউনিটি স্বাস্থ্য এএনএম এর ৬ মাসের ব্রিজ কোর্স করা কমপক্ষে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চাকুরিরতা জিএনএম নার্স, বিভিন্ন ধরনের কর্মী ও আশা কর্মী।

  বাৎসরিক ৮০০ কোটি টাকার রেকারিং খরচসহ ১০০০ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়ণ খরচ এখানে বিনিয়োগ করা হবে।

- **মাতৃ যান :** গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের জন্য চালু থাকা নিশ্চয় যান পরিষেবার ক্ষেত্রে ২৪ × ৭ **এমারজেন্সি ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এই পরিষেবা কেন্দ্রীয়ভাবে টোল ফ্রি নম্বর ১০২-তে ফোন করে পাওয়া যায়।** গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করা এই পরিষেবার উদ্দেশ্য। নিখরচায় বাড়ি থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চতর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাতে এবং বাড়িতে মা ও শিশুকে ফেরৎ পাঠানোও এই পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত।

  প্রকল্পটি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২০১৭ সালের ১১ ডিসেম্বর পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থেকে উদ্‌বোধন করেন। ১০০০টি অ্যাম্বুলেন্স বিশিষ্ট এই প্রকল্পে বেসিক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমসহ একজন করে চালক ও সহকারি/আয়া থাকবে।

- **মেডিক্যাল শিক্ষা**

  - **নতুন মেডিক্যাল কলেজ :** ২০১১ সাল থেকে ৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ (মালদা মেডিক্যাল কলেজ; কলেজ অফ্ মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটাল, উত্তর ২৪ পরগনা; মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ, বহরমপুর ও কলেজ অফ্ মেডিসিন অ্যান্ড জে এন এম হসপিটাল, নদিয়া) ও ৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ (আইকিউসিটি দুর্গাপুর; আই কেয়ার মেডিক্যাল কলেজ, হলদিয়া; গৌরী দেবী ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, দুর্গাপুর) চালু হয়েছে।

    এগারোটি (১১টি) মেডিক্যাল কলেজ চালু হতে চলেছে — রামপুরহাট (বীরভূম), কোচবিহার, উলুবেড়িয়া (হাওড়া), আরামবাগ (হুগলি), জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, বারাসত (উত্তর ২৪ পরগনা), তমলুক (পূর্ব মেদিনীপুর), পুরুলিয়া, ডায়মন্ড হারবার (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ও রায়গঞ্জে (উত্তর দিনাজপুর)।

    কল্যাণীতে একটি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস চালু হতে চলেছে।

    প্রস্তাবিত নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোকে অতিরিক্ত প্রায় ১,২০০টি এমবিবিএস পাঠক্রমের আসন থাকবে।

  - **মেডিক্যাল আসন :** গত ৭ বছরে এমবিবিএস ও বিডিএস (দাঁত সংক্রান্ত) পাঠক্রমে সর্বমোট ১,৩৪৫ আসন বাড়ানো হয়েছে। আরও ১০০টি আসন বাড়ানোর কাজ এগোচ্ছে।

  - **পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল আসন :** বর্তমান মেডিক্যাল কলেজগুলোকে ৪৯৩টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ও ৬৪টি পোস্ট ডক্টরাল আসন বাড়ানো হয়েছে।

- **ডিপ্লোমেট অব ন্যাশনাল বোর্ড (ডিএনবি) :** মেডিক্যাল শিক্ষা ক্ষেত্রের নতুন পদ্ধতি চালু করে সরকার ১০টি জেলা হাসপাতালে স্নাতকোত্তর স্তরের ডিএনবি পাঠক্রম চালু করেছে। এতে মেডিক্যাল সায়েন্সের পাঁচটি বিভাগ আছে। এটা চালু করার উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ঘাটতি পূরণ।

  মেডিক্যাল শিক্ষাক্ষেত্রে এই উদ্যোগ একেবারেই অভিনব। তাই এটি ভারত সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের প্রভূত প্রশংসা পেয়েছে।

- **চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত কর্মচারী/ব্যক্তি**

  - **হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (ডব্লিউবিএইচআরবি) :** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে দ্রুত ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩.৯.২০১২ তারিখে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন করে।

  - **নিয়োগ :** গত সাত বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৭ হাজার নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে। সর্বমোট ৯,৭৭০ জন মেডিক্যাল আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে ও তাঁদের স্থায়ীভাবে বহাল করা হয়েছে। এছাড়া গত ৭ বছরে ১৭ হাজারেরও বেশি নার্স, ফার্মাসিস্ট ও টেক্‌নিশিয়ান নিয়োগ করা হয়েছে।

    অতিরিক্ত ৯,৩৮২ টি পদে নিয়োগের জন্য হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে বলা হয়েছে।

  - **অবসরের বয়স :** বিদ্যমান মেডিক্যাল আধিকারিকদের পদে রেখে দিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসেস; ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক হেলথ-কাম -অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেলথ সার্ভিসেস ও ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিসেস এ অবসরের বয়স ৬২ বৎসর থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বৎসর করা হয়েছে।

- **বিশেষজ্ঞ পরিষেবা**

  - **ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট :** মধ্য স্তরীয় ও সর্বোচ্চ স্তরীয় হাসপাতালে ৪১টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) ও ২৪টি হাই ডিপেন্ডেনসি (এইচডিইউ) ইউনিট ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে। এই বছরের শেষের মধ্যে আরও ৬টি এরকম সিসিইউ/এইচডিইউ চালু হবে। ২০১১ সালের আগে কোনো জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে সিসিইউ-এর অস্তিত্ব ছিল না।

  - **পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (পিআইসিইউ) :** ইতিমধ্যে ১১টি পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট চালু আছে। এই বছরের শেষাশেষি আরও ৪টি চালু হবে।

- **সদ্যোজাত (নিওনেটাল) ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (এনআইসিইউ) :** সদ্যোজাত অসুস্থ শিশুদের জন্য ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে স্টেট-অব্-দ্য-আর্ট ভেন্টিলেশন পরিষেবাসহ ১৫টি সদ্যোজাত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই মেডিক্যাল কলেজগুলোর মধ্যে ডা. বি সি রায় পিজিআইপিএস এবং চিত্তরঞ্জন সেবাসদনও আছে। প্রকল্পের কাজ অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপে আছে।

- **পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি ওয়ার্ড :** কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৪টি ডায়ালিসিস মেশিন সহ একটা পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।

- **ক্যানসার রোধ করতে ব্যবস্থাগ্রহণ :** ক্যানসার রোগীদের জন্য এক্সটার্নাল বিম রেডিয়েশন চিকিৎসার জন্য ৩টি মেডিক্যাল কলেজ, ৫টি স্টেট অব দি আর্ট লিনিয়ার অ্যাকসিলেটর (LINAC) মেশিন বসানো হচ্ছে ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই ৩টি মেডিক্যাল কলেজ হল—আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ, এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। উপরন্তু ৯৩ কোটি টাকা খরচ করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলেজ অব মেডিসিন ও সাগর দত্ত হাসপাতালে ৩টি সর্বোচ্চ স্তরের ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে।

  এছাড়াও, কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৪৭ কোটি টাকা প্রকল্প খরচ ধরে একটা আঞ্চলিক ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র (আরসিসি) তৈরি করা হচ্ছে।

  তৃতীয় শ্রেণির কেয়ার হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনে দিনের দিন ক্যান্সার কেমোথেরাপির পরামর্শ দেওয়া হয়। এখন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমান জেলা হাসপাতালে ডে কেয়ার ভিত্তিতে এই থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। এটা ক্যান্সার রোগীদের কাছে বড় স্বস্তিদায়ক ও সুবিধাজনক। এরকম সুবিধা অন্যান্য জেলা হাসপাতালেও শীঘ্রই শুরু করা হবে।

- **টেলিমেডিসিন পরিষেবা :** অপথ্যালমোলজি, কার্ডিওলোজি, নেফ্রোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি, হেমাটোলজি, নিউরোমেডিসিন সাধারণ শল্য চিকিৎসা এবং অর্থোপেডিক্স বিভাগে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা দিতে সাপ্তাহিক নির্দিষ্ট দিনে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলিতে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে হাব ও স্পোক মডেলে টেলিমেডিসিন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ত্রিস্তরীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে যতজন চিকিৎসককে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদের পরামর্শমত পার্শ্ববর্তী ইউনিটের বিশেষজ্ঞরা রোগীদের চিকিৎসা করছেন।

- **মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা :** কমিউনিটি স্তর পর্যন্ত মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত পরিষেবা প্রসার করতে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নামক পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান প্রশিক্ষিত কর্মচারীদের জন্য ও ভর্তি থাকা রোগীদের জন্য এবং সুস্থ হওয়া রোগীদের পুনর্বাসন দিতে এই পাঠক্রম চালু করা হয়েছে।

  কমিউনিটি মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অঙ্গ হিসেবে আরও ৭টি জেলায় ডিস্ট্রিক্ট মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রাম (ডিএমএইচপি) চালু হয়েছে। ২০১১ সালের আগে ডিএমএইচসি প্রকল্প চালু ছিল মাত্র ৪টি জেলায়।

  মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে সেন্টার অফ্ এক্সসেলেন্স কলকাতার ইনস্টিটিউট অব্ সাইকিয়াট্রিতে চালু করা হয়েছে। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে আরেকটি সেন্টার অব্ এক্সসেলেন্স তৈরির প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে।

  কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে মানসিক রোগীদের জন্য একটি হাসপাতাল গড়ার কাজ চলছে।

- **রক্ত সংরক্ষণ ইউনিট (বিএসইউ) :** বিভিন্ন কমপ্রিহেনসিভ এমারজেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার ডেলিভারি পয়েন্টে (ফাস্ট রেফারাল ইউনিট এফআরইউ) ৭৬টি রক্ত সংরক্ষণ ইউনিট গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৪৮টি চালু হয়েছে। বাকিগুলোর কাজের অগ্রগতি ঘটছে।

- **রক্ত নিরাপত্তা :** রাজ্য সরকারের অধীন ১৭টি রক্ত উপাদান আলাদা করার ইউনিট (বিসিএসইউ) সহ ৭৬টি ব্লাড ব্যাংক চালু আছে। ২০১৮ সালে ১২টি ব্লাড ব্যাংক ও ২১টি বিসিএসইউ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই অর্থবর্ষেই সেগুলো কাজ শুরু করবে।

- **মেট্রো ব্লাড ব্যাংক :** ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের বিষয়ে সেন্টার অব এক্সসেলেন্স কলকাতার নিউটাউনে, রাজারহাটে চালু হবে।

- **কর্ড ব্লাড ব্যাংক :** পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কর্ড ব্লাড ব্যাংক তৈরির এক অনবদ্য উদ্যোগ নিয়েছে। পূর্ব ভারতে এটি সরকারি স্তরে প্রথম কর্ড ব্লাড ব্যাংক।

- জন স্বাস্থ্য

  - **ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণা ও রোগনির্ণয় ল্যাবরেটরি :** "মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামলাতে ল্যাবরেটরির নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা" নামক এই প্রকল্পের অধীনে ১১টি মেডিক্যাল কলেজে ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণা ও রোগ নির্ণায়ক গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে।

- **জন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট) :** কল্যাণীতে ২০১৬ সালে একটি ইনস্টিটিউট অব্ পাবলিক হেলথ তৈরি করা হয়েছে। এখানে ২ বছরের একটি বিভিন্ন বিভাগ বিষয়ে মাস্টার অব পাবলিক হেলথ নামক একটা পাঠক্রম পড়ানো হয়।

- **পতঙ্গবাহিত রোগ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ :** ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ইত্যাদি সহ পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ে এই প্রথম একটা যুগ্ম অ্যাকশান প্ল্যান (জেএপি) তৈরি করা হয়েছে। জ্যাপে (JAP) সমস্ত জেলা ও কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক বিস্তারিত মাইক্রো প্ল্যান তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। লার্ভা সনাক্তকরণের জন্য বাড়ি বাড়ি যাওয়া, লার্ভার দমন এবং উৎস বিনষ্ট করার কাজ চালানো হয়েছে ১২৭টি স্বশাসিত পৌর সংস্থা ও বাছাই করা গ্রাম্য অঞ্চলে। কলকাতা পৌরসভা তা করছে সপ্তাহে সপ্তাহে।

  ৯১ হাজারেরও বেশি কর্মী/জরিপকারী কর্মচারী, এক টায়ার বিশিষ্ট তত্ত্বাবদায়ক ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণকারী টিম সদস্যরা এবং বন বিভাগের কর্মচারী এই কাজে নিযুক্ত।

  পতঙ্গবাহিত রোগ দমন করতে কখনো এত বিপুল সংখ্যক কর্মচারি কাজে নামানো হয়নি।

- **থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প :** ২০১১ সাল থেকে ১০টি থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণ ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। যার সর্বমোট সংখ্যা এখন ২২ এ দাঁড়িয়েছে।

  ২০১১ সাল থেকে ৮ লক্ষ লোককে এই সংক্রান্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। এক লক্ষের বেশি বাহককে চিহ্নিত করা হয়েছে ও ১৫ হাজারের বেশি রোগী এই ইউনিটগুলোতে চিকিৎসা পেয়েছেন।

- **সহায়তা পরিষেবা**

  - **বিষ বা বিষাক্ত সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্র :** বিষ সম্পর্কিত তথ্য দিতে ও বিষ আক্রান্ত ব্যাক্তিদের আরও ভালো পরিকল্পনা দিতে বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে বিষ সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

  - **দক্ষতা রসায়নাগার :** মাতৃত্বকালীন মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর কথা মাথায় রেখে নার্সিং কলেজ/নার্সিং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ২০টি দক্ষতা বৃদ্ধিকারক গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, চাকুরিরতা নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধি। এরকম দক্ষতা বৃদ্ধিকারী গবেষণাগারের অস্তিত্ব আগে ছিল না।

- **ব্রিটিশ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে নার্সিং ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে যৌথ অংশিদারিত্ব।**

  নার্সিং ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে যৌথ অংশীদারিত্ব চুক্তি ইউকেআইইআরআই (ইউনাইটেড কিংডম ইন্ডিয়া এডুকেশন রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ) প্রকল্পে আন্তর্জাতিক অংশীদার হেলথ এডুকেশন ইংল্যান্ড, ইউনাইটেড কিংডম এর সঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে -

  - ✓ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত পেশাদারদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা আদান প্রদানের জন্য একটি চুক্তি হয়েছে।
  - ✓ হেলথ এডুকেশন ইংল্যান্ড এর সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গে অ্যাডভান্সড নার্স প্রাকটিশনার্স কোর্স চালু হয়েছে।
  - ✓ পশ্চিমবঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন ঘটাতে এমএসডিই ও ইউকেআইইআরআই প্রকল্প - ৩ অধীন নার্সিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট নামে ২ বছরের একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

- **আয়ুশ :** গত সাত বছরে আয়ুশ কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সে আসন সংখ্যা যথাক্রমে ৬৯০ থেকে ৭৪০ ও ১০ থেকে ১৯ করা হয়েছে।

  ৩০টি আসনসহ আয়ুর্বেদিক ফার্মেসি সার্টিফিকেট কোর্সকে ডিপ্লোমা কোর্সে উন্নীত করা হয়েছে।

  ২০টি আসন সহ এক বছরের পঞ্চকর্মা সহকারি কোর্স চালু করা হয়েছে।

  তিব্বতের ঔষধ পদ্ধতি জনপ্রিয় করতে দার্জিলিং এর ছাপগপোরি মেডিকেল কলেজকে আর্থিক সাহায্য প্রধান করা হয়েছে।

  পূর্ণতাপ্রাপ্ত আয়ুশ হাসপাতালে বহির্বিভাগের পরিষেবা এখন আলিপুরদুয়ারের তোপসিকাথায় চালু করা হয়েছে। আরেকটি পূর্ণতা প্রাপ্ত আয়ুশ হাসপাতাল পশ্চিম মেদিনীপুরে ও বেলুড়ে যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি ডিগ্রি কলেজ চালু হতে চলেছে। আয়ুশ কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান ও দেখভালের জন্য ১৯টি জেলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে।

- **স্বাস্থ্য সুরক্ষা :** রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ঠিকভাবে ধরে রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতায় অবস্থিত খাদ্য পরীক্ষা রসায়নাগারের অতিরিক্ত আরেকটি পরীক্ষাগার শিলিগুড়িতে স্থাপিত হয়েছে।

  খাদ্য ব্যবসায়ী পরিচালকদের লাইসেন্স প্রদান ও নিবন্ধীকরণ এখন সমস্ত জেলাতেই অনলাইনে হচ্ছে।

  রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা ও মানক অ্যাপিলেট ট্রাইবুন্যাল স্থাপন করা হয়েছে।

  খাদ্য সুরক্ষা কমিশনার ও লাইসেন্স প্রদান কর্তৃপক্ষ/ডেজিগনেটেড আধিকারিক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

  ২৩ জন বিচার আধিকারিক ও নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের কথা বিজ্ঞপিত হয়েছে।

- **যৌথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এসএমআইএস) :** ওষুধের ফরমায়েশ করা, জোগাড় করা ও ওষুধ দেওয়ার পুরো পদ্ধতিটাই পুরোপুরিভাবে ইলেকট্রনিক করতে নতুন এসএমআইএস এর উন্নতিবিধান করা হয়েছে। এইভাবে খাতায় কলমে লেজার ও রেজিস্টার রাখার প্রথা বাদ দেওয়া হয়েছে।

- **ফাইল ট্র্যাকিং পদ্ধতি ও ই-অফিস :** দপ্তরের সব বিভাগেই ফাইল ট্রাকিং পদ্ধতির পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপরন্তু স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সমস্ত শাখায় ই-অফিস ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে।

- **হাসপাতালের সৌন্দর্যায়ন :** পুর বিষয়ক ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সমন্বয়ে জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল ও রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের সৌন্দর্যায়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

  ১৬টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ২২টি জেলা হাসপাতালে সৌন্দর্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। ২৫টি মহকুমা ও রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে সৌন্দর্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

- **রাত্রিকালীন আশ্রয়স্থল :** আবাসন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে সমস্ত মহকুমা/স্টেট জেনারেল হাসপাতাল/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর পরিজনদের জন্য রাত্রি কালীন আশ্রয়স্থল গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। চারটি হাসপাতালে এই রাত্রিকালীন আশ্রয়স্থল গঠন করা হয়েছে। আরও ৮টি তে এই গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

- **জন অভিযোগ নিষ্পত্তি** : স্বাস্থ্য ভবনে জন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা যথাযথভাবে চলছে। টোল ফ্রী নম্বর ১০৪ চালু করা হয়েছে। এজন্য **pgms.wbhealth.gov.in** এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণ টোল ফ্রী নম্বরে টেলিফোন করে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারেন।

- **ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল ইউনিট (এমএসইউ)** : রাজ্যের কঠিন ও দুর্গম স্থানে রোগ নিরাময় পরিষেবা পৌঁছে দিতে ৫০টি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট (এমএসইউ) কার্যকরী আছে।

  বছরে ২০ লক্ষ মানুষ এতে উপকৃত হচ্ছেন। যে অঞ্চলগুলোতে এই পরিষেবা পৌঁছছে তার মধ্যে দার্জিলিং এর পাহাড়ী অঞ্চল, উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন ও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং এর নিকটস্থ চা বাগান।

- **প্রথা বহির্ভূত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী (ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স)** : যেখানে অন্য স্বাস্থ্য সেবা কম পৌঁছানোর কথা সেখানে এই প্রথা বহির্ভূত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেন। এরা অপ্রশিক্ষিত, স্বনিযুক্ত ও ঝুঁকি গ্রহণকারী স্বাস্থ্যকর্মী। দুর্গমস্থানে তাঁদের উপস্থিতির কারণে রাজ্যে অনেক সময় তাঁরাই একমাত্র রোগীদের অবলম্বনের বিষয় হন। মানুষ তাঁদের ভরসাও করেন।

  সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে তাঁরা যাতে ভুল পদ্ধতির আশ্রয় না নেন সেজন্য তাঁদের জ্ঞান বাড়াতে দক্ষতা বৃদ্ধিকারক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

  এক লক্ষ এরকম স্বাস্থ্য কর্মীদের চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ব্যাচে ৬ মাসের কোর্স করানো হচ্ছে।

- **হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ** : সরকারি হাসপাতালে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিরাপত্তা ও নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মোট ১৩৩টি হাসপাতালকে বাছাই করা হয়েছে ও ১,৯৩৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।

  এটা লক্ষ করা যেতে পারে, এই নজরদারি ব্যবস্থা ৩৯টি সুপার স্পেশালিটি/মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ১,৮৭৭ জন নিরাপত্তা প্রহরী বাইরে থেকে এনে কাজে লাগানো হয়েছে। অন্যান্য হাসপাতালগুলোর জন্য এর সংখ্যা ১,৯৭৭ জন।

- **হাসপাতাল পরিচ্ছন্নতা :** সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ঝাড়ু দিতে বা পরিচ্ছন্ন রাখতে ৫,৭৩৩ জন সাফাইকর্মী বাইরে থেকে আনানো হয়েছে।

- **অভিনব প্রকল্প :**
  - **'গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ওয়েটিং হাট' নামক এক অভিনব ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে।**

    গর্ভবতী মহিলা, বিশেষত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এই 'ওয়েটিং হাট' প্রকল্পটি আনা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক জন্মদান ও গুণান্বিত ধাত্রীবিদ্যা প্রক্রিয়ার জন্য এই প্রকল্প উদ্‌ভাবন করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলারা এখানে এসে সম্ভাব্য জন্মদান তারিখের ৭ থেকে ১০ দিন আগেই হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরাসরি ডাক্তারের তত্ত্বধানে থাকতে পারবেন। এই ওয়েটিং হাটে অবস্থানকালীন সময়ে ওই গর্ভবতী মহিলাদের ওষুধপত্র, পথ্য, রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা ও প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য অন্য জায়গায় পাঠানোর সুবিধাও দেওয়া হবে।

  - **মায়েদের চড়ুইভাতি - নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানিক জন্মদানের জন্য এক উদ্‌ভাবনী প্রকল্প**

নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক জন্মদানের জন্য এক উদ্‌ভাবনী প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যা লোকে 'মায়েদের চড়ুইভাতি' — এই জনপ্রিয় নামে ডাকে। এটা রাজ্যের বাছাই করা ব্লক ও সমস্ত জেলায় চালু হয়েছে। বাছাই করা উপকেন্দ্র থেকে যাদের বাড়িতে প্রসব করার সম্ভাবনা আছে, নিকটবর্তী প্রসবকেন্দ্রে বেড়াতে আনা হয়। তারা সেখানে সুযোগ সুবিধাসহ প্রসব ঘর, যেখানে তারা নিরাপদে তাদের বাচ্চা প্রসব করতে পারেন, দেখানো হয়। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব করার সুবিধা সম্বন্ধেও অবহিত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১

২

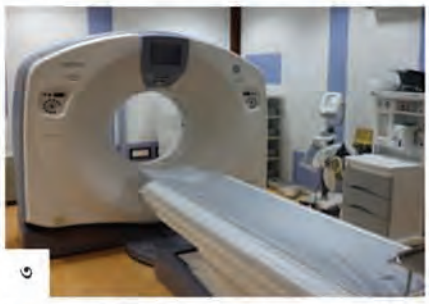
৩

৪

৫

৬

১ রোগীরা যাতে তাঁদের সামর্থ্যের মধ্যেই ছাড় পেয়ে ওষুধ কিনতে পান সেজন্য ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান (এফপিএমএস) — এই একেকটা ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান বসাতে খরচ (মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল — ১ কোটি টাকা, জেলা হাসপাতাল-০.৭৫ কোটি টাকা, মহকুমা হাসপালাল/স্টেট জেনারেল হাসপাতাল -০.৫ কোটি টাকা, গ্রামীণ হাসপাতাল-০.২৫ কোটি টাকা)।

২ ও অ্যান্ড এম মডেলে ৫টি হাসপাতালে ১.৫ টেসলা ক্ষমতাসম্পন্ন এমআরআই মেশিন বসানো, মেশিন বসাতে ইউনিট খরচ ৭৮৮ টাকা।

৩ **সিটি স্ক্যান ইউনিট**
- ১৩ নং ইউনিট বসানোর পরিকল্পনা, যার মধ্যে ১২টা কার্যকরী।
- একটা ইউনিটের খরচ ১৯৫.৫ লক্ষ টাকা।

৪ **ডিজিটাল এক্সরে ইউনিট**
- ৩৮টি বসানোর পরিকল্পনা আছে, যার মধ্যে ৩৮টি কার্যকরী
- প্রতিটিতে ইউনিট খরচ ১৩১.৭ লক্ষ টাকা

৫ **ডায়ালিসিস ইউনিট**
- ৩৪টি তৈরির পরিকল্পনা আছে। যার মধ্যে ৮টি ১০ শয্যার আর ২৬টি ৫ শয্যার।
- ৩৩ টি ইউনিট ইতিমধ্যে কার্যকরী।
- প্রতিটি ইউনিট বসানোর খরচ — ৫ শয্যার ৪৮.৫৫ লক্ষ টাকা করে ও ১০ শয্যার জন্য ৭৭.৩৭ লক্ষ টাকা করে।

৬ ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য স্টেট-অব্-টি আর্ট এলআইএনএসি (লিন্যাক) বাতানুকুল যন্ত্র।

এসএসকেএম হাসপাতাল

বিবর্তনের পথে পিজি হাসপাতাল

১৭০৭। গার্স্টিন প্লেসে পুরোনো দুর্গের মধ্যে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল শুরু হল। ১৭৫ ফুট লম্বা, ৬০ ফুট চওড়া একটি বাড়িতে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল তৈরি করল এই হাসপাতাল। ভারতে আসা ইউরোপিয়ানদের জন্য তৈরি করা হয় প্রাথমিক পর্যায়ে। নাম দেওয়া হয় প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল।

১৭৬৮। লোয়ার সার্কুলার রোড-এ দু-টুকরো জমি কেনা হল। উদ্দেশ্য, একটি সম্পূর্ণ হাসপাতাল গড়ে তোলা। প্রেসিডেন্সি জেলের কাছাকাছি গড়ে ওঠা এই হাসপাতালের নাম হল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল। সংক্ষেপে পরিচিত হয়ে উঠল পিজি হাসপাতাল নামে। ১৭৭০-এর ২ এপ্রিল থেকে ইউরোপিয়রা ছাড়া অন্যদের চিকিৎসার জন্যও দরজা খুলে দেওয়া হল।

১৯৪৭। ভারত স্বাধীন হল। নতুন ভারত গড়ার কাজ হল শুরু। দেখা দিল পিজি হাসপাতালের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা। স্থানীয় মারওয়ারি সম্প্রদায়ের শেঠ সুখলাল কারনানির সহায়তায় শুরু হল এই সম্প্রসারণের কাজ। তাঁর স্মৃতিতে নামকরণ হল—শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল। সংক্ষেপে—এসএসকেএম হাসপাতাল। যদিও সকলের মুখে মুখে থেকেই গেল সেই পুরোনো নাম—পিজি হাসপাতাল।

তখনকার দিনে কলকাতার চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্ররা উচ্চতর স্তরের পাঠ (স্নাতকোত্তর) নেওয়ার জন্য বিদেশে যেত। এটাই যেন হয়ে গিয়েছিল প্রথা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় অনুভব করলেন যে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে এখানেই উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

১৯৫৭ সালে পূর্বভারতে প্রথম এই হাসপাতালে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ শুরু হল। কলেজের নাম হল—ইন্সটিটিউট অব পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইপিজিএমই এন্ড আর- IPGME & R)। ক্লিনিক্যাল ডিসিপ্লিনগুলিতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং দেওয়ার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট হল।

১৯৫৭ সালের ১৬ জানুয়ারি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্‌বোধন করলেন।

ওই সময়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিন (UCM) চালু করল। উদ্দেশ্য প্রি এবং প্যারাক্লিনিক্যাল ডিসিপ্লিনগুলিতে পোস্ট-গ্রাজুয়েট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই পাঠ্যক্রম শুরুর জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি হল এসএসকেএম এবং আইপিজিএমই এন্ড আর-এর উত্তর-পশ্চিম দিকে। নাম হল ডা. বিসি রায় ইন্সটিটিউট অব বেসিক মেডিক্যাল সায়েন্সেস। দেখা গেল, পাশাপাশি দুটি প্রতিষ্ঠান সমন্বিত উদ্যোগে উদ্দেশ্য পূরণে তড়িৎগতিতে এগিয়ে যেতে লাগল।

আইপিজিএমই এন্ড আর সুপার-স্পেশালিটি রেফারেল হাসপাতাল এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট-মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট হিসেবে সকলের নজর কাড়ল। একের পর এক নতুন নতুন ইউনিট সংযুক্ত হল। উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পালক লাগল মাথায়। যেমন রেসপিরেটরি কেয়ার ইউনিট, বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস (BIN), দ্য ইন্সটিটিউট অব

সাইকিয়াট্রি (স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে মানসিক হাসপাতাল হিসেবে যেটি গড়ে ওঠে) এবং ইন্সটিটিউট অব কার্ডিও ভাসকুলার সায়েন্সেস। একই পরিসরে একটি নার্সিং স্কুল এবং একটি নার্সিং কলেজ চালু হয়। ২০০৪ সাল থেকে এমবিবিএস পড়ানোও শুরু হয় ১০০টি আসনে।

২০০৭-এ তিনশো বছর পূর্ণ করল হাসপাতাল, পালিত হল আইপিজিএমই এন্ড আর-এর স্বর্ণজয়ন্তী।

ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতাল সমন্বিত ভাবে কতগুলি ক্লিনিক্যাল বিভাগ এবং ল্যাবরেটরি চালু করেছে।

সারা রাজ্য তথা পূর্ব ভারতে এই হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। ফলে রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে আরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। চলছে নিত্য নতুন চিন্তাভাবনা।

চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে এটি। দেশসেবায় নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক তৈরি করার মহান ব্রতে আজও নিমগ্ন এখানকার অধ্যাপককুল। ভারতবর্ষে এটি আজ অন্যতম প্রতিষ্ঠানের শিরোপা অর্জন করেছে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং সুপার স্পেশালিটি লেভেল মেডিক্যাল কোর্সের জন্য। লক্ষ্য সর্বোচ্চ স্থান অর্জন। এই হাসপাতালের সাম্প্রতিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ও সাফল্য নিয়ে প্রস্তুত করা হল ই ক্রোড়পত্র।

এসএসকেএম হাসপাতালে স্পেশাল ক্লিনিক

এলার্জি	চেস্ট
আরিদমিয়া	কার্ডিওলজি
আর্সেনিক	মেডিসিন
অডিও ভেস্টিবিউলার	ইএনটি
ব্রেস্ট	সার্জারি
কার্ডিও ডায়াবেটোলজি	মেডিসিন
ক্লিনিকাল ইমিউনোলজি	মেডিসিন
ডে কেয়ার সার্জারি	ইউরোলজি
ডার্মাটোলজি অ্যান্ড কসমেটিক সাজারি	ডার্মাটোলজি
ডায়াবেটিক	এনডোক্রিনোলজি
ফলোআপ/ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারি	ইউরোলজি
জেরিয়াট্রিক	মেডিসিন
গ্লোমেরিউলোনেফ্রাইটিস	নেফ্রোলজি
হ্যান্ড	প্লাস্টিক সার্জারি
হেমাটোলজি	মেডিসিন
হেপাটোলজি (লিভার)	গ্যাসট্রোএনটেরোলজি
হাই রিস্ক নিউ বর্ন	নিওনেটোলজি
আইবিডি (ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ)	গ্যাসট্রোএনটেরোলজি
আইবিএস (ইরিটেবেল বাওয়েল সিনড্রোম)	গ্যাসট্রোএনটেরোলজি
আইএলডি (ইনটারস্টিয়াল লাঙ ডিজিজ)	চেস্ট
ইনফার্টিলিটি	জি অ্যান্ড ও

কিডনি ট্যান্সপ্ল্যানটেশন	নেফ্রোলজি+এমআরইউ
লেপ্রসি	ডার্মাটোলজি
এমডিআর টিবি	চেস্ট
নিওনেটাল নিউরো ডেভেলপমেন্ট	নিওনেটোলজি
প্যালেট অ্যান্ড ফেসিও ম্যাক্সিলারি	প্লাস্টিক সার্জারি
পেডিয়াট্রিক অ্যাসথমা/এলার্জি	পেডিয়াট্রিক মেডিসিন
পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি	পেডিয়াট্রিক মেডিসিন
পেডিয়াট্রিক রিউমেটোলজি	পেডিয়াট্রিক মেডিসিন
পিপিটিসিটি (প্রিভেনসন অব পেরেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন)	জি অ্যান্ড ও
রিউমেটলজি	মেডিসিন
আরএনটিসিপি (রিভাইসড ন্যাশনাল টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম)	চেস্ট
স্ট্রোক	মেডিসিন
থাইরয়েড	এনডোক্রিনোলজি
টিউমর	জি অ্যান্ড ও
আলট্রা সাউন্ড প্রোস্টেট বায়োপসি	ইউরোলজি + নেফ্রোলজি
ইউরো-অনকোলজি	ইউরোলজি
ইউরো-রেডিওলজি	ইউরোলজি+রেডিওলজি
ভিসিসিটিসি (ভোলানটারি কনফিডেন্টশিয়াল কাউনসেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার)	জি অ্যান্ড ও
ভিটিলিগো	ডার্মাটোলজি

এসএসকেএম হাসপাতালে ট্রান্সপ্ল্যান্ট অফ রিজিওন্যাল অরগ্যান্স (কিডনি,লিভার,স্কিন,করনিয়া) ক্লিনিক

প্রতিবেদনের ছবি : সৌরভ দত্ত

রাজ্য জুড়ে নবজাতক পরিচর্যায় অত্যাধুনিক ব্যবস্থা : পথপ্রদর্শক পিজি হাসপাতাল

পিজি-র ফলো-আপ ক্লিনিকে জয়ীকে দেখছেন ডা. সুচন্দ্রা মুখার্জী, পাশে জয়ীর মা।

কথা হচ্ছিল, সুচন্দ্রা মুখার্জির সঙ্গে জয়ী সাফুই-এর। সুচন্দ্রাদি মিষ্টি করে ডেকে চলছিলেন, জয়ী, জয়ী......।

জয়ী সাফুই। পৈলানের আমগাছিয়া ইন্দ্রকানন পার্কের বাসিন্দা রুমি ও প্রণবের সন্তান। ২৮ সপ্তাহেই পৃথিবীর আলো দেখে ফেলেছিল জয়ী। ওজন ছিল মাত্র ১ কেজি। কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে জন্ম তার। সেখান থেকে পাঠানো হয় হাজরায় শিশুসদনে। সেখানে ১ মাস ভেন্টিলেশনে রাখা হয় জয়ীকে। কিছুদিন পর সুস্থ হলেও জয়ীকে ফের ভেন্টিলেশনে রাখার দরকার পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয়বার শিশুসদনে ভেন্টিলেশন-এর শয্যা ফাঁকা পায়নি জয়ী। সেখান থেকে এসএসকেএম। এক মাস ধরে এখানেই নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসা চলে জয়ীর। ছুটির সময় ১ কেজি ৮৫০ গ্রাম ওজন হয়েছিল তার। সেই থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এসএসকেএম-এর নিকু-তে ফলো আপ ক্লিনিকে জয়ীকে নিয়ে আসেন তাঁর বাবা-মা।

জয়ীর বয়স এখন ১ বছর কয়েক দিন মাত্র। এখানকার চিকিৎসায় কি উপকার পেয়েছেন কোনও? রুমির জবাব চলে এল তখনই—'অবশ্যই। এখানে না এলে মেয়েকে তো বাঁচাতেই পারতাম না।'

পিজি হাসপাতালের নিও-ন্যাটোলজিতে গেলে বোঝা যাবে, কত সমস্যা নিয়ে আসছেন বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের। সময়ের আগে জন্ম নেওয়া বা কম ওজনের শিশুদের নিয়ে আসছেন এখানে। বলা হচ্ছে—early intervention unit।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলাম সুচন্দ্রাদির কথা। স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কথকতা শুনতে শুনতে বিস্ময় ক্রমশঃ ঘন হচ্ছিল।

মাতৃগর্ভে শিশু কীভাবে গড়ে ওঠে, কোন সময় কোন কোষ কোথায় কীভাবে অঙ্গ গঠনে অংশ নেয়, এইসব কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল বিস্তারিতভাবে যেন সকলের জন্য লিখে ফেলি।

সামান্য গোলমালে জীবনে কতো বড়ো সমস্যাই না নেমে আসে।

কম ওজনের যে শিশু জন্ম নিল, তাকে নিয়ে সকলের চিন্তা। ৪৮৫ গ্রামের একটি শিশুকে পাওয়া গেল। কৃত্রিমভাবে বড়ো করতে হবে তাকে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সঠিক বৃদ্ধি না হলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। চোখ, কান, দাঁত নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো আছে, আছে মানসিক সমস্যাও।

কথা হচ্ছিল, নিউরো-ডেভেলপমেন্ট উইং-এর সঙ্গে যুক্ত কাউন্সেলর, চক্ষু, দন্ত, কর্ণ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। বলছিলেন নানা ঘটনার কথা। সময়ে চিকিৎসা শুরু না হওয়ায় কত জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ২১ দিনের মধ্যে চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার।

ফলো-আপ ক্লিনিকে ডা. সুচন্দ্রা মুখার্জী

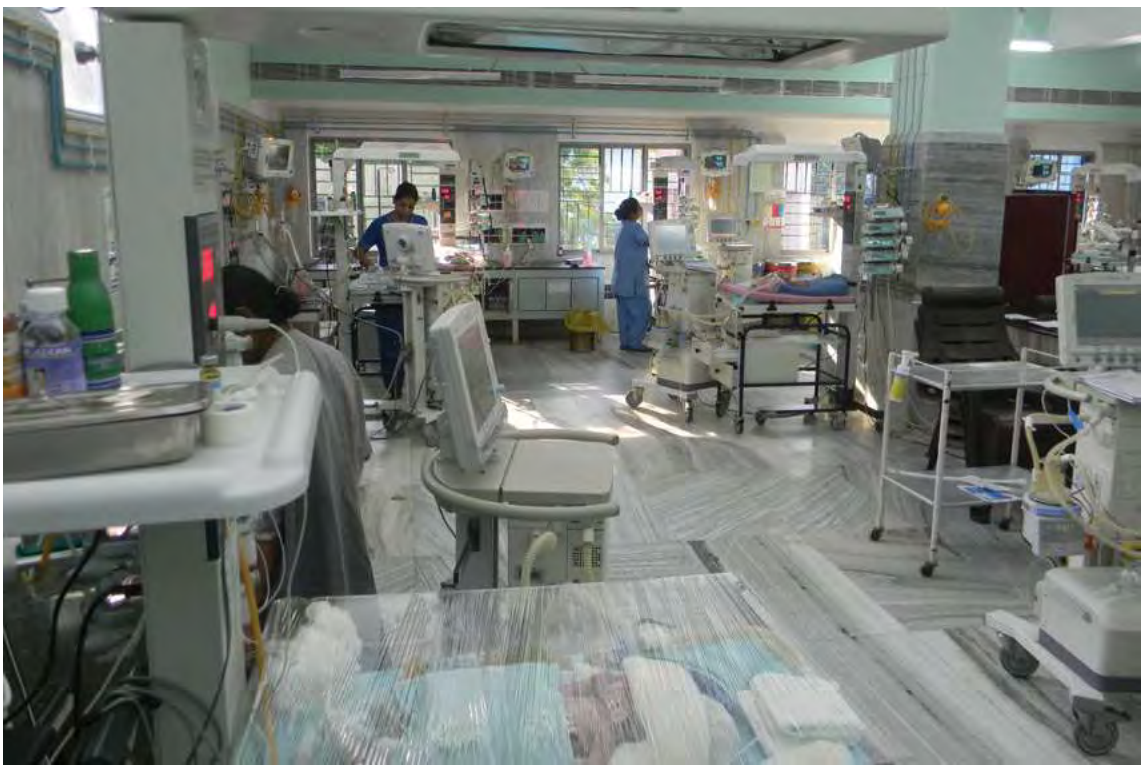

পিজি-তে চলছে অসুস্থ নবজাতকদের চিকিৎসা

নবজাতক

ওরা নবজাতক। ওদের জন্য আমাদের ভাবনা ও কাজ পবিত্র কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই নবজাতক-এর জন্য পৃথিবীর উষালগ্ন থেকেই আদি ও অকৃত্রিম এক মমতার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সবরকম প্রাণের মধ্যেই এই ধারা আমরা দেখি। পশু জগতের দিকে তাকালে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। পরম যত্নে তারা সন্তান পালন করে।

মানব জগতেও এই প্রাণের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে মানুষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, আজ যে শিশু পৃথিবীর আলো দেখল, কাল সেই আর এক শিশুকে নিয়ে আসবে পৃথিবীতে। এইভাবেই চক্রাকারে এই ধারা চলবে।

তাই একটি শিশুর জন্ম কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিরাট ঘটনাপ্রবাহের একটি অংশ মাত্র। শিশুর জন্মদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে মা এবং বাবা। মায়ের গর্ভে শিশু বড়ো হয় প্রায় দশ মাস অর্থাৎ ৪০ সপ্তাহ ধরে শিশু নিজেকে গড়ে তোলে একটু একটু করে। মায়ের কাছ থেকে একটি ডিম্বাণু ও বাবার কাছ থেকে পাওয়া শুক্রাণু নিয়ে গড়ে ওঠে এই শরীর।

মায়ের গর্ভে সন্তান কীভাবে নিজেকে গড়ে তোলে সেটা সকল বাবা ও মায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা দরকার। বর্তমানে সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচির সঠিক ও সার্থক রূপায়ণই ভাবীকালের বাবা-মাকে শিক্ষিত করে তুলবে বা তুলছে—এই আশা আমরা রাখতে পারি। ‘সকলের জন্য স্বাস্থ্য’—এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণই পারে সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই সুযোগ পৌঁছে দিতে। শিক্ষিত বাবা-মা-ই পারে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে এবং সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে।

আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক বিন্যাস যেভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, সেখানে প্রচলিত অনেক আচার-প্রথা আজ হারিয়ে গিয়েছে। মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছে থেকে গর্ভবতী মা আজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গর্ভাবস্থায় সন্তানের জন্য কী করতে হবে, কীভাবে থাকতে হবে সেসব শিখতে পারে না। তার উপর আছে কর্মব্যস্ত জীবন। প্রত্যেক মহিলাই ছোটো-বড়ো কোনও না কোনও অর্থকরী কাজের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সময়ই পারিপার্শ্বিক কাজের চাপে ও প্রয়োজনে গর্ভস্থ সন্তানের জন্য তার কী কী করণীয় বা অকরণীয় সেগুলি অসচেতনভাবে ভুলে যায়।

এর ফলে অনেক সময়ই দেখা যায়, গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধি ঠিক হয় না, অপরিণত অবস্থায় শিশুর জন্মদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই ধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে নানা

সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন ধরে সঠিক চিকিৎসা ও পরিচর্যায় হয়তো এই অসুবিধা কিছুটা দূর হয়। কখনও বা সারাজীবন ধরে শিশু ও শিশুর পরিবারকে এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। রাজ্য বা রাষ্ট্রের পক্ষেও এইসব শিশুর জন্য যা যা করণীয় তা সবসময় সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব হয় না।

তাই সরকার, সমাজ, পরিবার একযোগে 'সুস্থ শিশু'-র জন্মদানকে একই সঙ্গে বাঁধতে চেয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে কাজ চলছে। আমরা প্রায় সকলেই সেগুলি সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু এই প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া, পুষ্টিকর খাবার দেওয়া বা গর্ভবতী মা-কে অর্থ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

আজ প্রয়োজন—প্রশিক্ষিত কর্মীর যাঁরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সকলকে বোঝাবেন—যে শিশু মায়ের গর্ভে আসবে/আসছে তার জন্য আমাদের দায়িত্ব কতটা, আমাদের কোথায় সচেতন হতে হবে।

কজন শিক্ষিত মা-বাবা জানেন গর্ভাবস্থায় শিশুর গড়ে ওঠার যে নিঃশব্দ কর্মকাণ্ড চলে, তার খবরাখবর। গর্ভে থাকাকালীন শিশুকে আমরা যে এক সুন্দর পরিবেশ দিতে পারি, সে ভাবনাকে আমরা কতটাই বা গুরুত্ব দিই।

এই মহান কাজটির দায়িত্ব আমাদের সকলের। একটি শিশু কিছু প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে আমরা আজও চরম নিয়তিবাদী হয়ে যাই। কপালের দোষ দিই। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ আমাদের সেই সুযোগ দিয়েছে, সচেতনতার সঙ্গে চললে আমরা এই পৃথিবীতে অসুস্থ শিশুর জন্মদান কমিয়ে দিতে পারি।

নবজাতক, জন্মসময়ে ওজন ও পরিপূর্ণতা

■ জন্মের সময় শিশুর ওজন

২৫০০ গ্রামের বেশি ওজন নিয়ে যে শিশু জন্মায় তার জীবন অনেক বেশি মসৃণ হয়। তাকে নিয়ে সমস্যা অনেক কম থাকে সাধারণত।

কিন্তু ২৪৯৯ গ্রাম বা তার কম ওজন নিয়ে যে শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হল তার সমস্যা অনেক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এদের বলা হয় কম ওজনের শিশু বা Low Birth Weight অর্থাৎ LBW Child।

শিশুর জন্মসময়ে ১৫০০ গ্রামের কম ওজন থাকলে বলা হয় Very Low Birth Weight (VLBW) Child এবং ১০০০ গ্রাম অর্থাৎ ১ কেজির কম ওজন থাকলে বলা হয় Extremely Low Birth Weight (ELBW) Child.

■ ওজন কম কেন ?

৩৭ সপ্তাহের আগে জন্মানো শিশুর শরীর গঠনে

গর্ভাবস্থায় শিশু : পরিণতির পথে

পিজি-তে অসুস্থ বা কম ওজনের শিশুর আধুনিকতম পরিচর্যা ব্যবস্থা

অপূর্ণতা থাকে। ওজন স্বাভাবিকভাবেই কম হয়। তাছাড়া, মায়ের অসুখ বা অপুষ্টির কারণে শিশুর বৃদ্ধি ঠিকমতো না হলে শিশুর ওজন কম হয়। এছাড়াও আরও নানা কারণ আছে।

■ **কম ওজনের শিশুর সমস্যা**

- জন্মের সময় অক্সিজেন লেভেল কম থাকে।
- শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে না।
- মায়ের দুধ ঠিক মতো টানতে পারে না, তাই ওজন বাড়ার সমস্যা হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ফুসফুসের গঠন অসম্পূর্ণ থাকায় শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। 'ইনফ্যান্ট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম' দেখা দেয়।

■ **পরিবেশগত প্রভাব**

কম ওজনের শিশু জন্মানোর জন্য পরিবেশের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তামাক জাতীয় পদার্থ সেবনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে গর্ভস্থ সন্তানের ওপর।

পরিবেশগত টক্সিন প্রসূতির শরীরের রক্তে blood lead level-টা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে গর্ভপাত হয়। শিশু আগে জন্মায়। শিশুর ওজন কম হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কম ওজনের শিশুর সংখ্যা বেশি হয়। তার একটি বড়ো কারণ হল, রান্নার কাজে জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে ঘরের ভেতরে ধোঁয়াজনিত দূষণ তৈরি হয় যা গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। দেখা যাচ্ছে, প্রায় ২০ শতাংশের ওপর কম ওজনের শিশুর জন্মানোর মূল কারণ এই দূষণ।

অতি ক্ষুদ্র পার্টিকলস, যা চোখে দেখা যায় না তাই দিয়ে পার্টিকুলেট ম্যাটার তৈরি হয়। এগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে যায়, যা গর্ভস্থ ভ্রূণের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত করে।

বায়ুদূষণের জন্যও গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হয়। এছাড়াও, আরও কয়েকটি বিষয়েও নজর দেওয়া দরকার। যেমন, গর্ভবতী যে খাদ্য গ্রহণ করবে সেই খাদ্য প্রস্তুতের পদ্ধতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসূতিদের সিগারেট খাওয়ার ফলেও শিশুর শরীরে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সুতরাং শিশুর জন্ম-সময়ের ওজন নির্ভরশীল প্রসূতির জীবন-যাপন, জীবন-অভ্যাস, জীবন-সংস্কৃতি ও পরিবেশ ইত্যাদির উপর। শিশুর জন্মসময়ের ওজনের ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মনে রাখা দরকার, এই ওজন গর্ভস্থ শিশুর সামগ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

কম ওজনের শিশু জন্মানোর সঙ্গে অধিক শিশু মৃত্যুহার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। কম ওজন নিয়ে শিশু জন্মালে তাকে বাঁচানো খুব কষ্টকর হয়। আবার বেঁচে গেলেও নানা সমস্যা দেখা যায়। এমনকি, এই সমস্যা শিশুর সারা জীবনব্যাপী চলে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে, এই ধরনের শিশুর জন্ম হার বেশি হওয়ার অর্থই হল নানা ধরনের জনস্বাস্থ্যের সমস্যা তৈরি হওয়া। এই সমস্যার প্রকোপ হ্রাসের জন্য যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলি হল— গর্ভবতীর অপুষ্টি ও খারাপ স্বাস্থ্য, কঠোর পরিশ্রম এবং প্রসবকালে দুর্বল স্বাস্থ্য।

উন্নয়নশীল দেশে, সদ্যোজাতের মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ৬০-৮০% শিশু মারা যাচ্ছে কম ওজন নিয়ে জন্মানোর কারণে। কম ওজন নিয়ে জন্মানো শিশুর মধ্যে ৬৭%-র ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ৪০ সপ্তাহের পরিবর্তে ৩৭ সপ্তাহের আগে জন্মগ্রহণ করছে। ১৫০০ গ্রামের কম ওজনের শিশুদের ঝুঁকি বেশি থাকছে। অনেক ক্ষেত্রে, এদের মস্তিষ্কের আয়তন কম হয়।

দেখা গেছে, এই রকম শিশুরা বড়ো হওয়ার পর অনেকেই নানা রকম ক্রনিক অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে। এদের মধ্যে 'মেটাবলিক সিনড্রোম' দেখা যায় অর্থাৎ হাই প্রেসার, ডায়াবেটিস্ ও হার্টের রোগ ইত্যাদি হয়।

পূর্ণসময়ে জন্মালেও অনেক শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের ওজন কম। কোনও কারণে তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় ওজন কম হয়। এইজন্য, গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ওজন নেওয়া দরকার। বর্তমানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখা হয় গর্ভস্থ শিশু কতটা বাড়ল। প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর ডায়েট। প্রসূতির কোনও রকম নেশার দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

জন্মের আগে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হলে ইনসুলিন সেনসেটিভ অঙ্গগুলি যেমন লিভার, প্যাংক্রিয়াস এবং হাড়ের সমস্যা দেখা দেয় যা সারা জীবন ধরে চলে।

১ কেজি বা ১.৫ কেজির শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশই সময়ের আগে জন্মেছে। তারা দৈহিকভাবে ছোটো এবং শরীরতত্ত্বভাবে অপরিণত। এই ধরনের শিশুর ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যা দেখা দেয়। ওদের শরীরে বাদামি ফ্যাটের সঞ্চয় এবং গ্লাইকোজেন কমে যায়। তাই ওরা শরীরে তাপ তৈরি করতে পারে না, ধরে রাখতে পারে না। এছাড়া, আরও কতগুলি জটিল সমস্যা দেখা যায়। এইগুলি যথাযথভাবে প্রতিরোধ করতে পারলে শিশুমৃত্যু কমানো সম্ভব।

এই তাপ হারানোর ব্যাপারটি প্রতিরোধ করতে শিশুকে জন্মের সময় শুকনো রাখতে হবে যাতে শিশুর শরীর থেকে বাষ্পায়ন না হয়। বাষ্পায়ন হলে তাপ কমে যাবে। গরম চাদর, কাপড়, কম্বলে মুড়িয়ে রাখতে হবে।

বর্তমানে এই নবজাতকদের জন্য অত্যাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে এইধরনের শিশুদের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়। প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে প্লাস্টিক মুড়িয়েও শিশুকে রাখা হয়।

৩২ থেকে ৩৪ সপ্তাহের মধ্যে যে শিশু জন্মায় সে মায়ের স্তন্য পান করতে পারে না। এর ফলে পুষ্টির অভাব হয়। নানা ধরনের সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা দেখা যায়। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির সমস্যা থাকে। বহুমুখী সমস্যায় আক্রান্ত হয় এই কম ওজনের বা আগে জন্মানো শিশুরা। এদের জন্য বাড়িতে বিশেষ চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না।

শিশুর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ঠিকভাবে পরিণত না হওয়ায় হৃদস্পন্দনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজগুলি ব্যাহত হতে পারে যেকোনও সময়। তাই প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে তার প্রাণস্পন্দনকে টিকিয়ে রাখা হয়। নানা কার্ডিওভাসকুলারের সমস্যার সমাধানেও বিভিন্ন থেরাপি এখন প্রয়োগ করা হচ্ছে।

নবজাতক ও ডিইআইসি (DEIC-District Early Invervention Centre)

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (RBSK)-এর অধীন এই কর্মসূচির সূচনা হয় ২০১৩-র ফেব্রুয়ারিতে। জন্ম থেকে ১৮ বছর বয়স—মানুষের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে জন্ম-সংক্রান্ত কোনও ত্রুটি, কোনও রোগ, কোনও ধরনের কমতি এবং প্রতিবন্ধকতা-সহ বয়স-অনুযায়ী কোনও উন্নতির বিলম্ব হলে সেগুলির সঠিক নির্ণয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সেই কাজটিই করা হয়। যত দ্রুত এগুলি নির্ণয় বা চিহ্নিত করা যায় তত দ্রুত নিরাময়ের সম্ভাবনা থাকে। এই ৪টি 'D'—অর্থাৎ Defects at birth, Deficiencies, Diseases, Development delays including disability—এগুলির সঠিক সমাধান আমাদের সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের পক্ষে ততটাই ফলদায়ক হবে, যতটা হবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। সামগ্রিক উন্নয়ন-ভাবনায় স্বাস্থ্য-ভাবনার এই গুরুত্ব ক্রম-বর্ধমান। তাই শিশুর জন্মের প্রক্রিয়া যখন থেকে শুরু হচ্ছে মাতৃগর্ভে, তখন থেকেই আমাদের অতিমাত্রায় সচেতন হতে হবে।

২০১৩ সালের আগে এই রাজ্যে সামগ্রিকভাবে এই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কোনও কর্মসূচি তৈরি হয়নি। বর্তমানে রাজ্যের ১২টি জেলাতে ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টার (DEIC) তৈরির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

শুধুমাত্র এসএসকেএম হাসপাতালেই এই কেন্দ্র কাজ শুরু করেছে। বাকি ৫টি জেলায়—পুরুলিয়া জেলা হাসপাতাল, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ, বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল এবং কলকাতার বিসি রায় শিশু হাসপাতালে এই কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। Early intervention-এ ব্রেন ডেভেলপমেন্ট-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গর্ভস্থ অবস্থায় ৫ মাসে অর্থাৎ ২০ সপ্তাহেই মস্তিষ্কের কোষ তৈরি হয়। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কোষ তৈরি হলে তবেই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শরীর তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে, এই কাজ ঠিক মতো না হলে গর্ভস্থ অবস্থায় শরীর গঠনে সমস্যা তৈরি হয়। এই পিজি হাসপাতালে যাঁরা গর্ভসঞ্চারের আগে বা পর থেকে দেখান, তাঁদের নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানানো হয় গর্ভস্থ সন্তান সঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে কিনা। সমস্যা থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অনেক সময়, অসুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়ার থেকে বিরতও হন বাবা-মায়েরা। কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাঁদের, যদিও পরবর্তী সময়ে কঠিনতম সমস্যা মোকাবিলার থেকে রেহাই পান।

অনেক ক্ষেত্রেই আবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ারও সুযোগ থাকে না। গর্ভস্থ সন্তানের বয়স বেশি হলে মানবিক সমস্যা দেখা দেয়। দেখা দেয় আইনি জটিলতাও।

এছাড়াও, ধরা না-পড়া সমস্যা নিয়েও কত শিশু জন্মায়।

জন্মের পর শিশু কাঁদল না। দেখা দেয় সমস্যা। মস্তিষ্কের গঠন বা উন্নতি ঠিকমতো না হলে নানা সমস্যা তৈরি হয়। কোষের সঙ্গে কোষের যোগ গর্ভস্থ অবস্থায় তৈরি হয়। ২ বছর বয়স পর্যন্ত চলে। এই যোগ বাড়ানো যায় বিশেষ চিকিৎসার মাধ্যমে।

আর্লি ইন্টারভেনশন ক্লিনিকে সমস্যা নিয়ে শিশু যত তাড়াতাড়ি আসে ততই সেরে ওঠার সুযোগ থাকে। বাচ্চাদের অনেক সময় গ্লুকোজ কমে যাওয়ায় কোষ মরে যায়। সঠিক চিকিৎসা সময়ে শুরু হলে কোষ আবার অন্য কোষ টেনে নেয়। অনেক সময় মস্তিষ্কের গঠনগত ত্রুটির জন্য শিশু চোখে দেখে না। চোখের নানা সমস্যা দেখা দেয়। শুধু চোখ নয়, কান বা হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গের সমস্যার সঙ্গে বিহেভিয়ারের সমস্যা তৈরি হয়। শিশু খুব অস্থির হয়ে ওঠে। কোনও বিষয়ে মনোযোগ থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পরিবারের লোকজন এই সমস্যাকে বুঝতে পারে না। বোঝেন না যে এর চিকিৎসা দরকার।

স্কুলে গেলে বাড়িতে নানা অভিযোগ আসে। পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ে ক্রমশ। তখন কেউ কেউ সমস্যা বুঝতে পেরে শিশুকে নিয়ে আসেন চিকিৎসকের কাছে। কিন্তু দেখা যায় দেরি হয়ে গিয়েছে।

অনেক সময়, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পায়। কখনও বা হাঁটা চলায় সমস্যা দেখা দেয়, বুঝতে দেরি হয়। কখনও প্রয়োজন পড়ে ফিজিওথেরাপির। আবার কখনও বা প্লে-থেরাপির।

আজকাল একক-পরিবারের শিশুর অনেকের সঙ্গে, অনেকের থেকে শেখার সুযোগ থাকে না। মা অথবা আয়ার কাছে বড়ো হয়। এর ফলে, অনেক সময় অনভিজ্ঞ চোখে অনেক সমস্যা ধরা পড়ে না, সমাধানও হয় না দ্রুত।

তাই এই ধরনের ক্লিনিকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

একমাত্র পিজি-তে একটি ক্লিনিক গড়ে উঠেছে। শিশু বিভাগ থেকে ২০০৩-এ আলাদা হয়ে নবজাতকদের জন্য আলাদা বিভাগ হয়। এই নিও ন্যাটাল বা নবজাতকদের জন্য নানা ইউনিট তৈরি হয়।

২০১২-তে নতুন ভবন তৈরি হয়। তার আগে প্রসূতিবিভাগে ইউনিটটা ছিল। কম ওজনের বা আগে জন্মানো শিশুদের বিশেষ চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ইউনিট চলে।

শিশু-মৃত্যুর হার কমানোই একমাত্র লক্ষ্য নয়। নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মানো বা কম ওজন নিয়ে জন্মানো শিশুদের জন্ম-পরবর্তী সমস্যাগুলির সঠিক নির্ণয় ও নিরাময় বা চিকিৎসাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এই হাসপাতালে জন্মানো শিশুরা তো আছেই, সারা রাজ্য থেকে এই সমস্যা আক্রান্ত শিশুরা রেফারড্ হয়ে এখানে আসছে। তাই এই বিভাগের প্রতিটি ইউনিটেই অত্যন্ত চাপ।

এক মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের অপারেশন হয় নিজস্ব ইউনিটে। এই নিও-ন্যাটাল সার্জারির জন্য সেজে উঠেছে পিজির এই ইউনিটগুলি। অত্যন্ত উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি, চিকিৎসক, প্রশিক্ষিত নার্স ও নানা ধরনের বিশেষজ্ঞ কর্মীদের নিয়ে। গড়ে উঠেছে বিশাল ভবন।

নিউরো-ডেভেলপমেন্ট-এর ইউনিটে ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন, সাইকোলজিস্ট আছেন। মস্তিস্ক নিয়ে এখানে কাজ হয়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন।

৪০ সপ্তাহের আগে যে শিশুরা জন্মায় তাদের Pre-matured শিশু বলে। এদের প্রথম ফলো-আপ হয় ৪০ সপ্তাহে। চলে ৬ বছর পর্যন্ত। মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিশেষ ক্লিনিক চলে এখানে। নিও-ন্যাটোলজির ওপিডি-তে সোম থেকে শনি, সপ্তাহে ছ'দিন সদ্যোজাতদের ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত দেখা হয়।

- KMC বা ক্যাঙারু মাদার কেয়ার—

NICU-তে স্কিন-টু-স্কিন কেয়ার-এর মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে শিশুকে মায়ের বুক-সংলগ্ন করে রাখা হয়। শিশু কৃত্রিম ওয়ার্মার-এর বদলে মায়ের শরীর থেকে উত্তাপ নিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক উষ্ণতায় অভ্যস্ত হয়। ক্যাঙারুর বাচ্চারা যেভাবে মায়ের বুকে থাকে সেই প্রকৃতিগত পদ্ধতিতে এই থেরাপি চলে। এর ফলে শিশুর শরীরে নানা প্রয়োজনীয় হরমোন তৈরি হয়। শিশুর সঙ্গে মায়ের এই সংযোগ শিশুর মস্তিষ্ক এবং বিহেভিয়ারের পক্ষে সুফলদায়ী হয়।

- ফলো-আপ-ক্লিনিক—

মস্তিষ্ক সংক্রান্ত নানা সমস্যা থেকে দেখা দেয় ফুসফুস বা অন্যান্য অঙ্গের সমস্যা। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। ৬ বছর বয়স পর্যন্ত এই ক্লিনিকে চিকিৎসা হয়। পরে অন্য বিভাগে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

অর্থাৎ জন্মের পর শিশুর বেঁচে যাওয়াটাই বড়ো ঘটনা নয়। সবদিক থেকে সুস্থভাবে বাঁচা ও বিকশিত হওয়াটাকেই সুনিশ্চিত করতে হবে। এখানেই আসছে সেই জরুরি প্রশ্ন—কোয়ালিটি অব লাইফ। জীবনের গুণগত মান-উন্নয়ন আজ সব থেকে প্রাধান্য পাচ্ছে।

বেঁচে যাওয়া শিশু অনেক সময়ই কম বুদ্ধি নিয়ে বা চোখে অনেক পাওয়ার নিয়ে জন্মাচ্ছে। দ্রুত চিকিৎসার মধ্যে তাকে আনতে হবে। দিতে হবে সঠিক চিকিৎসা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তার পরিবার। এই পরিবারের সদস্যদের শিশুর অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করা সবচেয়ে আগে দরকার। তাদের মন ও মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এমনভাবে যাতে সমস্যা-আক্রান্ত শিশুটির জন্য যথাযথ পরিবেশ গড়ে ওঠে ওর পরিবারে। এর জন্য কাউন্সেলররা আছেন। পরিবারের সহায়তা না পেলে শিশুটির সমস্যা সমাধানের পথ থাকবে না।

দৃষ্টি—

৩৫ সপ্তাহের আগে বা ২ কেজির কম ওজন হলে শিশুর রেটিনায় নানা সমস্যা হয়। একে ROP বলে। ১২০টি শিশুর মধ্যে ১০টি ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা যায়। প্রথমেই ধরা পড়লে অর্থাৎ ২১ দিনের মধ্যে এলে অন্ধত্ব আটকানো যায়। হয়তো সে কম দেখবে। কিন্তু দেখবে তো। কিন্তু দেরি করলে অন্ধত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। দৃষ্টিশক্তি ফেরানো যায় না।

৪০ সপ্তাহ, ৩ মাস, ৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত চিকিৎসা ও ফলো-আপ চলে।

রাজ্যের নানা জেলা থেকে এখানে শিশুদের পাঠানো হয়। সম্প্রতি, রামপুরহাট থেকে দুটি যমজ শিশু আসে। ২৭-এ জুন জন্ম। আসে ১লা সেপ্টেম্বর। এর মধ্যেই একটি শিশু চিরকালের জন্য অন্ধত্বের শিকার হল। কিছু করার থাকল না। আফশোস ঝড়ে পড়ছিল অপথালমোলজিস্ট আইভি ঘোষ ও স্বাগতা মল্লিক-এর কণ্ঠে।

মস্তিষ্কের উন্নতি না হওয়ায় 'দেখা-শেখা'-র সমস্যা হয়। এর জন্য সঠিক চিকিৎসা দরকার। কম দৃষ্টি, অলস চক্ষু—এর জন্য নানা থেরাপি আছে। চিকিৎসার সময়টা পেরিয়ে গেলে কিছু করার থাকে না। অনেক সময় চোখ ট্যারা হয়। ডবল ভিশন আসে। আমরা বলি লক্ষ্মী ট্যারা। আসলে চোখের সমস্যা। তাই শিশুর জন্মের পর পরীক্ষা করা দরকার।

শিশুর দাঁতের নানা সমস্যা হয়। ছোটো থেকে এ ব্যাপারে যত্ন নিতে হয়। শিশুর দাঁতের সমস্যা নিয়ে এখানে আসেন বাবা-মায়েরা। ফলো-আপ-ক্লিনিকে এসবের চিকিৎসা চলে। মূল কথা, শিশুর যে কোনও সমস্যার জন্যই পিজি অর্থাৎ এসএসকেএম-এর এই বিভাগ কাজ করছে। রাজ্যের ১২টি জেলায় এই কাজ যত দ্রুত শুরু হবে, রাজ্যের পক্ষে সেটা তত মঙ্গল। ধীরে ধীরে সর্বত্র, এই কাজ গতি পাবে এই আশা নিয়েই আমরা থাকলাম।

সূত্র : প্রতিবেদনের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ও অন্যান্য চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের পিজির এই বিভাগের প্রধান সুচন্দ্রা মুখার্জীর সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে লেখা সুপ্রিয়া রায় ছবিটি তুলেছেন সৌরভ দত্ত।

জন্মের পরেই নজর দিতে হবে শিশুর শ্রবণ সমস্যায়

শাহীদুল আরেফিন

সকালে হাসপাতালের বহির্বিভাগ তখন সবে শুরু হয়েছে। বাবা-মা তাঁদের তিনবছরের বাচ্চা নীলিমাকে কোলে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। বাচ্চার কী সমস্যা সেটা জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর এল বাচ্চা কানে শোনে না, আর তার জন্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাচ্চা কথা বলতেও শেখেনি। তারপরে কথায় কথায় জানা গেল যে বাচ্চার জন্মের পরেই জন্ডিস ধরা পড়েছিল। ছুটির কাগজ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে জন্ডিসের মাত্রা বেশ বেশি রকমেরই ছিল। তারপরেই জিজ্ঞাসা করা হল যে আপনি এতদিন কোথাও বাচ্চাকে দেখিয়েছেন কিনা? উত্তরে বললেন যে হ্যাঁ আমরা জ্বর-সর্দি-কাশি হলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখাই। জিজ্ঞাসা করা হলো যে কানে শোনার সমস্যার জন্য কি আগে কখনও ডাক্তার দেখিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে যেটা জানা গেলো সেটা হল বাচ্চা যে কানে শুনতে পায় না সেটা কোনওভাবে তাঁরা আগে থেকে বুঝতেই পারেননি, কারণ বাচ্চার বাকি সব বিকাশ যেমন ঘাড় শক্ত হওয়া, বসতে শেখা, হামাগুড়ি দেওয়া, দাঁড়াতে শেখা, হাঁটতে শেখা, খেলাধুলো করা, সবগুলিই ঠিক ঠিক সময়ে হয়েছিল। এরপরে যখন বলা হলো তিন বছর ধরে বাচ্চা যে কানে শুনতে পাচ্ছে না সেটা তো ওর জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে, আপনাদের তো অনেক আগেই আসা উচিত ছিল, তাহলে বাচ্চা হয়তো এতদিনে কথা বলতে শিখে যেত। এর উত্তরে তাঁরা বললেন, ডাক্তারবাবু এটা আমাদের কপালের দোষ। এরপর আমি আর কিছু বলার সাহস পাইনি। পরে বাচ্চাটি মূল্যায়ণ করে দেখা গিয়েছিল যে বাচ্চাটির ৯০ শতাংশের বেশি শ্রবণ অক্ষমতা ছিল।

নয়ন। ওর বাবা মায়ের সঙ্গে এল। সাত বছরের ফুটফুটে বাচ্চা। সব কিছু শুনতে পায়, খুব চঞ্চল নয়, বাবা মায়ের কথাও শোনে কিন্তু শুনে কাজ করতে গিয়ে কেমন যেন ও গুলিয়ে ফেলে। আর তার জন্য ও বাড়িতে, বাইরে স্কুলে সব জায়গায় খুব বকাবকিও খায়। আর এই বকাবকি খেতে খেতে ওর মুখমণ্ডলেও কেমন যেন একটা আতঙ্কের ছাপ। বাচ্চাটি যে কারণে এসেছিল সেটা হচ্ছে বাচ্চাটি ঠিক করে কথা বলতে পারছে না। অনেক রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু কিছুই

পাওয়া যায়নি। বাড়িতে ও স্কুলে বাচ্চাটির কিছু সমস্যা হত। যেমন, ও একটু শব্দযুক্ত জায়গায় কোনো নির্দেশই পালন করতে পারতো না বা থাকতে পছন্দ করতো না, জোরে বই পড়াতে উৎসাহী ছিল না, আর সব জিনিস খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেত। পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল বাচ্চাটি সেন্ট্রাল অডিটরি প্রসেসিং ডিসঅর্ডার-এ আক্রান্ত।

চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে তিন বছরের ছোট্ট দীপকে তার বাবা মা পাড়ার Play School-এ খেলার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হয়েছিল স্কুল থেকে প্রতিদিন অভিযোগ আসা। অথচ তিন বছর আগে যখন অনেক সমস্যার সমাধান ও অনেক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে বাবা মায়ের কোল আলো করে এই দীপের জন্ম হয়েছিল, আর জন্মের পর পরই যখন সে কেঁদে উঠেছিল এক বুক শ্বাস নিয়ে, চোখ মেলেছিল পৃথিবীর আলো দেখতে, তখনই পরিবারের লোকেরা ভাবতে শুরু করেছিল দীপ একজন বড় কিছু হবে, খুশিতে ভরে গিয়েছিল দীপের পুরো পরিবার। আর আজ সেই দীপের জন্যই কিনা স্কুল থেকে প্রতিদিন অভিযোগ, সে এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে না, অন্য কোনও বাচ্চার সঙ্গে খেলে না, চোখে চোখ রেখে সে কথা শোনে না বা বলে না, ওর নাম ধরে ডাকলে সব সময় সাড়া পর্যন্ত দেয় না। কিন্তু সে নিজের

মনে খেলতে ভালবাসে, নিজের মধ্যে প্রায়শই লাফাতে পছন্দ করে, মাঝে মাঝেই আরচোখে অন্যদিকে তাকাতে ভালোবাসে। এরকমটা তো সে বাড়িতেও করত আর সকলেই বলত যে ও একটু চঞ্চল অন্য বাচ্চার থেকে, আর ওতো কি সুন্দর গান শোনে মন দিয়ে, তাই কারও মনেই হয়নি যে দীপের কোনও সমস্যা থাকতে পারে। আজ দীপকে নিয়ে বাবা-মা বহির্বিভাগে এসেছে কারণ তিন বছর হয়ে গেলেও দীপ কথা বলতে শেখেনি।

এই নীলিমা, নয়ন আর দীপের মতো অনেক বাচ্চা আমাদের চারপাশে দেখা যায়, শুধু এই তিন রকমের সমস্যা নয়, আরও বিভিন্ন রকমের কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার নিয়ে যারা বিরাজমান। আর হয়ত অনেক সময় আমরা সাধারণ মানুষ এই সমস্যাগুলোকে বুঝতেও পারি না বা বুঝতে পারলেও গুরুত্ব দিই না। কারণ এগুলো মানুষের জীবন-মরণের প্রসঙ্গ নয়। কিন্তু প্রতিটি বাচ্চাকে বা প্রতিটি মানুষকে আমরা ভালোভাবে বেঁচে থাকার অর্থাৎ উচ্চ জীবন মান নিয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতেই পারি যারা বিভিন্ন রকম কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের কথা বলার ও শোনার সমস্যাযুক্ত।

এবার আসি কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার ও কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার বিভাগ প্রসঙ্গে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিভাগ হল এই কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার বিভাগ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিভাগটি পৃথিবীতে প্রথম আলাদাভাবে আত্মপ্রকাশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আর আমাদের দেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৬ সালে। কিন্তু যতদিন যাবে তত এর গুরুত্ব মানুষের কাছে প্রকাশ পাবে কারণ আজকের দিনে পৃথিবীতে প্রতি ছয় জন মানুষের মধ্যে একজন এই কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত। আর এই কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা হলেন বাক্ ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ অডিওলজিস্ট অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট। ২০১৫ সালের careercast (USA) এর হিসাবে শ্রেষ্ঠ পেশা হিসাবে শ্রবণ বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় স্থানে ছিল।

এবার আসা যাক কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার এর মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো আসে—

(১) শ্রবণ জনিত যে কোনও রকমের সমস্যা

(২) ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষাজনিত যে কোনও রকমের সমস্যা

(৩) স্পিচজনিত সমস্যা

(৪) ভারসাম্য (Balance) জনিত সমস্যা

(৫) সোয়ালোয়িং (Swallowing) অর্থাৎ খাবার গিলতে পারার সমস্যা।

(৬) বিকল্প কমিউনিকেশন (Alternative augmentative communication)

প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ, পরীক্ষানিরীক্ষা মূল্যায়ন, চিকিৎসা ও সার্টিফিকেট বাক্ ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞদের কাজের অঙ্গ।

এরপরেই আসি শ্রবণজনিত সমস্যা নিয়ে। শ্রবণ অক্ষমতা হল একটি গোপন অক্ষমতা (Hidden disability), তাই বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না যে বাচ্চার কানে শোনার সমস্যা আছে কি নেই। যেটা হয়েছিল নীলিমার ক্ষেত্রে। আর তাই বাড়ির লোক তিনবছর পর্যন্ত বুঝতেই পারেনি যে তার শোনার সমস্যা আছে। আর জীবনের এই প্রথম তিন বছরই হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ও কথা শেখার জন্য, যেটার উপর নির্ভর করে জীবনের স্কুল শিক্ষা ও কর্মজীবন।

এর জন্য সর্বজনীন নবজাতক শ্রবণ স্ক্রিনিং (Universal Newborn hearing screening) সমগ্র বিশ্বজুড়ে করার চেষ্টা করা হয়। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী বাচ্চার জন্মের পরে প্রথম এক মাসের মধ্যে শ্রবণ স্ক্রিনিং, প্রথম তিনমাসের মধ্যে শ্রবণ মূল্যায়ন ও প্রথম ছয় মাসের মধ্যে চিকিৎসা চালু হয়ে যাওয়া উচিৎ। আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান এতটাই উন্নত যে কোনও বাচ্চাই বোবা হতে পারে না যদি সে জন্মগত বধিরও হয় তাও। সঠিক মূল্যায়ণ ও সঠিক শ্রবণ যন্ত্র অথবা ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে ও সঠিক স্পিচ থেরাপির দ্বারা একজন সাধারণ বাচ্চার মতোই সে কথা বলতে শেখে। আবার উল্টোদিকে শ্রবণজনিত সমস্যার শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা যত দেরি হবে তত ফলাফল খারাপ হবে অর্থাৎ ভাষা ও কথা শিখতে অসুবিধা হবে।

আবার সব সময় কানে শুনতে পেলেই যে বাচ্চার ভাষা শিখতে বা বুঝতে অসুবিধা হবে না সেটাও কিন্তু নয়। যেমন নয়নের ক্ষেত্রে হয়েছে। অনেকসময় বাচ্চা শব্দ শুনতে পায় কিন্তু শব্দগুলোকে আলাদা করে বুঝতে পারে না তাই কথা শিখতে অসুবিধা হয়। প্রতিটা সমস্যাই আলাদা আর প্রতিটা সমস্যা বুঝতে দরকার সঠিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন। একজন বাক্ ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞই এইক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারেন।

এছাড়াও আছে কথা বলার, আরও অনেক রকম সমস্যা যেমন তোতলামি, উচ্চারণের সমস্যা, বাকপটুতাজনিত (Fluency related) সমস্যা, গলার স্বর জনিত সমস্যা, খাবার গিলতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যা, আর এগুলোর সবগুলোরই দরকার সঠিক মূল্যায়ণ ও সঠিক চিকিৎসা।

মনীষীরা বলেন, সুন্দর করে কথা বলা নাকি একটি শিল্প। আর এ শিল্প আয়ত্তে থাকলে সহজেই মানুষকে আপন করা যায়। মোবাইল কোম্পানিগুলো নিত্যনতুন অফার নিয়ে ক্রেতার সামনে হাজির হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই—স্বল্পমূল্যে বেশি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু যে জন্মগতভাবে বাকপ্রতিবন্ধী বা বিভিন্ন রোগের কারণে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না, বেশি কথা বলার যুগে তার অবস্থাটা কী আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? তোতলানো, অস্পষ্ট উচ্চারণ, ঠোঁটকাটা আ তালুকাটা, টাং টাই বা আটকানো জিহ্বা, প্যারালাইসিসজনিত কারণে কথা বলতে সমস্যা ইত্যাদি আরও নানা কারণে অনেকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারেন না। আমাদের পরিবারের কোনও সদস্য কিংবা প্রতিবেশী কেউ না কেউ এমন সমস্যায় ভুগছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে এই কথাবলাজনিত সমস্যা আছে এইরকম বাচ্চার সংখ্যা শতকরা ১২.৮৪ থেকে ১৫.০৪-র মধ্যে। আর আশার কথা হচ্ছে, এসব রোগীকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলার সুযোগ এনে দিয়েছে স্পিচ থেরাপি। স্পিচ থেরাপি হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা। যার সাহায্যে কথা বলতে অক্ষম অথবা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না এমন রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। স্পিচের বা কথা বলার সমস্যাকে সাধারণভাবে তিনভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হল, বাক্‌পটুতা (Fluency disorder) জনিত সমস্যা, উচ্চারণগত সমস্যা (Articulation disorder) এবং স্বরযন্ত্রজনিত সমস্যা (Voice disorder)। তোতলামি, শিশুদের দেরিতে কথা বলা, কানে কম শোনাজনিত কথা বলার সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণে যারা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না, তাদের প্রাণখুলে কথা বলার

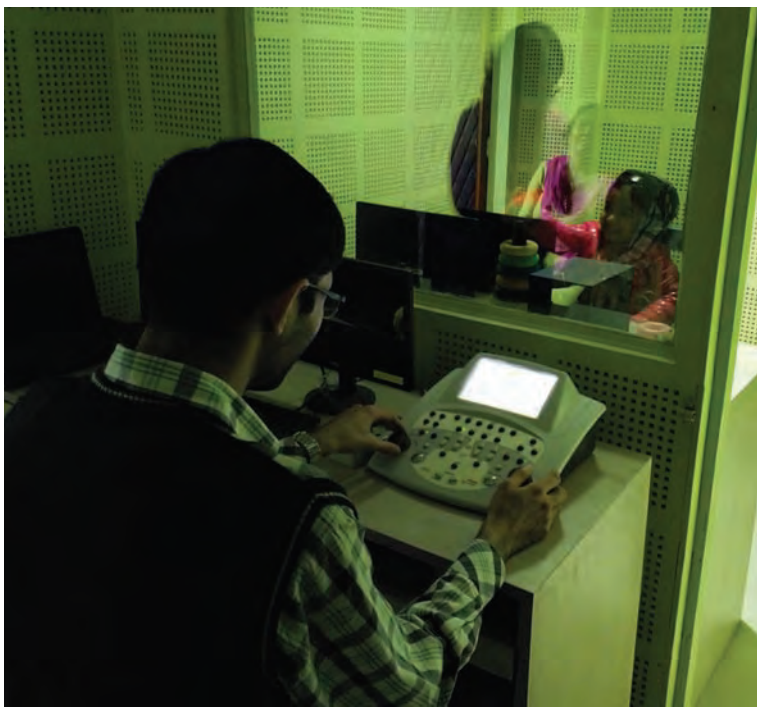

সুযোগ এনে দিয়েছে এই বাক্ চিকিৎসা। যাদের কথা বলার সমস্যা আছে একমাত্র তারাই বোঝেন ঠিক করে কথা বলতে না পারার যন্ত্রণা আর এই যন্ত্রণা লাঘব করার কাজটাই করছেন বাক্ চিকিৎসকরা।

বাক্ চিকিৎসক অর্থাৎ স্পিচ প্যাথোলজিস্টদের মতে শিশু প্রথম বছর একটি শব্দ, দ্বিতীয় বছর দুটি করে শব্দ একসঙ্গে এবং তৃতীয় বছরে পুরো বাক্য বলতে শিখে নেয়। এর ব্যতিক্রম হওয়া মানেই শিশু কোনও না কোনও সমস্যায় ভুগছে। এক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। শিশু বড়ো হলে সমস্যাটি ঠিক হয়ে যাবে এমন ভাবনা ঠিক নয়।

তোতলামির সমস্যা সব দেশেই আছে। তোতলামির সঠিক কারণ না থাকলেও প্রায়ই দেখা যায় অতিরিক্ত টেনশন, কথা বলতে গিয়ে নার্ভাস হওয়া, দ্রুত কথা বলার চেষ্টা করা, আত্মবিশ্বাসের অভাব ইত্যাদি কারণে অনেকে তোতলায়। বাক্ চিকিৎসকের সঠিক মূল্যায়ন ও চিকিৎসায় মোটামুটি ৫-৬ মাসে এধরনের রোগীরা সুস্থ হয়ে ওঠে।

অনেক শিশু আছে যারা বাংলা বর্ণমালাগুলো শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন 'ত' কে সর্বদা 'প' উচ্চারণ করা, 'ল' কে 'ড' উচ্চারণ করা ইত্যাদি। এসব শিশু স্পিচ থেরাপির দ্বারা খুব দ্রুত স্বাভাবিক কথা বলতে পারে।

আজকাল প্লাস্টিক সার্জারির কল্যাণে ঠোঁট কাটা বা তালু কাটা রোগীরা স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা দেখা যায় অস্ত্রোপচার পরবর্তী সময়ে কথা বলতে গেলে, কেন না ঠোঁট বা তালু কাটা থাকার কারণে তারা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত থাকে না। তাই অস্ত্রোপচার পরবর্তী সময়ে স্পীচ থেরাপির সহায়তা নিলে এধরনের সমস্যা দ্রুত কাটিয়ে ওঠা যায়।

স্ট্রোকের কারণে দেহের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে কথা বলার সমস্যাও প্রায়শই দেখা যায়। অনেক সময়ই দেখা যায় যে এই সমস্ত রোগীরা ভাষা ও কথা বুঝতে ও বলতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে বাক্ চিকিৎসকদের সাহায্য দরকার।

যে সব বাচ্চার শ্রবণ সমস্যা আছে, সে সব বাচ্চাও ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। শ্রবণ যন্ত্র (Hearing aid) অথবা কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে এইসব বাচ্চার শোনার ব্যবস্থা করা গেলেও বিড়ম্বনা দেখা দেয় কথা বলার ক্ষেত্রে। বাক্ চিকিৎসকরা সহজেই এই ধরনের সমস্যা দূর করতে পারেন। এছাড়াও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন, ফ্যাসফ্যাসে কথা বলা, নাকি সুরে কথা বলা ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণে স্পিচ থেরাপি ও ভয়েস থেরাপির জুরি নেই।

এছাড়াও খুব বড়ো একটা সমস্যা আছে সেটা হল খাবার গিলতে গিয়ে সমস্যা (swallowing disorder)। সাধারণত বিভিন্ন নিউরোলজিক্যাল সমস্যাযুক্ত রোগীদের মধ্যে এটা দেখা যায়। অনেক সময় রোগী হয়তো মুখ দিয়ে খাচ্ছে কিন্তু কিছু খাবার অথবা জল হয়তো শ্বাসনালীতে চলে যাচ্ছে, যেটা পরবর্তীকালে অনেক বড় সমস্যা নিয়ে আসে। মুখ অথবা গলার ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রেও খাওয়ার সমস্যা দেখা যায়। এইরকম খেতে বা গিলতে গিয়ে সমস্যার পুরো প্রক্রিয়াটার সঠিক

মূল্যায়ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাক্ ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা অপরিসীম।

এবার আসি বিকল্প কমিউনিকেশন ব্যবস্থার প্রসঙ্গে। অনেক সময় দেখা যায় যে রোগীর কথা বলার সম্ভবনা হয়তো আর নেই, তখনই ভাবা হয় বিকল্প পদ্ধতির কথা। বিজ্ঞানী স্টিফেন্স হকিংস এর কথা মনে করলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই বিকল্প কমিউনিকেশন ব্যবস্থার কথা। কিন্তু সবার জন্য তো আর একইরকম ব্যবস্থা হতে পারে না। সাধারণ থেকে উন্নত প্রযুক্তিযুক্ত বিভিন্ন বিকল্প কমিউনিকেশন ব্যবস্থা আছে। কোন রোগীর জন্য কোনটা দরকার তার সঠিক মূল্যায়ন ও সঠিক পরিচালনা শেখানোটাও একজন বাক্ ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞর কাজ।

সূর্য ওঠে সূর্য অস্ত যায়, আকাশে মেঘ উড়ে যায়। দিন বদলায়। যান্ত্রিক জীবনে আমরা ডুবে থাকি। এর মাঝেই কিছু মানুষ বেঁচে থাকে মনে গভীর যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে। লুকিয়ে থাকা অনুভূতি বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরে বেড়ায় এক এক জনের ভিতর বিভিন্ন রূপ ধরে, কিন্তু ভাষায় ও কথায় প্রকাশ করতে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিভাগটি সেই সব প্রকাশ করতে না পারা মানুষের সেবায় ব্রতী থেকে মূল্যহীন জীবনকে আবার মূল্যবান করে তুলতে সাহায্য করে। যত প্রযুক্তি উন্নত হবে, ততই শিশু মৃত্যুর হার কমবে ও মানুষের গড় আয়ু বাড়বে এবং সেইসঙ্গে বাড়বে কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডারে আক্রান্তের সংখ্যা। আর তাদের পাশেই থাকবে বাক্ ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞরা।

লেখক পরিচিতি: এসএসকেএম হাসপাতালের অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্রের অডিওলজিস্ট
ছবি: সৌরভ দত্ত

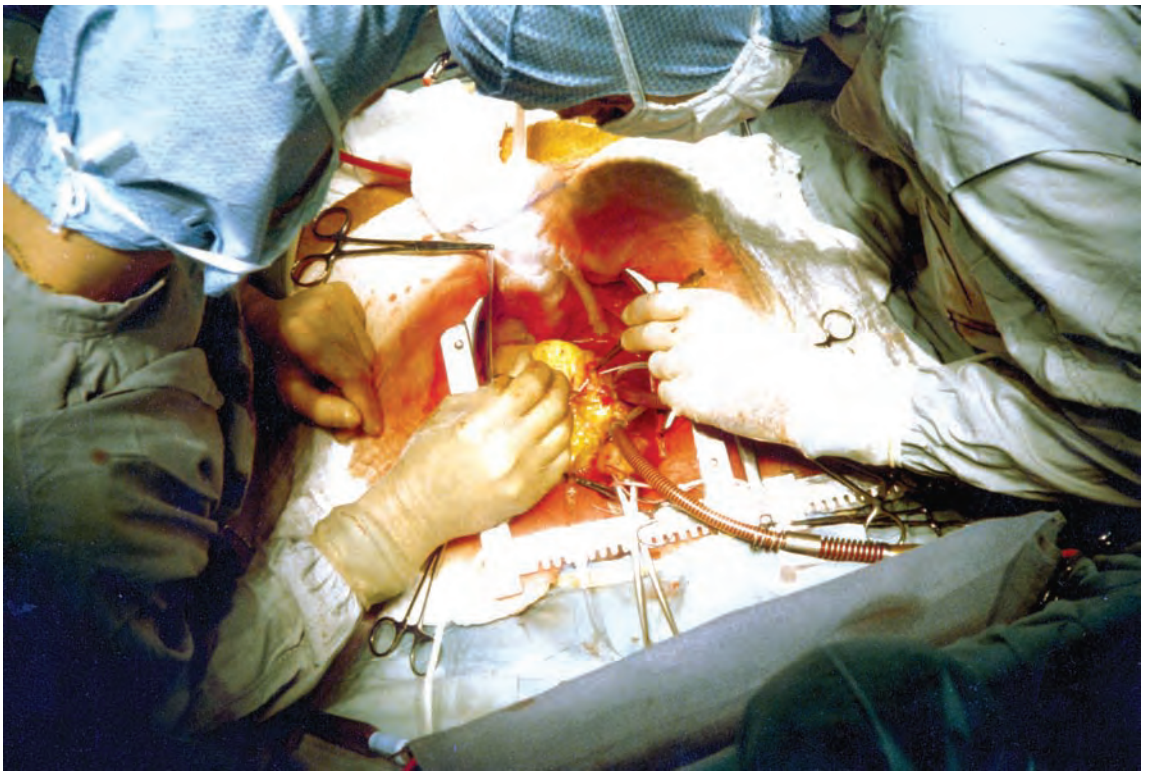

কার্ডিও থোরাসিক সার্জারি

নতুন দিশা দেখাল পিজি হাসপাতাল

রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন সকলেই। আমরাও সুচিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছি। আমরাও খুব খুশি।

মুখে ঝলমলে আলো ছড়িয়ে পড়ল। পিজি হাসপাতালে নিজের ঘরে বসে কথাগুলো বলছিলেন ডা: শুভঙ্কর মুখার্জি। অবসরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

বলছিলেন, ৩৪ বছরের চিকিৎসক জীবনের প্রান্তে এসে আজ সত্যিই মনের খুশিতে মানুষের চিকিৎসা করার সুযোগ পাচ্ছেন। কৃতজ্ঞতা জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে।

পিজির কার্ডিও থোরাসিক বিভাগের প্রবীণ ডাক্তারবাবু মানুষের এমন সেবা করার সুযোগ পেয়ে দারুণ আনন্দিত।

কথা হচ্ছিল 'শিশুসাথী' নিয়ে। হৃদযন্ত্রের নানা জটিল সমস্যা নিয়ে কত শিশু জন্মায়। কত শিশুর এই সমস্যা সময়ে ধরাও পড়ে না। পড়লেও, এই চিকিৎসা করার সামর্থ্য থাকে না বেশিরভাগ বাবা-মায়ের।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিশুসাথী' প্রকল্প চালু করে এই সমস্যার সমাধানে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে রাজ্যবাসীকে।

'শিশুসাথী' প্রকল্পের সুযোগ নিতে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে শিশু-কিশোরেরা আসছে পিজি-তে। ডা: মুখার্জি, ওয়ার্ডে নিয়ে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলালেন। কারও অপারেশন হয়েছে। কারও হবে। আলাপ হল তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গেও। ন্যূনতম আয়েরও তেমন ব্যবস্থা নেই। লাখ-লাখ টাকা খরচ করে অপারেশনের কথা তো তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। এমনকি ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এদের চিকিৎসার দায় নিয়েছে সরকার।

'শিশুসাথী' ছাড়াও কার্ডিও-থোরাসিক বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসছেন প্রান্তিক মানুষেরাও। ২-৪ লাখ টাকার অপারেশন হচ্ছে বিনামূল্যে। পেস-মেকার বসছে ডুয়াল-সিস্টেমের। ৭০-৮০ হাজার টাকা দামের। বসছে স্টেন্ট।

'গরিব মানুষেরা নিঃস্ব হয়ে যেত এই চিকিৎসা করাতে এসে। অপারেশনের পর দামি কোনও ওষুধের কথা তাঁদের বলা যেত না অনেক সময়ই। আর এখন, দামি-দামি ওষুধের ব্যবস্থা হচ্ছে। হাজার হাজার টাকার ওষুধের ব্যবস্থা হওয়ায় আমরাও আরও ভালো চিকিৎসার

সুযোগ পাচ্ছি। ফলে সাফল্য আসছে। মৃত্যু-হার কমছে। এই সাফল্যই রাজ্যের উন্নত চিকিৎসা-পরিষেবার সূচক হয়ে উঠছে। আসল পরিবর্তন তো এখানেই।' নিখরচায় চিকিৎসার এই মাত্রাটা হয়তো অজানাই থেকে যেত।

হাসপাতালে যাঁরা আসেন সকলেই গরিব নন। কিন্তু আধুনিক উন্নত চিকিৎসার সুযোগ নেওয়া সকলের সাধ্যের মধ্যে থাকত না। ফলে, দামি ওষুধের ব্যবস্থা করা তাঁদের অনেক সময়ই সম্ভব হত না। চিকিৎসকরাও ছিলেন নিরুপায়। ছিল না উন্নত যন্ত্রপাতি, উপকরণ, ওষুধ। ছিল না দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী ও চিকিৎসকদের 'টিম'। ওপেন হার্ট সার্জারির মতো ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন তো একার কাজ নয়। অনেকে মিলে, অনেকগুলো ইউনিট মিলে এই কাজ হয়।

পিজিতে চলছে স্বয়ংসম্পূর্ণ এমন একটি ইউনিট গড়ার কাজ। রাজ্য শুধু নয়, দেশের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য এই বিভাগটি ক্রমশ সেজে উঠছে। ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছিলেন আর বলে চলছিলেন ডা: মুখার্জি।

৩৪ বছর ধরে এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এই চিকিৎসক-অধ্যাপক। বলছিলেন, একদিকে অপারেশন চলে, অন্যদিকে ক্লাস নিই। হাতে-কলমে ওদের এভাবে তৈরি করছি।

অনেক হাসপাতালেই এই ধরনের অপারেশনের সুযোগ তৈরি করা যাচ্ছে না। 'স্পেশালিস্ট'-এর অভাবে। 'মানুষের প্রাণ হাতে নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের হতে হবে নিবেদিত প্রাণ। তবেই সাফল্য আসবে। আজ এদেরই বড়ো অভাব।

চোরা দীর্ঘশ্বাস তিনি লুকোতে পারলেন না। আগেই বলছিলেন, এটা তো Teaching Hospital। Way of study এখানে আলাদা। দেখাতে হবে। মুখস্থ করলে হবে না। ক্রিম আছে এই subject-এ। চোখ ফোটাতে হবে।

বলছিলেন, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা হল— দালালচক্রকে নিষ্ক্রিয় করা।

বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিতে যাঁরা আসছেন, তাঁরা বুঝে গিয়েছেন কারও হাতে টাকা গুঁজে দেওয়ার দিন শেষ হয়েছে।

অপ্রয়োজনে পেস-মেকার বসানোর কথাও আর ভাবেন না রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই। বেসরকারি নার্সিংহোমে যা লাখ লাখ টাকার ব্যাপার সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় সেটা পাওয়ার জন্য প্রান্তিক অঞ্চল থেকে 'রেফারেল' পদ্ধতিতে রোগীকে পাঠানো হচ্ছে এখানে।

পশ্চিম মেদিনীপুর বা উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে পাঠানো হচ্ছে হৃদযন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত মানুষদের। কার্ডিও-থোরাসিক সার্জারির ইউনিটে যে জটিল পদ্ধতিতে অপারেশন হয়, তার জন্য অনেক প্যারা-মেডিক্যাল কর্মীরও প্রয়োজন হয়। সরকার থেকে ওদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আগে কার্ডিওলজিই ছিল end-point। তারপর এল কার্ডিয়াক-সার্জারি। আর আজ কার্ডিও-থোরাসিক একটা বিশাল জায়গায় চলে গিয়েছে। আমাদের যাঁরা পড়িয়েছেন,

'শিশুসাথী' প্রকল্পে জটিল অপারেশন হয়েছে শিশুটির। ডা. শুভঙ্কর মুখার্জি পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলেন ওর অপারেশনের জটিলতার কথা।

কার্ডিও-থোরাসিক বিভাগের অপারেশনের পর রোগীদের পরিচর্যা কক্ষ

শিখিয়েছেন এসব তাঁরা দেখে যেতে পারলেন না। দেখলে তাঁরা মানসিক শান্তি পেতেন। আজকের প্রজন্মের কাছে সেদিনের কথা বলি। এই দিন বদলের কথা বলি। তখন আমাদের পড়তে হত কয়েকটা পৃষ্ঠা। আর আজ পড়তে হয় কত মোটা মোটা বই। কত এগিয়ে গিয়েছে বিষয়টা। নতুন প্রজন্মকে তার জন্য তৈরি করতে হবে।

অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে। ECMO-র মতো যন্ত্র বসেছে। এর সঠিক ব্যবহার জানা লোক দরকার। এদের বলে পারফিউশনিস্ট। এখন এদের জন্য কোর্স চালু হয়েছে। জেলায় জেলায় যে স্পেশালিটি হসপিটালের বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে সেখানে ওরা যাবে। কাজ করবে। আজ যা পিজি-তে হচ্ছে, অচিরেই জেলার ওইসব হাসপাতালে এমন অপারেশন হবে। যে পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, যেভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, জেলায় জেলায় একদিন মানুষ এই অপারেশনের সুবিধা পাবে। কিন্তু সমস্যা, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের।

আজকের জীবনে 'অর্থ' বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালের মোটা মাইনের প্রলোভন ছেড়ে সরকারি হাসপাতালে অনেকেই আসতে চাইছেন না। MCH-এর কোর্স করতে হলে ২ লাখ টাকা ডিপোজিট রাখতে হচ্ছে। গরিব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ওই টাকা অল্পসময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ৬টি আসনের মধ্যে এবছর একটিমাত্র আসনে ছাত্র মিলেছে এই কলেজে। এনআরএস ও মেডিক্যাল কলেজে কোনো ছাত্র পাওয়া যায়নি। ৬টি করে আসন শূন্য।

এই 'শূন্যতা'—সব আশাকেই যেন নির্মূল করে দিচ্ছে। 'শিশুসাথী'-প্রকল্পের সার্থকতাও নির্ভর করছে এদের ওপর। ব্রেন ডেথ্-এর ফলে আজ কিডনি, লিভার, হার্ট প্রতিস্থাপন করে কত মানুষকে নতুন জীবন দান করা সম্ভব হচ্ছে। কার্ডিয়াক সার্জেন, কার্ডিয়াক অ্যানাসথেসিস্ট, দক্ষ পারফিউশনিস্ট, ডায়ালিসিস এক্সপার্ট—এমন অনেককিছু নিয়েই তো গড়ে উঠবে complete unit।

আর্থিক সামর্থ্য নেই বলে যারা MCH করতে পারবে না, তাদের জন্য সরকারকে ভাবতে হবে। গরিব মেধাবী

অপারেশনের পরই শয্যায় আনা হয়েছে রোগীকে

ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর রাজ্যের উন্নত চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করছে। মেধাবীই শুধু নয়, মানবদরদী ছাত্র-ছাত্রীর আজ বড়ো প্রয়োজন, যারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির প্রয়োজনীয়তা বুঝবে।

'শিশুসাথী'-র অনেক শিশুই আসছে অনেক জটিলতা নিয়ে। তাদের রেফার করা হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাংক হাসপাতাল, ব্যাঙ্গালোরের দেবী শেঠীর হাসপাতালে। প্রয়োজন পড়ছে দামী 'কন্ডুইড' ভালভ্ দেওয়ার। কোনও কার্পণ্য নেই রাজ্য সরকারের। সরকার টাকা দেবে। সুচিকিৎসা চাই। রাজ্যের একটি প্রাণও যেন বিনা চিকিৎসায় হারিয়ে না যায়। প্রকৃত অর্থেই, সরকার যেন 'শিশুসাথী'।

অপারেশনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে পার্ক সার্কাসের এই কিশোর

এছাড়াও, হার্ট, লাঙ প্রতিস্থাপনের জন্যও এই বিভাগ আবেদন করেছে। প্রতিটি ফুসফুসে ৩টি লোব থাকে। মা তাঁর সন্তানকে একটি দিতে পারে। চলছে এই ভাবনাও। লিভিং ডোনার লাঙ ট্রান্সপ্লান্টেশন-এর ব্যাপারে চলছে সচেতনতার কাজ।

অঙ্গ প্রতিস্থাপনার নানা কাজ সরকারি অর্থে বেসরকারি হাসপাতালেও হচ্ছে। বিনা পয়সায়।

কমে গিয়েছে দূরত্ব। ট্রমা কেয়ার ইউনিটের ছাদ এত বড়ো করা হচ্ছে যেন সেখানে হেলিকপ্টার নামানো যায়। ব্রেন ডেথ-এর ফলে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনে যে সাফল্য এই রাজ্য অর্জন করে চলেছে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী ডা. মুখার্জিরা।

বললেন, সবই তো অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দরকার আরও ডিভোশান। প্রকৃত দক্ষ কর্মী।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্য যে গতিতে এগিয়ে চলেছে একসময় সেটা ছিল অভাবনীয়। ১০০০ মানুষের মধ্যে ৯ জনের হার্ট ফুটো থাকে। আগে ৪০-৫০ বছরের মানুষদের করোনারি আর্টারির ডিজিজ হতো। এখন দেখা যাচ্ছে ৩০ বছর বয়সেও হচ্ছে। খাদ্যাভ্যাস, জীবনশৈলী, সচেতনতার অভাব এর জন্য দায়ী।

বর্তমানে এখানে মাসে ৮০টি ওপেন হার্ট সার্জারি হচ্ছে। বিনা পয়সায়। আগে ভাবা যেত না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরি করা ও ধরে রাখা দরকার। এটাই এখন প্রধান কাজ। জানালেন ডা: মুখার্জি।

প্রতিবেদন : সুপ্রিয়া রায়

ছবি: সম্পাদকীয় শাখা। প্রথম ছবিটি অন্য সূত্রে প্রাপ্ত

সদ্য অপারেশনের পর বিছানায় দেওয়া হচ্ছে রোগীকে

গ্যাসট্রোএনটেরোলজি ও লিভারের চিকিৎসা

অন্যতম পথিকৃত এসএসকেএম হাসপাতাল

পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বভারতের অন্যতম বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সরকারি হাসপাতাল হল কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল। এই হাসপাতালের অন্যতম ব্যস্ত বিভাগ হল গ্যাসট্রোএনটেরোলজি ও হেপাটোলজি বা স্কুল অব ডাইজেসটিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজেস (এসডিএলডি)। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে তো বটেই, প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকেও এই বিভাগে বহু মানুষ চিকিৎসা পেতে আসেন।

২০১৭ সাল (সূত্র বার্ষিক রিপোর্ট— এসএসকেএম হাসপাতাল)

পরিষেবা	গ্রহণকারীর সংখ্যা
গ্যাসট্রোএনটেরোলজি বহির্বিভাগ	১,০১,২২৮
হেপাটোলজি বহির্বিভাগ	২৩,৯৭৮
গ্যাসট্রোসার্জারি বহির্বিভাগ	৫,৬১৮
পেডিয়াট্রিক গ্যাসট্রোএনটেরোলজি বহির্বিভাগ	৩,৮০৯
গ্যাসট্রোএনটেরোলজি অন্তর্বিভাগ	১,৭৮০
হেপাটোলজি অন্তর্বিভাগ	৭২৮
গ্যাসট্রোসার্জারি অন্তর্বিভাগ	৪২৩
এন্ডোস্কপি	১১,৮৬০
কোলোনোস্কপি	৩,০২৫
ইআরসিপি	১,৫৩৪
লিভার বায়োপসি	২৪৯
প্যাথোলজি	২,৫৮১
আল্ট্রাসোনোগ্রাফি	৯,৫০৪
আইটিইউ	২১৫
লিভার প্রতিস্থাপন	৩

এসডিএলডি-তে আছে—

- গ্যাসট্রোএনটেরোলজি বহির্বিভাগ
- হেপাটোলজি বহির্বিভাগ
- পেডিয়াট্রিক গ্যাসট্রোএনটেরোলজি বহির্বিভাগ
- গ্যাসট্রোসার্জারি বহির্বিভাগ
- প্যানক্রিয়াটিক ক্লিনিক
- লিভার প্রতিস্থাপন ক্লিনিক
- ইনফ্লামাটারি বাওয়েল ডিজিজ (আই বি ডি) ক্লিনিক
- ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আই বি এস) ক্লিনিক

অন্যান্য পরিষেবার মধ্যে আছে—

- এন্ডোস্কপি ও কোলোনোস্কপি
- প্যাথোলজি
- রেডিয়োলজি
- বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগ
- পুরুষ ও মহিলা অন্তর্বিভাগ
- শল্য চিকিৎসা
- আনাস্থেশিয়া
- লিভার বায়োপসি
- ফাইব্রোস্ক্যান
- ইআরসিপি
- স্পাইগ্লাস কলঙ্গীয়স্কপি
- এন্ডোস্কপিক আল্ট্রাসাউন্ড
- ডবল বেলুন এন্ডোস্কপিক
- ক্যাপসুল এন্ডোস্কপিক
- ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রি
- এনোরেকটাল ম্যানোমেট্রি
- পিএইচ ইম্পেড্যান্স
- লিভার প্রতিস্থাপন
- আইটিইউ
- পিসিইউ ইত্যাদি

গ্যাসট্রোএনটেরোলজি ও হেপাটোলজি বিভাগের প্রধান হলেন যথাক্রমে ডাঃ গোপালকৃষ্ণ ঢালি ও ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী। এছাড়াও বিভাগে আছেন একদল যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-চিকিৎসক, অন্যান্য চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। এসডিএলডি-তে পোস্ট ডক্টরল পড়ানো হয়—ডিএম, এমসিএইচ আর গবেষকগণ আসেন বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগে।

এই বিভাগের বিভিন্ন প্রজেক্ট ও গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করে। এই গবেষণা বিভিন্ন জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কনফারেন্সে পুরস্কৃত হন। খালি গবেষণাই নয়, এসডিএলডি বিপুল সংখক রোগীকে পরিষেবা দেয়। ২০১৭ সালে গ্যাসট্রোএনটেরোলজি বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হয়েছেন ১,০১,২২৮ (এক লক্ষ এক হাজার দুশো আঠাশ জন), হেপাটোলজি বহির্বিভাগ ২৩,৯৭৮ (তেইশ হাজার ন'শো আটাত্তর জন)। গ্যাসট্রোএনটেরোলজি অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়েছেন ১,৭৮০ (এক হাজার সাতশো আশি জন), হেপাটোলজিতে ৭২৮ (সাতশো চল্লিশ জন) গ্যাসট্রোসার্জারিতে ৪২৩ (চারশ তেইশ জন), এন্ডোস্কপি পরিষেবা পেয়েছেন ১১,৮৬০ (এগারো হাজার আটশো ষাট জন), কোলোনোস্কোপি ৩,০২৫ (তিন হাজার পঁচিশ জন), ইআরসিপি ১,৫৩৪ (এক হাজার পাঁচশ চৌত্রিশ জন)। লিভার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে তিন জনের। নিজেদের দক্ষতা আরও উন্নত করার জন্য বিভাগে নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয় বিভিন্ন আধুনিক কুশলতার ওয়ার্কশপ। ভবিষ্যতেও সুনামের সঙ্গে রোগী পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর এসডিএলডি।

২০১৮ সাল (জানুয়ারি-আগস্ট, সূত্র: বার্ষিক রিপোর্ট— এসএসকেএম হাসপাতাল)

পরিষেবা	গ্রহণকারীর সংখ্যা
গ্যাসট্রোএনরোলজি বহির্বিভাগ	৭৪,৪২৩
হেপাটোলজি বহির্বিভাগ	১৮,৮২২
পেডিয়াট্রিক গ্যাসট্রোএনটেরোলজি বহির্বিভাগ	২,৮০৫
গ্যাসট্রোএনটেরোলজি অন্তর্বিভাগ	১,৪৩৬
হেপাটোলজি অন্তর্বিভাগ	৬০৪
এন্ডোস্কপি	১০,২৪০
কোলোনোস্কপি	২,২৬৩
ইআরসিপি	১,২৪৫
লিভার বায়োপসি	২০৩
আল্ট্রাসোনোগ্রাফি	৮,৭৮৪
আইটিইউ	১৯৬
লিভার প্রতিস্থাপন	১

ফের ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পলিক্লিনিক, শুরু হচ্ছে লিভারের অত্যাধুনিক চিকিৎসা

চারতলা বাড়িটার এখন সাজো সাজো রব। মেঝে, দেওয়ালে নতুন করে টাইলস্ বসছে, এসি-র ডাক্ট তৈরি হচ্ছে—এককথায় আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার উপযোগী করে তুলতে এবং রোগীদের আকর্ষণ করতে যা যা প্রয়োজন—ঠিক সেভাবেই সেজে উঠছে পলিক্লিনিক। সাধারণভাবে যাকে মানুষ 'পিজি পলিক্লিনিক' বলেই চেনে।

সামান্য কিছু অর্থমূল্য খরচ করতে হবে। আর তাহলেই এস এস কে এম হাসপাতাল ও আইপিজিএমইআর-এর সঙ্গে যুক্ত তাবড় তাবড় চিকিৎসকদের কাছ থেকে মিলবে চিকিৎসা পরিষেবা। মূলত এই সুযোগ করে দিয়েই একসময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল পলিক্লিনিক। কারণ, মনে রাখতে হবে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে কলকাতা শহরে বেসরকারি ভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা সেভাবে দানা বাঁধেনি। কর্পোরেট স্বাস্থ্য পরিষেবা তো অনেক দূরের ভাবনা। ফলে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরাই তখন আপদে-বিপদে মানুষের একমাত্র ভরসার জায়গা—ভগবানের দ্বিতীয় রূপ।

ঠিক এই সময়ে এসএসকেএম হাসপাতালের চিত্রটাও একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। এখানকার চিকিৎসকদের তখন হাসপাতালের বাইরে 'প্রাইভেট প্র্যাকটিস' করার অনুমতি ছিল না। ফলে তাঁরাও পলিক্লিনিকে রোগী দেখার ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আর তার বিনিময়ে সামান্য কিছু

অর্থ তাঁদের প্রদান করা হত। পলিক্লিনিক থেকে সরকার যে অর্থ উপার্জন করত, তার একটি সামান্য অংশ পেতেন এই চিকিৎসকেরা।

সরকারি হাসপাতালের সুদীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হল না, অথচ, সামান্য কিছু অর্থমূল্যের বিনিময়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধাও পাওয়া গেল। যে সরকারি চিকিৎসকদের মানুষ ভগবান জ্ঞানে পুজো করত—তাঁরাই এখন মাত্র হাত কয়েকের ব্যবধানে।

এভাবেই রমরমিয়ে চলছিল পলিক্লিনিক। এবারে আমাদের একটু পিছনে ফিরে তাকানো দরকার। এই পলিক্লিনিক তৈরির একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। সেটাই জেনে নিতে হবে আমাদের।

চৌধুরীদের বাড়ি

পলিক্লিনিক ভবনের ঠিক পাশেই রয়েছে চৌধুরী পরিবারের বসতবাড়ি। জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের কোনও এক পূর্বপুরুষের স্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে চিকিৎসা পেয়ে উপকৃত হয়েছিলেন। পরে বোধ হয় বিধান রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই ওই পরিবার তাঁদের একটি বাড়ি মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে সরকারের হাতে তুলে দেয়, সম্ভবত ১৯৬২ সাল নাগাদ। কিন্তু এই হস্তান্তরের জন্য সরকারের সামনে কিছু শর্ত রাখে ওই পরিবার।

প্রথমত, চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও কাজেই সরকার ওই ভবনটি ব্যবহার করবে।

দ্বিতীয়ত, সরকার কোনও অবস্থাতেই বেসরকারি সংস্থার হাতে ওই বাড়িটি পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেবে না। চিকিৎসা পরিষেবার কাজ সরকার নিজের দায়িত্বেই চালিয়ে যাবে।

এবং তৃতীয়ত, জনসংখ্যার যে অংশ সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘ সময় লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারে না—আবার বেসরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ্যও যাঁদের নেই—তাঁদের সামান্য কিছু অর্থমূল্যের বিনিময়ে সরকার চিকিৎসা করানোর সুযোগ করে দেবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে।

সেই মতোই কাজ শুরু হয়। এবং তার পরের দীর্ঘ কয়েক বছরের সাফল্যের ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। দূরদূরান্ত থেকে এমনকি উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ থেকেও রোগীরা এখানে ছুটে আসতেন। কিন্তু এই সুবর্ণ যুগ বদলাতে শুরু করল নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। কারণ, নব্বইয়ের গোড়া থেকেই কলকাতা শহরে বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে কর্পোরেট চেহারায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ঝাঁ-চকচকে কলেবর লাভ করে। সেখানকার ঔজ্জ্বল্যের কাছে এক সময় হার মানতে শুরু করে সরকারি ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য পরিষেবা। মানুষের পছন্দ বদলাতে শুরু করে। ফলে যাঁরা চিকিৎসার জন্য সামান্য কিছু অর্থ খরচ করার সামর্থ্য রাখতেন, তাঁরা এই সময় থেকেই সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেন।

এই একই প্রভাব পড়েছিল পলিক্লিনিকের উপরেও। ফলে ২০০০-২০১০ সালের মধ্যে পলিক্লিনিক তার চাকচিক্য হারাতে থাকে। নিজস্ব নার্স, প্যারামেডিক্যাল ও টেকনিক্যাল কর্মী, অফিস চালানোর জন্য কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও পলিক্লিনিক তার জৌলুস হারাতে থাকে। অথচ, দীর্ঘদিন পর্যন্ত পলিক্লিনিকে ইনডোর পরিষেবাও ছিল। ৫৪টি শয্যায় রোগীরা ভর্তি হতেন। স্বল্প মূল্যে অ্যাপেনডিক্স, হার্নিয়া, গল ব্লাডার স্টোন-এর মতো অস্ত্রোপচার করা হত। পলিক্লিনিকের নিজস্ব ওটি-তে। ছিল এক্স-রে এবং প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একটি ল্যাবরেটরিও।

তবে, ইনডোর পরিষেবা বন্ধ হলেও এখানে আউটডোর পরিষেবা ২টি শিফটে আজও চলছে দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

২০১১ সালে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পলিক্লিনিকের চাকা আবার নতুন করে ঘুরতে শুরু করে। পলিক্লিনিকের ৩০ হাজার স্কোয়্যারফুট জায়গা যাতে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়।

এই সময় এগিয়ে আসে এসএসকেএম-এর স্কুল অব ডিজেসটিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজেস (এসডিএলডি)।

ওই বিভাগের দুই বিশিষ্ট চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী এবং গোপালকৃষ্ণ ঢালি বিস্তৃত রিপোর্ট এবং প্রস্তাব তৈরি করে পেশ করেন। তাঁদের দাবি ছিল, তাঁদের বিভাগের আউটডোর পরিষেবা নিতে আসা রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। এই অবস্থায় বর্তমান পরিসরে কাজ সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠছে তাঁদের পক্ষে। তাই পলিক্লিনিকের ইনডোর বিভাগ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। সেইমতো ১৬ জুলাই, ২০১৩ থেকে পলিক্লিনিকেই রোগী ভর্তি রাখতে শুরু করেছে এসডিএলডি। হেপাটোলজি এবং পেডিয়াট্রিক গ্যাসট্রোএনটেরোলজি-র আওতায় ৪০টি শয্যা চালু আছে সেখানে। তাঁদের দেখভাল ও চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন এসডিএলডি-র ফ্যাকাল্টি এবং পোস্ট ডক্টরাল রেসিডেন্ট চিকিৎসকেরা।

পলিক্লিনিকের অন্দরে ঢুকে দেখা গেল পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে ভর্তি ফৈয়াজ হোসেন। বাড়ি মালদায়। জন্ম থেকে জনডিস তার। মালদা থেকে এনআরএস ঘুরে এখন পলিক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে ফৈয়াজ। তার মায়ের কথায়, ‘বিনা পয়সায় এত যত্ন করে ডাক্তারবাবুরা দেখেন, এখানে ভর্তি না হতে পারলে কী যে হত! আর কী পরিষ্কার হাসপাতাল।’

২১ দিন ধরে ভর্তি সুন্দরবনের জয়নগর থেকে আসা ১১ মাসের শিশু সোহান শেখ। তার মা জানালেন, লিভারে টিউমার হয়েছে সোহানের। চারটি ‘কেমো’ দিয়ে তার পরে হবে অস্ত্রোপচার। ‘ডাক্তারবাবুরা যত্ন করে দেখছেন ছেলেটাকে। ভালো হয়ে যাবে নিশ্চয়ই— সোহানের মায়ের চোখে জল মুখে হাসি।

ফৈয়াজ, সোহান, অমৃতাদের মতো আরও রোগী যাতে উপকার পায় সেই লক্ষ্যে ‘এসডিএলডি’ সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করে। বলা হয়—

(ক) সকালের শিফটে একটি আউটডোর পরিষেবা চালু করা হোক পলিক্লিনিকে—যে আউটডোর পরিষেবা

পলিক্লিনিকের ধাঁচেই 'আয় সৃজনকারী' পদ্ধতিতে করা যেতে পারে।

(খ) গ্যাসট্রোএনটেরোলজি এবং লিভারের রোগের ক্ষেত্রে টারসিয়ারি কেয়ার প্রদান করা হবে পলিক্লিনিক থেকে।

এরপর ২০১৭ সাল থেকে সরকার পলিক্লিনিকের মূল দায়িত্ব এসডিএলডি-র হাতে তুলে দেয়।

জানা গিয়েছে, অক্টোবর মাসের মধ্যেই একতলার সংস্কার কাজ শেষ করে এসডিএলডি-কে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে পূর্ত বিভাগ। তার পরে শুরু হবে এনডোস্কোপি। ধীরে ধীরে চালু হয়ে যাবে অস্ত্রোপচার, ইআরসিপি, এনডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি, আলট্রাসোনোগ্রাফি, প্যাথোলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রি।

গলব্লাডার, প্যানক্রিয়াস, অন্ত্র, লিভার, পাকস্থলী, কোলন—সমস্ত অস্ত্রোপচারই করা যাবে এখান থেকে। বিভাগের ২১ জন রেসিডেন্ট চিকিৎসক, ১৪ জন ফ্যাকাল্টি, ৮ জন মেডিক্যাল অফিসার ছাড়া শুধু এখানকার জন্য নিয়োগ করা হবে টেকনিশিয়ান, নার্স ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের।

আসছে অত্যাধুনিক মানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। এসডিএলডি-র হাত ধরে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নে মশগুল পিজি পলিক্লিনিক।

মায়ের সঙ্গে ফৈয়জ হোসেন।

প্রতিবেদন : সর্বাণী আচার্য

ছবি : সৌরভ দত্ত

সোহান শেখ

বাঙুর ইন্সটিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস

১৯৫১ সাল। কলকাতায় শুরু হল এক বিশেষ ধরনের চিকিৎসা-ব্যবস্থা। নিউরোলজি। অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের নানা জটিলতার থেকে যে যে উপসর্গ দেখা দেয়, তারই চিকিৎসা। শুরু হল তৎকালীন প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল অর্থাৎ পিজি হাসপাতালে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব ভারতের প্রথম নিউরোলজি বিভাগে ফোর-চ্যানেল গ্রাম মেশিন বসিয়ে প্রথম ইইজি (EEG) বিভাগের সূচনা হল। প্রফেসর টিকে ঘোষ হলেন বিভাগীয় প্রধান। তিনি Dr. Ishad Weekslar এবং Dr. Hans Strauss-এর কাছ থেকে এই বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন।

১৯৫৫-র ফেব্রুয়ারি। এই হাসপাতালেই নিউরোমেডিসিন ও নিউরো সার্জারি নিয়ে শুরু হল নিউরোলজির যুগ্ম বিভাগ (কম্বাইনড ডিপার্টমেন্ট)। এই বিভাগের প্রথম ডিরেক্টর এবং প্রফেসর হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালের নিউরোলজিক্যাল ক্লিনিকের Dr. Herbert Crause-কে।

ইতিমধ্যে পিজি হাসপাতালের বিবর্তনের ইতিহাস অনেক পৃষ্ঠা দখল করে নিয়েছে। শেঠ সুখলাল কারনানির নামাঙ্কিত এসএসকেএম হিসাবে পিজি হাসপাতালের পরিচিতি গড়ে উঠেছে (১৯৫৪ সালে)।

১৯৫৭-র ১৬ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি প্রখ্যাত চিকিৎসকও, সেই ডা. বিধানচন্দ্র রায় চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে এই হাসপাতালের সঙ্গে চালু করলেন পূর্বভারতের প্রথম Post-Graduate Medical Institute — নাম হল Institute of Post-Graduate Medical Education and Research (IPGME & R)।

IPGMER & SSKM-এর এই কম্বাইন্ড ডিপার্টমেন্ট ১৯৬৬ সালে দুটি আলাদা বিভাগে পরিণত হল। একটি হল নিউরোমেডিসিন বিভাগ এবং অন্যটি নিউরোসার্জারি বিভাগ।

১৯৭০ সাল। এই রাজ্যে নিউরোলজিক্যাল সায়েন্স বিষয়ে আরও পড়াশোনা ও চিকিৎসার জন্য একটি স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পথ চলা শুরু করল। এইভাবেই শুরু হল বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অব নিউরোলজি। সংক্ষেপে

বিআইএন (BIN)। ২০ শয্যার একটি দোতলা বাড়ি নিয়ে কাজ শুরু করল BIN। IPGMER-এর সংলগ্ন জমিতে, তারই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে (প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত)।

১৯৭৫-এ সম্প্রসারিত হল BIN। তৃতীয় ও চতুর্থ তল তৈরি হল কলকাতা পৌরসভার সহযোগিতায়। শয্যাসংখ্যা ২০ থেকে বেড়ে হল ৭০। এর মধ্যে ৩৮টি হল নিউরো-সার্জারির। IPGMER-এর নিউরো-মেডিসিন এবং নিউরো-সার্জারির চিকিৎসক অধ্যাপকদের নিজেদের কাজের পাশাপাশি BIN-এর সঙ্গেও যুক্ত করা হয়।

১৯৭৯ থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তুলে BIN স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে।

২০০২ সালে তৈরি হল পঞ্চম তল।

স্নায়ুতন্ত্রের নানা জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয় এখানে। নিউরো মেডিসিনের ৭টি স্পেশাল ক্লিনিক চলে বর্তমানে। নিউরো ডিপার্টমেন্টের আউটডোর থেকে যাঁদের রেফার করে পাঠায় তাঁদের চিকিৎসা হয় এই ক্লিনিকে। সোম থেকে শনি সাড়ে এগারোটা থেকে ক্লিনিক চালু হয়। এই ক্লিনিকগুলি হল—বোটক্স ক্লিনিক, এপিলেপ্সি ক্লিনিক, জেনেটিকস ক্লিনিক, স্ট্রোক ক্লিনিক, পেইন ক্লিনিক, মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার ক্লিনিক (নিউরো মাসকুলার) এবং মাথাযন্ত্রণা নিরাময়ের ক্লিনিক (হেডএক ক্লিনিক)।

এখানে ২টি স্ট্রোক বেড আলাদা করা আছে। জিন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য জেনেটিক ল্যাবরেটরি আছে। এমআরআই, টেক্সলা এবং সিটিস্ক্যান হয় সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়। ডিজিটাল সাবট্র্যাকশান অ্যানজিওগ্রাফি (DSA) করা হয় মস্তিষ্কে কোথাও রক্ত জমাট বেঁধে আছে কিনা দেখার জন্য। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের বিশেষ অপারেশন করা হয়। রক্ত চলাচল ঠিক রাখতে ভেন ক্লিপিং করা হয়। মস্তিষ্কে রক্ত জমে বড় ক্লট তৈরি হলে কয়েলিং (Coiling) অপারেশন হয় এবং তারপর স্টেইন বসানো হয়। এছাড়া ৮টি বেড আছে NICU-র জন্য। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের নাম সকলের মুখেমুখে।

চলছে নিউরোলজির বিরল চিকিৎসা

নতুন চেহারায় ফিরল ভেঙে পড়া রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতাল

শনিবার গোটা রাতটা যে কীভাবে কেটেছে তা শুধু একা নমিতা জানেন। বাড়ির সবাই সেদিন এক বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আত্মীয়ের বাড়িতে। শ্বশুরমশাইয়ের শরীরটা ক-দিন ধরে ভালো যাচ্ছিল না। তাই তাঁর দেখভাল করার জন্য ঘরেই থেকে গিয়েছিলেন নমিতা।

ঘড়ির কাঁটা তখন রাত ১২টা ছুঁইছুঁই। প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন নমিতার শ্বশুরমশাই বিমল চন্দ্র। স্থানীয় চিকিৎসক এসে দেখে বললেন, মনে হচ্ছে ব্রেন স্ট্রোক, সময় নষ্ট না করে সোজা পিজি হাসপাতালে নিয়ে যান। একা নমিতার তখন ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়। ফোনে বাড়ির লোকদের খবর জানিয়েই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে দৌড়লেন পিজি। হাওড়ার বালটিকুড়ি নস্করপাড়া থেকে সোজা পিজি হাসপাতাল।

পিজির এমার্জেন্সিতে নমিতার শ্বশুরমশাইকে দেখে চিকিৎসকেরা জানালেন, এখানে নয়, বিমলবাবুর চিকিৎসা হবে রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতালে। আর তার জন্য রামরিকদাস হাসপাতাল থেকেই অ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে যাবে রোগীকে।

রামরিক হাসপাতাল দেখে সত্যিই সেদিন 'চক্ষু চড়কগাছ' হয়ে গিয়েছিল নমিতার। সরকারি হাসপাতাল এমন হতে পারে? কোথাও একফোঁটা ময়লা নেই, ওয়ার্ডে অযথা অবাঞ্ছিত লোকজনের ভিড় নেই। সেই হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধটাই যেন উধাও।

নমিতা একা নন, প্রতিদিন হাসপাতাল দেখে অবাক হন হাসপাতালে আগত আরও বহু মানুষই। কারণ, দক্ষিণ কলকাতার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও এই হাসপাতাল সম্পর্কে জানেন কতজন মানুষ?

পুরো নাম, রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতাল। ঠিকানা—১০৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর। যতদূর জানা যায়, ১৯৩১-এর মাঝামাঝি এই হাসপাতালের সূচনা। গোড়ায় কেবল একটিমাত্র শয্যা এবং চ্যারিটেব্‌ল আউটডোর ডিসপেনসারি পরিষেবা নিয়ে হাসপাতালটি চালু করেছিল হরলালকা পরিবার। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গজানন হরলালকা। এরপর থেকে হাসপাতালের পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকে। শয্যাসংখ্যা পৌঁছোয় ১ থেকে ৯১-তে; তার মধ্যে ৫০টি শয্যাতেই বিনামূল্যে পরিষেবা মিলত।

সেই সময়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, কলকাতা পুরসভা, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং হরলালকা পরিবার—এই পাঁচটি সূত্র থেকে হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যেত।

১৯৭৯ সালের ২৭ মে সরকারের সঙ্গে হাসপাতাল হস্তান্তর নিয়ে বৈঠক হল ট্রাস্টি বোর্ডের। যথাসময়ে হাসপাতাল অধিগ্রহণ করে সরকার। শুধু ১টি কেবিন, ২টি অস্ত্রোপচারের জন্য নির্দিষ্ট শয্যা এবং ২টি ফ্রি-বেড নিজেদের হাতে রেখে দেয় প্রতিষ্ঠাতা পরিবার। কিন্তু চিকিৎসক ও কর্মীদের সংখ্যা একসময় কমতে শুরু করে। বদলির কারণে অথবা অবসর নেওয়ার পর তাঁদের ফাঁকা স্থান পূরণ করতে নতুন করে লোক দিতে পারেনি পূর্ববর্তী সরকার। এর ফলে একসময় হাসপাতালটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেই অবস্থা চলে নয় নয় করেও প্রায় ১৫ বছর।

২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই ক্রমশ মোড় ঘুরতে থাকে।

ওই বছরই ৬ জুন নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ঠিক হয়, এসএসকেএম হাসপাতালের এক্সটেনশন ক্যাম্পাস হিসাবে কাজ করবে রামরিকদাস। এসএসকেএম-এর অর্থোপেডিক বিভাগের রোগীদের অস্ত্রোপচার করার পর বেশ কিছুদিন এখানে রেখে তাঁদের 'পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ার' প্রদান করা হবে। এর জন্য রামরিক হাসপাতালের ৪০টি শয্যাকে নির্দিষ্ট করা হয়। সেইমতো কাজও শুরু হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে হাসপাতাল ভবনের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। ততদিনে কলকাতা পুরসভা হাসপাতালের একটি ভবনকে 'বিপজ্জনক' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বাকিগুলির অবস্থাও ভালো নয়। ২০১৪ সাল থেকে হাসপাতালের পুরনো বিপজ্জনক বাড়িগুলি ভেঙে নতুন ভবন তৈরির কথা শুরু হয়। ঠিক হয়, একটি ১০০ শয্যার হাসপাতাল ভবন নতুন করে নির্মাণ করা হবে।

সেই নতুন বাড়িতেই বর্তমানে চলছে নিউরো মেডিসিন হাসপাতাল। এখন রয়েছে ৭০টি শয্যা। সঙ্গে ৪ শয্যার আইসিইউ। আরও ১০টি আইসিইউ শয্যা খোলা হবে অতি দ্রুত। ২০টি সাধারণ শয্যাও চালু হবে রামরিক-এর দ্বিতীয় ভবনের কাজ শেষ হলে।

ভাঙাচোরা পুরনো বাড়ির জায়গায় আজ ঝাঁ-চকচকে ৬ তলা বাড়ি। ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭ এই ভবনের উদবোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রথম দিন থেকেই

হাসপাতালের সব শয্যা প্রতিদিন পূর্ণ রয়েছে বলে জানালেন হাসপাতালের সুপার পার্থ দে।

ঠিক কী কী উন্নত মানের পরিষেবা দিচ্ছে এই হাসপাতাল?

(ক) ২টি পুরুষ এবং ১টি মহিলা ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি শয্যায় যুক্ত করা হয়েছে কার্ডিয়াক মনিটর।

(খ) প্রতিটি শয্যাই 'ফুল ফাওলার বেড'। অর্থাৎ, রোগীর সুবিধামতো যে শয্যাগুলি ওঠানো-নামানো যায়—নিউরোলজির রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালে যে শয্যা অত্যন্ত জরুরি।

(গ) রোগীর শরীরে যাতে ক্ষত তৈরি না হয় তার জন্য এয়ার ম্যাট্রেস-এর ব্যবস্থা আছে শয্যায়।

(ঘ) কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ লাইন যুক্ত আছে প্রতি শয্যায়।

(ঙ) ইসিজি, ইইজি, ইএমজি, এনসিভি-সহ বিভিন্ন আধুনিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে হাসপাতালে। আছে আলট্রা সোনোগ্রাফি এবং পোর্টেবল এক্সরে যন্ত্র। চলতি বছরের নভেম্বর মাস থেকে অত্যাধুনিক মডেলের ১২৮ স্লাইস সিটি স্ক্যান যন্ত্র কাজ শুরু করবে। এত আধুনিক যন্ত্র খুব কম হাসপাতালেই পাওয়া যায়।

শুধু স্ট্রোক—নয় এপিলেপ্সি, মেনিনজাইটিস, এনকেফেলাইটিস, পার্কিনসন্স, মায়াসথেনিয়া-সহ বহু বিরল নার্ভের রোগের চিকিৎসা হয় এই হাসপাতালে। চিকিৎসা হয় ট্রান্সভার্স মায়েলিটিস রোগের। সিজার অর্থাৎ খিঁচুনির চিকিৎসা হয়। নেগেটিভ প্রেসার উন্ড থেরাপি (এনপিডব্লিউটি) পদ্ধতিতে বড়ো আকারের 'বেডসোর'-এর চিকিৎসা হয় রামরিকদাস হাসপাতালে।

গুলেন বেরি অর্থাৎ জিবি সিনড্রোম-এর মতো বিরল রোগের চিকিৎসাও এই হাসপাতালে সম্ভব। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এই রোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত মূল্যবান ইঞ্জেকশন প্রয়োজন। এক-একজন রোগীর ২০-২৫টি করে ইঞ্জেকশন দরকার হয়—যার প্রতিটার দাম ১০-১৫ হাজার টাকা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৩-৪ লক্ষ টাকা মূল্যের এই ইঞ্জেকশন রোগীরা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

হাসপাতালের সমস্ত পরিষেবাই মিলছে একেবারে

একটি পয়সাও খরচ না করে। আর এখানেই স্বতন্ত্র এই রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা।

রামরিক হাসপাতালের আইসিইউ-তে গিয়ে দেখা গেল, ৪টি শয্যাতেই রোগীর চিকিৎসা চলছে। তাদের একজন বছর আঠারোর মুক্তা দত্ত (নাম পরিবর্তিত)। জ্বর থেকে শুরু হয়েছে 'আনকনট্রোলেবল সিজার' বা খিঁচুনি যা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। রোগীর কথাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বন্ধ হাঁটা-চলাও। আইসিইউ-র চিকিৎসকেরাই জানালেন, এই রোগের নাম অটো ইমিউন এনকেফেলাইটিস। সেরে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। এখন প্রতি সপ্তাহে মুক্তাকে একটি করে ইঞ্জেকশন দিতে হচ্ছে— যার প্রতিটির দাম প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। রোগীর প্রয়োজনে এই ইঞ্জেকশনের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে।

আর এর সবটাই মুক্তাকে দেওয়া হচ্ছে একেবারে বিনামূল্যে।

বাঙুর ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স থেকে ভিজিটিং চিকিৎসকেরা এসে রোগী দেখলেও হাসপাতালের এই বিপুল পরিষেবার চাপ সামলাতে হয় মূলত 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি' এবং 'পোস্ট ডক্টরাল ট্রেনি'-দেরই। এমন চিকিৎসকের সংখ্যা ১০-১৫। তাঁরা ২৪ ঘণ্টা রোটেশন ভিত্তিতে এখানে কাজ করেন; এছাড়াও শুধুমাত্র এই হাসপাতালের জন্য নিযুক্ত আছেন ১২ জন হাউস স্টাফ, ৪ জন আইসিইউ মেডিক্যাল অফিসার। ১জন নার্সিং সুপার ও ২ জন সিস্টার ইনচার্জ ছাড়াও আছেন ৩৪ জন নার্স।

প্রায় ১৫ বছর ধরে ধুঁকতে থাকা একটি সরকারি হাসপাতালে যে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করা গেল এবং নিউরোলজি-সংক্রান্ত সমস্ত আধুনিক পরিষেবা যে রোগীদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, তাতেই পরিচয় মেলে নতুন সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির।

প্রতিবেদন ও হাসপাতালের সমস্ত ছবি : সর্বাণী আচার্য

মধুর স্নেহ

পূর্ব ভারতে প্রথম এবং দেশের মধ্যে সব থেকে আধুনিক মানবদুগ্ধ ব্যাংক তৈরি হয়েছে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে এবং তা সম্ভব হয়েছে নতুন সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায়। রয়েছে পাস্তুরাইজেশন, আধুনিক পদ্ধতিতে দুগ্ধ সংগ্রহ, নির্বাচন, প্রক্রিয়াকরণ, পরীক্ষা ও ভাণ্ডারিকরণের সুবিধা। যে সব শিশু নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মায়, কিংবা যাদের ওজন খুবই কম অথবা যারা জন্মের সময় দুর্ভাগ্যবশত নিজের মাকে হারায় বা যাদের মায়েরা কোনও কারণে প্রত্যক্ষভাবে দুধ পান করাতে পারেন না—তারা এই প্রকল্পে সঞ্চিত দুধের গ্রহীতা হতে পারে।

এই দুগ্ধ-ব্যাঙ্ক (Milk Bank) পূর্বভারতে একমাত্র এসএসকেএম-এই আছে। এখানের সংগৃহীত মাতৃদুগ্ধ শুধুমাত্র এই হাসপাতালের নবজাতকদের সরবরাহ করা হয়। ভর্তি হওয়া প্রসূতি-মায়েদের কাউন্সেলিং করা হয় এই ব্যাংকে দুধ দানের জন্য। ১০০টি বাচ্চা ভর্তি থাকে। বাচ্চাদের খাওয়ানোর পরে অবশিষ্ট দুধ মায়েদের থেকে দুগ্ধ ব্যাংকের জন্য নেওয়া হয়। দুগ্ধদাতা মায়েদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এইচআইভি ১ এবং ২, হেপাটাইটিস বি এবং সি, সিফিলিস থাকলে তাঁদের থেকে দুধ নেওয়া হয় না।

কেন আপনি আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন?

মায়ের দুধ খেলে শিশুর উপকার

১) মায়ের দুধ সহজপাচ্য, সহজলভ্য এবং জীবাণুমুক্ত।

২) ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ালে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয়।

৩) মাতৃদুগ্ধ পান করালে শিশুর জীবাণু সংক্রমণ, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, অ্যালার্জি ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

৪) মায়ের দুধ খাওয়ালে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত বয়সে হৃৎপিণ্ডের অসুখ, রক্তচাপ বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়।

৫) মায়ের বুকের দুধ খাওয়ালে মা ও শিশুর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং শিশু বেশি বুদ্ধির অধিকারী হয়।

শিশু বুকের দুধ খেলে মায়ের উপকার

১) মায়ের প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করা যায়।

২) মায়ের জরায়ু তাড়াতাড়ি প্রাক-গর্ভকালীন অবস্থায় ফিরে যায়।

৩) মায়ের গর্ভাবস্থার অতিরিক্ত ওজন ও জমা চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

৪) বুকের দুধ শিশুকে পান করালে পরবর্তী কালে মায়ের স্তন এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার ও হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫) শিশুকে বুকের দুধ পান করালে মায়ের পরবর্তী গর্ভধারণ দেরিতে হয়।

১) পাম্পিং মেশিনের সাহায্যে দুগ্ধ সংগৃহীত হয় মায়েদের স্তন থেকে।
২) -২০°তে (মাইনাস কুড়ি ডিগ্রিতে) সংরক্ষিত (সঞ্চয়) করে রাখা হয়। ৬ মাস পর্যন্ত রাখা যায়। দৈনিক ৬ লিটার করে দুধ সংগৃহীত হয়।
৩) ৬২.৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ওই দুধ ফুটিয়ে ৩০ মিনিট ধরে ঠান্ডা করে ৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আনা হয়।
৪) ১০০ মিলিলিটার করে বোতলে ভরে রাখা হয় যদিও বোতলগুলিতে ১৩০ মিলিলিটার দুধ সংরক্ষণ করা সম্ভব।
৫) ৬ মাসের আগেই সংরক্ষিত মাতৃদুগ্ধ পান করানো হয়।

ছয় মাসের ছোট শিশুর জন্য শুধুই মায়ের দুধ

জন্মের পর শিশুর প্রথমবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে শিশুকে মায়ের প্রথম দুধ খাওয়ানো অত্যন্ত আবশ্যক।
নবজাত শিশুকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়া অন্য কিছু যেমন মধু, মিছরির জল ইত্যাদি খাওয়ানো চলবে না।
এই সময় নিয়মিত টীকাকরণের জন্য শিশুকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।
প্রতি মাসে শিশুর ওজন বাড়ছে কিনা বোঝার জন্য নিয়মিত অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে ওজন করাতে হবে।
ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশু মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোনও খাবার/জল খাবে না।

লেখা ও ছবি:
সৌরভ দত্ত

এসএসকেএম হাসপাতালের মানবদুগ্ধ ব্যাংকের ছবি।

রাজ্যের ‘স্টেট অব দ্য আর্ট’ আরআইও-তে

বিনামূল্যে চোখের সব চিকিৎসা

ডা. কে পি বৈদ্য

চলছে সদ্যোজাত শিশুর চোখের আরওপি (রেটিনোপ্যাথি অব প্রিম্যাচুরিটি)-র প্রয়োজনে লেজার চিকিৎসা

দিনকয়েক আগের কথা। দিনহাটা থেকে ৬ মাসের পূজাকে (নাম পরিবর্তিত) নিয়ে শুকনো মুখে মা-বাবা এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের হাসপাতালের আউটডোরে। এই বয়সে তো অন্য শিশুরা চোখে চোখ রাখলেই সুন্দর ‘স্মাইল’ দেয়। হাতের কাছে ঝুনঝুনি নাড়লেই ধরতে চায়। তবে মেয়ে ধরতে চাইছে না কেন! মণির নড়াচড়াও কম! জন্মের সময় মেয়ের ওজনও ঠিকই ছিল, অর্থাৎ অপরিণত শিশুও নয়। পাড়ার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতেই সোজা আরআইও (Regional Institute of Ophthalmology বা RIO)-র সোমবার সকালের আউটডোরে পাঠিয়ে দেন তিনি। পরীক্ষা করে দেখা গেল, ওইটুকু দুধের শিশুর জন্মগত ছানি রয়েছে। এখনই অপারেশন না করলে ফুটফুটে পূজা হয়ত সারাজীবনের মত দৃষ্টিহীন হয়ে থাকবে।

বাকিটা ইতিহাস। অন্য যে কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই অপারেশন করতে খরচ অন্তত ৪০-৫০ হাজার টাকা। এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, ওষুধসহ পূজাকে নিয়ে কোচবিহারে ফিরে গেলেন মা-বাবা। সন্তানের দৃষ্টি ফিরিয়ে মায়ের চোখের জল মুছে দিল আরআইও, কলকাতা।

বনগাঁ থেকে সোজা চলে এসেছিলেন বছর পঞ্চাশের সরিৎ মিদ্দা (নাম পরিবর্তিত)। ডাব বিক্রি করে দিন গুজরান। সেদিন ভোরে উঠে ডাব পাড়তে গিয়ে বিপত্তি। সোজা চোখের ওপর একটা ডাব পড়ে চোখের মণি ফেটে গিয়ে সে কী কান্ড ! কলকাতার বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গেলেও তারা দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। চলে আসেন কলকাতায়, আরআইও-তে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, চোখের ভেতরে বেশ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্রথমে ধীরে ধীরে তাঁর কর্ণিয়া জোড়া হল। তারপর কিছুদিন পর্যবেক্ষণ। আবার দ্বিতীয় অপারেশন। বের করা হল রক্ত। সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা দৃষ্টি তো ফেরানো গেল।

এভাবেই দিনের পর দিন, অজস্র রোগীর চোখের নানা ধরনের জটির রোগের চিকিৎসা এবং অপারেশন হয়ে চলেছে রাজ্যের ‘স্টেট অব দ্য আর্ট’ এবং ‘সেন্টার অব এক্সেলেন্স’ হিসাবে স্বীকৃত রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজি বা আরআইও, কলকাতাতে। গ্লকোমা ক্লিনিক থেকে ভিট্রিও রেটিনাল পরিষেবা, শিশু বা সদ্যোজাতদের জন্য পেডিয়াট্রিক অপথ্যালমোলজি ক্লিনিক থেকে স্কুইন্ট (Squint) ক্লিনিক বা ট্যারা চোখের চিকিৎসা, বয়ঃজনিত (ARMD) বা ডায়াবেটিসের কারণে রেটিনার ক্ষতি থেকে ক্যাটার‍্যাক্ট (Cataract) বা ছানি

আরআইও-র অত্যাধুনিক অপারেশন কক্ষ

অপারেশন, চোখের ছেঁড়া পর্দার (Retinal Detachment) জটিল অপারেশন কিংবা দান করা চক্ষু থেকে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন সবটাই এখানে এক ছাদের নীচে—সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। যা বেসরকারি যে কোনও প্রতিষ্ঠানে করতে গেলে নানাভাবে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়। আর তাই আজ রেটিনার চিকিৎসা কিংবা ছানি অপারেশনের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের দিক থেকে পূর্ব ভারতের প্রথম প্রতিষ্ঠান রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজি, কলকাতার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার গর্ব।

বহু সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন—চোখের কী কী ধরনের চিকিৎসা হয় এখানে ? উত্তর, এক কথায়, সব চিকিৎসা হয়। রাজ্যে, চোখের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিনামূল্যে, এক ছাদের নীচে, চোখের সমস্ত ধরনের চিকিৎসা হয়। ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, পাশের বিহার-উত্তরপ্রদেশ-ঝাড়খন্ড থেকেও রোজ নিয়মিত বহু মানুষ আসেন দৃষ্টি ফেরানোর স্বপ্ন নিয়ে। বিশেষ করে, গত কয়েক বছরে, এ রাজ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রান্তিক মানুষের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছে—রাজ্যে চোখের চিকিৎসার একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এখন অবশ্যই আরআইও, কলকাতা।

এক ছাতার নীচে সব চিকিৎসা

আসা যাক, নানা ধরনের চোখের চিকিৎসা সম্পর্কে, যার জন্য আরআইও, কলকাতা আজ শুধু বাংলা নয়; পূর্ব ভারতের গর্ব।

(১) Vitreo-Retinal Services for Adults :

বলা যায়, এই ইউনিটটি আমাদের গর্ব। এই প্রতিষ্ঠানের রেযিনার চিকিৎসকরা এখানে রোজ রেটিনার নানা ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা করেন। লেদ মেশিন চালাতে গিয়ে লোহার টুকরো ঢুকে যাওয়া, নানা কারণে চোখের শিরা ফেটে স্ট্রোক হওয়া, বয়ঃজনিত পর্দার রোগ (ARMD), উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের কারণে আই বল-এর মধ্যে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ (Vitreous Haemorrhage), পর্দা ছিঁড়ে যাওয়া (Retinal Detachment) ইত্যাদি রোগের কিংবা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত চোখের সমস্ত চিকিৎসা এখানে হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রেটিনার জটিল অপারেশনের যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে, পার্স প্ল্যানা ভিট্রেক্টমি (Pars Plana Vitrectomy) আবিষ্কার হওয়ার পর। আর এই চিকিৎসাই এখানে হয় বিনামূল্যে এবং অবশ্যই উৎকর্ষতার সঙ্গে।

চোখে ও মুখে হারপিস জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত

(২) Retinopathy of Prematured Baby :

রাজ্যে চক্ষু চিকিৎসার মুকুটে নবতম সংযোজন। অপরিণত সদ্যোজাত শিশুদের ক্ষেত্রে পূর্ব ভারতে এই চিকিৎসা হয় হাতে গোণা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসেবে এটি পূর্ব ভারতের গৌরব।

আমাদের দেশে তো বটেই, রাজ্যেও বহু শিশুর জন্ম হয়, যাদের ওজন বেশ কম থাকে। অনেকে জন্মায় নির্ধারিত সময়ের আগে, অর্থাৎ ২৮-৩৫ সপ্তাহের মধ্যে। গোটা পৃথিবীতেই রয়েছে এই সমস্যা। এছাড়া বহু শিশুর ওজন ঠিক হলেও জন্মানোর পর কাচের ঘরে অক্সিজেন দিয়ে রাখতে হয়। অনেকের 'ব্লাড ট্রান্সফিউশন' করতে হয়। বেশ কিছু শিশুর জন্মের পরপরই জন্ডিস বা সেপ্টিসেমিয়া ধরা পড়ে। কিছু শিশুর 'ইন্টারনাল হ্যামারেজ' হয়ে যায়। এদের প্রত্যেকের চোখের প্রবল সমস্যা হয়, যা থেকে অন্ধত্ব বা দৃষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

দু'চোখে প্রবল আঘাত

এই ধরনের শিশুদের চোখের গঠন থাকে অপরিপূর্ণ—রেটিনাতে রক্ত চলাচল হয় না বা হলেও আংশিক হয়। ফলে দৃষ্টিহীনতা অনিবার্য। ঠিক সময়ে স্ক্রিনিং না করলে এবং প্রয়োজন মতো চিকিৎসা না করলে কিন্তু সারা জীবনের জন্য দৃষ্টিহীনতা নেমে আসে। বিদেশে এই ধরনের প্রতিটি শিশুর, জন্মের পরেই চোখের বিশেষ স্ক্রিনিং করা হয়। বর্তমানে এ রাজ্যে আরআইও-তে স্ক্রিনিং এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এখানে নিয়মিতভাবে আরওপি (Retinopathy of Prematurity) স্ক্রিনিং হয়। স্ক্রিনিং-এর পর রয়েছে চিকিৎসার ব্যবস্থা। নির্ধারিত সময়ের আগে যে শিশুর জন্ম হয়, তাদের দৃষ্টিদানের এই চিকিৎসা, পূর্ব ভারতে শুধু একমাত্র আরআইও-তেই হয়। এজন্য এখানে এলআইও (Laser Indirect Ophthalmoscopy) এবং চোখে ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই শিশুদের চোখের প্রায় সমস্ত ধরনের চিকিৎসা সরকারি তো বটেই, বেসরকারি স্তরেও বহু প্রতিষ্ঠানে এত গভীরে গিয়ে হয় না।

শিশুর চোখে ছানি

ব্যবস্থা রয়েছে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণেরও। সরকারি হাসপাতালে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের ট্রেনিং এর একমাত্র ব্যবস্থা রয়েছে আরআইও-তে। উদ্দেশ্য, রাজ্যের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি প্রান্তিক শিশু, যারা এই ধরনের সমস্যা নিয়ে জন্মেছে, তারা যেন দৃষ্টিহীন না হয়। ক্রমে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে ব্লক স্তরেও চক্ষু-চিকিৎসকরা যাতে শিশুদের এই বিশেষ চিকিৎসা করতে পারেন, সেজন্য আরআইও-তে এই ট্রেনিং দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ছানি বা গ্লকোমার চিকিৎসার বিশেষ ট্রেনিং এখানে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এনপিসিবি (NPCB-National Programme for Control of Blindness)—প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্র-রাজ্য স্বীকৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকরাও এখানে আসেন ট্রেনিং নিতে।

(৩) Cataract Surgery :

বাংলায় যাকে, আমরা বলি ছানি অপারেশন। অত্যাধুনিক ফেকো মেশিনের সাহায্যে এখানে রোজ হয়ে চলেছে ছানি অপারেশন। পরিসংখ্যান প্রতিবছরই বাড়ছে। রয়েছে অত্যাধুনিক ফেকো মেশিন। ছানির ক্ষেত্রে লেন্স (foldable IOL) বসাতে যেখানে ন্যূনতম ৭-১০ হাজার টাকা খরচ হয়, সেখানে বিনামূল্যে বহু মানুষ এখানে ছানি অপারেশন করিয়ে দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছেন।

(৪) Cornea Surgery :

পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ কর্ণিয়ার রোগের কারণে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ছেন। এখানে কর্ণিয়া ক্লিনিকে বহু মানুষ আসেন, যাঁদের অনেকের জীবাণুঘটিত কারণে কর্ণিয়ার ক্ষত বা আলসার হয়। অ্যাসিড বা রাসায়নিকে চোখের মণি নষ্ট হয়ে যায়। অনেকের মণির মধ্যে সাদা দাগ দেখা যায়। ওষুধ দিয়ে দিয়ে অপারেশন করে কিংবা চক্ষু প্রতিস্থাপন করে দৃষ্টি ফেরানোর চিকিৎসা করা হয়।

(৫) Anti-VEGF Treatment :

বয়সজনিত কারণে, ডায়াবেটিস থাকলে, চোখে স্ট্রোক হয়ে শিরা-উপশিরা ফেটে গেলে, রেটিনাতে রক্ত জমা হলে নানা কারণে রেটিনার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ম্যাকুলা ফুলে ওঠে। একে (Macular edema) বলে। এর একমাত্র ওষুধ Anti-VEGF (Anti Vascular Endothelial Growth Factor), যা রানিবিজুমাব (Ranibizumab) নামে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রতিকার করা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, চোখের ইনজেকশনের খরচ, অন্তত ২২-২৫ হাজার টাকা। এই প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে চোখের ইনজেকশনের ব্যবস্থা আছে।

(৬) Paediatric Ophthalmological Services :

জন্মের পর কিংবা শৈশবে আজকাল বাচ্চাদের মধ্যে নানা ধরণের চোখের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অনেকের জন্মগত ছানি বা জন্মগত গ্লকোমা ধরা পড়ছে। বহু শিশু ট্যারা চোখ নিয়ে জন্মাচ্ছে। ২০০৫ সালে এই পেডিয়াট্রিক আই ক্লিনিক চালু হলেও গত কয়েক বছরে ব্যাপক উন্নত হয়েছে। এসেছে নানা ধরণের যন্ত্রপাতি।

(ক) স্কুইন্ট অর্থাৎ ট্যারা রোগের চিকিৎসা নিরাময় ক্লিনিকে ওই শিশু কতটা ট্যারা, পরীক্ষা করে তার অপরেশন করে চোখ ঠিক করে দেওয়া হয়।
(খ) জন্মগত ছানি ধরা পড়লে অপারেশন করা হয়।
(গ) জন্মগত গ্লকোমা অর্থাৎ অন্ধত্ব ধরা পড়লে অপারেশন করা হয়।
(ঘ) জন্মগত রেটিনা সমস্যা ধরা পড়লেও এখানে অপারেশনের ব্যবস্থা আছে।

(৭) Eye Bank Services :

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম চালু হওয়া আই ব্যাংক এখন রাজ্যের অন্য সমস্ত চক্ষু হাসপাতালকে পথ দেখাচ্ছে। কারও মৃত্যুর পরই শুধুমাত্র চোখ সংগ্রহ করে কর্ণিয়া এবং সাদা পর্দা অংশ সংগ্রহ করে রাখা হয়। রয়েছে ২৪ ঘণ্টার হেল্প লাইন নম্বর, সেখানে ফোন করে মৃতের বাড়ির লোকজন চক্ষুদান করতে পারেন। আর অন্যান্য অঙ্গের থেকে চোখের কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও কর্ণিয়া সংগ্রহ বা প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। কর্ণিয়া সংগ্রহ বা প্রতিস্থাপনে অর্থের লেনদেন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। আর এই সমস্ত কিছুতেই আরআইও-র আই ব্যাংক রাজ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ। আর একটা কথা বলে রাখা ভাল। আরআইও-তে শুধু কর্ণিয়া সংগ্রহ হয়, তা নয়। রাজ্যের বেশ কিছু হাসপাতালে এখান থেকে কর্ণিয়া সরবরাহও করা হয়।

(৮) Glaucoma Clinic :

টোনোমেট্রি (Tonometry) পদ্ধতিতে চোখের চাপ মেপে বোঝা যায়, কোনও রোগী গ্লকোমাতে আক্রান্ত কিনা। কারণ, মূলত চোখের চাপ বেশি হলে গ্লকোমার সম্ভাবনা বাড়ে। এই চাপকে বলা হয় ইনট্রা-অকুলার প্রেসার (IOP)।

পুড়ে যাওয়া চোখ

চোখে টিউমার

চোখে বড়শি ঢুকে গিয়ে

চোখে ছানি

আরআইও-তে রয়েছে আলাদা গ্লকোমা ক্লিনিক, যেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়, লেজার করে চোখের চাপ কমানো হয় এবং প্রয়োজনে ট্রাবেকুলেকটমি (Trabeculectomy) পদ্ধতিতে অপারেশন করে শিশু ও বড়দের দৃষ্টি ফেরানো হয়।

(৯) Neuro Ophthalmology :

অনেকেই জানেন না, স্নায়ুরোগের কারণেও চোখের সমস্যা দেখা দেয়। অপটিক নিউরাইটিস (Optic Neuritis), প্যাপিলো এডেমা (Papillo Edema), রেটিনাইটিস পিগমেনটোসা (Retinitis Pigmentosa) ইত্যাদি রোগ হয়। অনেক সময় এই চিকিৎসার জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্নায়ু বিভাগের সাহায্য নেওয়া হয়। আরআইও-তে রয়েছে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি (VEP,ERG), যার সাহায্যে অপটিক নার্ভ, মস্তিষ্ক ও রেটিনার বিশেষ পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়।

(১০) Refraction, LASIK Surgery :

বহু ছাত্রছাত্রীকে বাবা-মা এখানে নিয়ে আসেন, চোখ দেখাতে। একটাই মূল বক্তব্য, ক্লাসে বোর্ডের লেখা দেখতে পাচ্ছে না ছেলেমেয়ে। কিংবা খুব ঝুঁকে বইটা একেবারে চোখের সামনে এনে পড়তে হচ্ছে। বয়স্কদের ৫০-এর পরে কাছের কিছু জিনিস পড়তে না পারা অতি সাধারণ সমস্যা। আবার, ছানি অপারেশনের পর কী পাওয়ারের চশমা লাগবে, সেটাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে, চশমা ছাড়া জীবনযাপন যদি করা যায়। একে বলা হয় LASIK Surgery; বেসরকারি যেকোনও প্রতিষ্ঠানে এর খরচ ৪০-৮০ হাজার টাকা। এই হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই অপারেশন হয় এবং তারপর আর চশমা লাগে না।

(১১) Oculoplasty :

অনেক সময় চক্ষু কোটর (Orbit)-এ টিউমার ধরা পরে। চোখের পাতা ঝুলে যায়। একে বলে টোসিস (Ptosis)। নানা দুর্ঘটনায় হয়তো কারও একটা চোখই নষ্ট হয়ে গেল। আবার অনেকের চোখে কসমেটিক সার্জারির দরকার হয়। তাছাড়া চোখের টিউমার, চোখের আশপাশের হাড় বৃদ্ধি, চোখের কোনা লাল হয়ে ফুলে ওঠা, চোখের বলের ক্ষতি ইত্যাদির চিকিৎসা হয়। চোখের টিউমার অপারেশন অর্থাৎ অরবিটোটমি (Orbitotomy), নষ্ট হওয়া চোখ সরিয়ে পাথরের চোখ বসানো (অকুলার প্রসথেসিস, Ocular Prosthesis) এখানে হয় বিনামূল্যে।

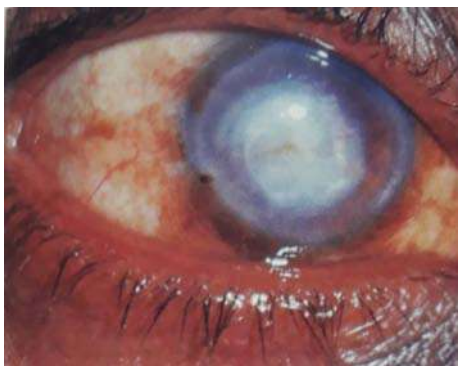

কর্ণিয়ায় অসচ্ছতা

চোখে টিউমারজনিত ক্যানসার। আরআইও-তে হয়েছে অস্ত্রোপচার।

অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, অপারেশন কক্ষ

'স্টেট অব দ্য আর্ট' এই স্বাস্থ্য-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নানা ধরণের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, যা আর কোনও সরকারি হাসপাতালে, এ রাজ্যে পাওয়া যাবে না। অন্য রাজ্যেও বিরল। রয়েছে জার্মানির ল্যুমেরা মাইক্রোস্কোপ, কনস্টিলেশন ভিট্রেকটমি মেশিন, বিদেশি এন্ডোলেজার, চোখের ভেতর থেকে লোহার টুকরো তোলার জন্য গোল্ড প্লেটেড ম্যাগনেট, যন্ত্র জীবাণুমুক্ত করার প্লাজমা স্টেরিলাইজার, বিদেশি হামফ্রে কোম্পানির ভিস্যুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইজার, রেটিনাল নার্ভ ফাইবার লেয়ার থিকনেস অ্যানালাইজার, বিদেশি নামি কোম্পানির হাইডেলবার্গ কোম্পানির অপটিক্যাল কোহারেন্স টোমোগ্রাফি (OCT) মেশিন, চোখের অ্যাঞ্জিওগ্রামের জন্য ফান্ডাস ফ্লুরেসিন ও ইন্ডোসায়ানিন গ্রীন মেশিন, ফেকো মেশিন, ইলেকট্রোরেটিনোগ্রাম এবং ভিস্যুয়াল ইভোকড্ পোটেনশিয়াল মেশিন ইত্যাদি নানা যন্ত্রপাতি, যা সত্যিই রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের গর্ব।

অনন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান

এত জটিল ধরণের রোগী এখানে আসেন, যা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে ঈর্ষার বিষয়। আর এটাই আমাদের গর্ব। রুটিন সমস্ত ধরনের রোগ নিরাময় ছাড়াও এটি একটি অনন্য শিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতকস্তরে এমবিবিএস-এর ক্লাসের পাশাপাশি ২ বছরের অপট্রোমেট্রির ডিপ্লোমা এবং স্নাতকোত্তর স্তরে অপথ্যালমোলজিতে মাস্টার অফ সার্জারি (MS) ও অপথ্যালমোলজিতে ডিপ্লোমা (DO) পড়ানো হয়। এখানে চোখের বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ, প্রতিকার-সহ নতুন ওষুধের প্রতিক্রিয়া বিষয়েও গবেষণা করা হয়। আই ব্যাঙ্কে যেসব চোখ জমা হয়, তার সবটাই কাজে লাগে না। বরং সেই চোখ গবেষণা ও চক্ষু-শল্য চিকিৎসা শেখানোর কাজে হাতেকলমে শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ফান্ডাস ফটোগ্রাফি মেশিন

কনস্টেলেশন ভিট্রেক্টমি মেশিন

ওসিটি মেশিন

ইন্ডোসায়ানিন গ্রীন

ভিইপি মেশিন

ভিশুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইজার

ল্যুমেরা মাইক্রোস্কোপ

প্রয়োজন সচেতনতা, দরকার আরও পরিকাঠামো

সন্তানের চোখ ভাল রাখতে গেলে একদিকে যেমন বাবা-মার একটু বেশিই সচেতনতা দরকার। তেমনি মধ্যবয়স্ক বা বয়স্কদেরও নিজের চোখের বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে। দুর্ঘটনা আলাদা কথা। সেজন্য অবশ্যই আরআইও রয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব ভারতের গর্বের এই সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আরও একটু পরিকাঠামো হলে অনেক বেশি পরিষেবা প্রদান সম্ভব।

শিশুর জন্মের ৩-৪ মাসের মধ্যে সে বাবা-মার চোখে চোখ রাখছে কিনা, আলোর নড়াচড়ায় চোখ নড়ছে কিনা, চোখ দিয়ে জল পড়ছে বা পিচুটি কাটছে কিনা, আস্তে আস্তে চোখ ট্যারা হয়ে যাচ্ছে কিনা, চোখের কালো মণির ওপর সাদা দাগ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বাবা-মাকেই সতর্ক হতে হবে। আজকাল বাচ্চাদের হাতে মোবাইল দেওয়া একটা চল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সামনে বসে বাচ্চাদের নিয়ে টিভি দেখা। দুটোতেই মারাত্মক ক্ষতি করে শিশুদের। একদৃষ্টিতে টিভি বা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। কম বয়সেই চশমা শিশুদের আজ প্রায়শই দেখা যাচ্ছে, যার অন্যতম কারণ এটি। একটু বড় হলে বাবা-মাকেই নজর রাখতে হবে, তার সন্তান বোর্ডের লেখা দেখতে পাচ্ছে কিনা, একেবারে উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে বই দেখছে কিনা, বমিবমি-ভাব বা মাথা ব্যথা বলছে কিনা। বরং, এইসব মোবাইল এবং টিভি থেকে শত হাত দূরে সরিয়ে নিজের সন্তানকে প্রকৃতি দেখতে শেখাতে হবে। বাইরে বের করতে হবে। ঘরে বুঁদ হয়ে বসে মোবাইল বা টিভি দেখা দ্রুত চোখের ক্ষতি করে দেবে। দিচ্ছেও। সন্তানকে সবুজ প্রকৃতির কাছে নিয়ে যেতে হবে। ঘরে বসে মোবাইল বা ভিডিও গেম নয়, আউটডোর গেম-এ আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। তাহলে চোখ নিজের থেকেই ভাল থাকবে। প্রকৃতির সঙ্গে না মিশলে, সবুজের কাছে না গেলে যে শিশুর শরীরিক ও মানসিক বিকাশ হবে না। শুধু দীপাবলি বা দোল উৎসবে নানা ধরনের বাজি বা রঙের কারণে কত বাচ্চার চোখের ক্ষতি হচ্ছে! আলো আর রঙের উৎসব বাচ্চাদের চোখে নিয়ে আসছে অন্ধকার। বাবা-মায়েরা কী শেখাচ্ছেন সন্তানদের! এর জন্য শিক্ষা নয়, সচেতনতা দরকার।

আরআইও-তে প্রয়োজন বেশ কিছু টেকনিশিয়ান, সুদক্ষ নার্স এবং আরও অপট্রোমেট্রিস্ট। দরকার আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি। যে হারে গত কয়েক বছরে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় মানুষের বিশ্বাস বেড়েছে, তাতে প্রবল চাপে হিমসিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা। আরও ফেকো মেশিন, ভিট্রেক্টমি মেশিন দরকার। তাহলে অপারেশনের তারিখ আরও দ্রুত পাবেন সাধারন মানুষ। অপারেশন কক্ষটি 'মডিউলার' (Modular OT) হলে আরও আধুনিক হবে।

বাংলার স্টেট অব দ্য আর্ট, আরআইও, কলকাতা সত্যিই আজ এ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার গর্ব, দেশের সম্পদ।

চিকিৎসক নিজে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজি, মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, কলকাতা-র অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর।
তথ্যসংগ্রহ এবং সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুলিখন: রাতুল দত্ত, সহ সম্পাদক, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।
চিত্র সৌজন্য- চিকিৎসক নিজে এবং সৌরভ দত্ত।

সরকারি ডেন্টাল কলেজে উন্নত পরিষেবা

ভারতীয় দন্ত চিকিৎসার প্রাণপুরুষ ডাঃ রফিউদ্দিন আহমেদ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে আধুনিক দন্ত চিকিৎসার সূচনা করেছিলেন। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের পর দন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে, যার প্রধান স্থপতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল পশ্চিমবঙ্গে দন্ত চিকিৎসায় সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শর্তবার্ষিকীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রতিষ্ঠান আবার তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেছে। এ বছরও একটি সমীক্ষায় ভারতের ৩০৬টি ডেন্টাল কলেজের মধ্যে এই কলেজ দশম স্থান অর্জন করেছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, ঝাঁ-চকচকে বিল্ডিং, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন বিভাগ যে কোনো প্রথম সারির বেসরকারি হাসপাতালের সমতুল্য। এর পাশাপাশি সম্প্রতি নির্মিত অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত বিশ্বমানের জি+৭ ছাত্র ও ছাত্রী আবাস এই প্রতিষ্ঠানের মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় নজির সৃষ্টি করে সম্প্রতি পিপিপি মডেলে সিবিসিটি (কোন বিম কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি) চালু হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে। রোগীদের সুবিধার্থে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ও পিপিপি মডেলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রক্ত ও অন্যান্য প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সমস্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসা যেমন ইমপ্ল্যান্ট, ক্রাউন-ব্রিজ-সহ অন্যান্য সব কিছুই রোগীদের বিনা পয়সায় প্রদান করা হচ্ছে। রোগী ও হাসপাতালের সুরক্ষার্থে গোটা হাসপাতাল নজরদারি

ডাঃ আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, কলকাতা

উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ

ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে ২০১৪ সালে। স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠনের সুবিধার্থে বিপুল পরিমাণ পাঠ্যবই ও জার্নাল কেনা হয়েছে যা কলেজ লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করেছে। অদূরভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠান ভারতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে, এই আশা আজ আমরা করতেই পারি।

পাশাপাশি পিছিয়ে নেই অন্য দুটি সরকারি ডেন্টাল কলেজও। উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ ও বর্ধমান ডেন্টাল কলেজও চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজে অত্যাধুনিক নতুন বিল্ডিং তৈরি করা থেকে শুরু করে, কম্পিউটারচালিত টিকিট কাউন্টার, বাচ্চাদের এক্স-রে ও অন্যান্য সবকিছুই প্রায় এই সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল। বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ বয়সে নবীন হলেও স্বল্প সময়ে দন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

বর্ধমান ডেন্টাল কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে। বর্তমানে এই কলেজে প্রত্যেক বছর ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এই কলেজে বহির্বিভাগে প্রত্যেক দিন আনুমানিক ৫০০ রোগী হয়। বর্তমানে কলেজে সফলভাবে ই-প্রেসক্রিপশন চালু হয়েছে। যার জন্য ভবিষ্যতে এপিডেমিওলজিক্যাল সার্ভে সফলভাবে করা যাবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক-শিক্ষিকা বর্তমানে বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে আছেন এবং তাঁদের প্রচুর ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনও আছে। সমস্ত দিক থেকে বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে সফলভাবে এন্টিটোব্যাকো/তামাক প্রতিরোধী প্রচেষ্টা চলছে এবং সে ব্যাপারে বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ সফলতা লাভ করেছে। বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে অত্যাধুনিক পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ওষুধও বিনামূল্যে রোগীদের দেওয়া হয়। নতুন ভবন মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে এমডিএস কোর্স চালু করার পরিকল্পনা আছে। এভাবেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় রাজ্যের দন্ত চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

লেখাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' আগস্ট, ২০১৮ থেকে পুনর্মুদ্রিত

বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ

ফিরে দেখা

ব্রেন ডেথ ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে এই রাজ্য কয়েক বছরে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে। ব্রেন ডেথ-এর ফলে অঙ্গদান-এর মানসিকতা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। অত্যন্ত অল্পসময়ে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে যথাযথ স্থানে অঙ্গ পৌঁছে দেওয়া এবং প্রতিস্থাপন করার কৃতিত্ব একের পর এক অর্জন করে চলছে রাজ্য। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ সংখ্যায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় 'ব্রেনডেথ ও অঙ্গদান' বিষয়ক। এই ক্রোড়পত্রের, তিনটি নিবন্ধ সম্পাদিতভাবে পুনঃপ্রকাশিত হল।

—সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ

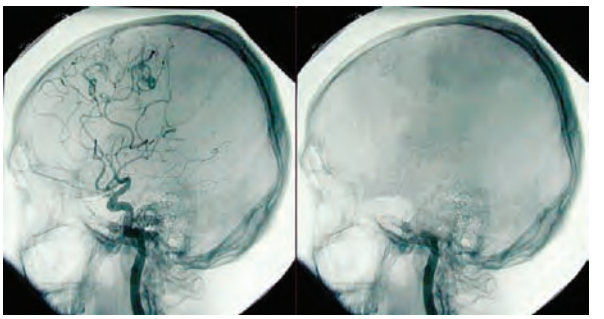

ব্রেন ডেথ ও অঙ্গদান:
জীবন-মৃত্যুর মেলবন্ধন

মৃত্যুতে জীবনের যোগ

ভারতীয় দর্শনের কোনও কোনও মতবাদ অনুযায়ী মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। এই জীর্ণ শরীর পুরোনো বস্ত্রের মতো ত্যাগ করে 'আত্মা' অন্য লোকে যাত্রা করে।

এই দর্শন পরাধীন ভারতের বিপ্লবীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সে-কথা আমাদের জানা। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁরা দেশমাতৃকার পরাধীনতা মোচনে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে চলে যেতেন।

স্বাধীনতা-আন্দোলনে এইভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখনকার বাংলা। দেহ-চেতনার অনেক ঊর্ধ্বে ছিল তাঁদের আন্দোলনের আদর্শ। দেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁদের এই দেহগত 'প্রাণসর্বস্ব' জীবনের থেকে অনেক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল।

শরীরই আমাদের মন্দির। ভারতীয় দর্শনের এটাই প্রথম ও শেষ কথা। দেহ থেকেই দেহাতীতের পারে আমাদের যাত্রা। ভারত তথা বাংলার অধ্যাত্ম-মানসে তাই দেহাতীত জীবনসাধনার গুরুত্ব অপরিসীম।

এই জগতে প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রহস্যই আমাদের প্রতিদিন বিস্মিত করে রাখে। আমরা 'কোথা হইতে আসি' ও 'কোথায় যাই' এই প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজার পালা চলতেই থাকে। আর তারই মধ্যে কত না হানাহানি, রক্তপাত, যুদ্ধ, দলাদলি—কত না লোভের হাতছানি। মুহূর্তে ভেঙে যায় ন্যায়-অন্যায়ের বেড়া। চাগাড় দিয়ে ওঠে প্রতিহিংসা। অর্থহীন প্রতিযোগিতা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কিন্তু যখন 'শরীর' সায় দেয় না, মৃত্যুর ছায়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠি; তখন জীবনের অনুভূতি অন্য খাতে বয়। 'মৃত্যু' আমাদের 'জীবন'-কে অন্য পাঠ দেয়। যদিও সেই পাঠজাত শিক্ষাও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারি না আমরা।

সেজন্য আমরা 'মৃত্যু'কে দূরে রাখতে চাই। সেটা আমাদের মনের সহজ ধারা। একান্ত অভ্যস্ত ভাবনা। কিন্তু 'মৃত্যু' আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করে। সে মশার মতো কামড়ায় না, মাছির মতো ভন-ভন করে না, সাপের মতো ফোঁসফোঁস করে না। তাই তার অস্তিত্ব আমরা টের পাই না সবসময়।

তাকে দেখা যায় জ্ঞানচক্ষে। তাকে অনুভব করা যায় জ্ঞান-মানসের মাধ্যমে। কিন্তু তার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। মরতে হবেই। সব ক্ষেত্রে এই মৃত্যুতেই জীবন–এর সমাপ্তি যেন ঘোষিত হয় না। এক জীবন শেষ হয়। আর এক জীবনের মধ্যে শুরু হয় পথচলা।

বিজ্ঞানের উন্নতি ও আনন্দময় জীবন

বিজ্ঞানের একের পর এক আবিষ্কার মানুষের আয়ুরেখাকে দীর্ঘায়িত করেছে। শুধু ভালো ওষুধ, পরীক্ষার উন্নততর সুযোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সেবা পাওয়ার পরিকাঠামোর উন্নতি ও প্রসার, শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসার আধুনিক যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত মনের বিকাশ, অন্যান্য আরও কারণ এই কাজকে সহজ করে তুলছে। আধুনিক বিজ্ঞান জীবন-যাপনকে করে তুলেছে আরামদায়ক, উপভোগ্য। জীবনের সুন্দরতর দিকগুলো সর্বস্তরের মানুষের কাছেই ধরা পড়ছে কম-বেশি। ফলে মানুষের বাঁচার ইচ্ছে প্রবল হচ্ছে। এই পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা যতই থাকুক না কেন এই মায়ার সংসার ছেড়ে কেউ যেতে চান না। জীবনের মধ্য দিয়েই আনন্দময় অস্তিত্বের অনুভব সম্ভব। এই সুন্দর জীবন ও জগতের অপার রহস্য আমাদের জীবনাকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সে জীবন সুস্থ জীবন। শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক—সব অর্থেই সুস্থ ও কর্মক্ষম ভারসাম্যমূলক কর্মময় জীবনই সুস্থ জীবন।

জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানের সময়কে আমরা বলি 'আয়ু'। এই আয়ুকে একটু বাড়াতে পারি মাত্র। সুস্থ শরীর-মনের দরকার এর জন্য। শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য নয়, মানসিক স্বাস্থ্যও আজ জীবনের অপরিহার্য শর্ত।

সুস্থ ও ভারসাম্যমূলক জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে আমরা সুস্থ জীবনের চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু শারীরিক নানা অসুবিধা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের আয়ত্তে থাকে না সবসময়। নানা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কত মানুষ

জন্মগ্রহণ করে। কত মানুষের এরকম নানা প্রতিবন্ধকতা জীবনের শুরুতে নয়, মধ্যপর্বে ধরা পড়ে। কত সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কেউ আবার কোনও বড়ো অসুখ বা দুর্ঘটনার কারণে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁদের সুস্থ থাকা তখন নির্ভর করে অন্যের উপর; অর্থের উপর।

পারস্পরিক নির্ভরতা

কত মানুষ প্রতিনিয়ত বেঁচে ওঠেন, বেঁচে থাকেন অন্যের রক্ত নিয়ে। এ কথা আমরা সকলেই জানি, এক ফোঁটা রক্তও কত অমূল্য। তাই দিকে দিকে দেখি 'রক্তদান' আজ 'উৎসব'-এর মর্যাদা পাচ্ছে। তবুও সঠিক সময়ে সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে ঝরে গেছে কত অমূল্য জীবন। যতদিন যাচ্ছে, রক্তদানের সচেতনতার প্রসারের ফলে বেঁচে যাচ্ছে অজস্র জীবন। প্রতিহত হচ্ছে কত মারণব্যাধির আক্রমণের তীব্রতা।

'চক্ষুদান'-ও আজ সাফল্য পাচ্ছে। চক্ষুদানের মধ্যে দিয়ে কত দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দৃষ্টি পাচ্ছেন। যে পৃথিবীতে নেই তাঁর চোখ দিয়ে জগতকে দেখছেন আর একজন। রক্তদানের মতোই মহৎ দান চক্ষুদান।

বেঁচে থেকেও আমরা আমাদের প্রিয়জনের জন্য অনেক কিছুই দান করি। যেমন—কিডনি। আমাদের দুটো কিডনি। একটা কিডনি দান করে অনেকেই মা, বাবা, ভাই, বোনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নিজেও বেঁচে আছেন এমন ঘটনা আমাদের চারপাশে অনেক দেখি। কিন্তু যাঁদের পরিবারের মধ্যে এই সুযোগ নেই, বাইরে থেকে তাঁদের 'কিডনি' সংগ্রহ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়াস সফল হয় না। প্রয়োজনীয় criteria-গুলো সবসময় মেলে না।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যাঁদের 'ব্রেন ডেথ' হয়েছে তাঁদের থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায় যেমন লিভার, প্যাংক্রিয়াস, বোন ম্যারো, স্কিন আরও অনেক কিছুই প্রতিস্থাপন করা যায় অন্য দেহে।

এই 'ব্রেন ডেথ' বা 'মস্তিষ্ক মৃত্যু' বিষয়টি অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। নানা কারণে 'ব্রেন ডেথ' হয়ে থাকে। 'ব্রেন ডেথ' হলেও শরীরের অনেক অঙ্গ, কলা, অন্য মানুষের কাজে লাগে। নতুন জীবন ফিরে পেতে পারেন তাঁরা। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে কত মানুষ।

নাড়ি টিপে মৃত্যু ঘোষণার দিন ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। উন্নত চিকিৎসা-ব্যবস্থার যত প্রসার ঘটছে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে ততই উন্নত চিকিৎসা-প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। শরীরের নানা অঙ্গের সক্রিয়তা হ্রাস পেলেও জীবনদায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা, চিকিৎসা করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে বেশিদিন। আইসিইউ (ICU), আইসিসিইউ (ICCU), ভেন্টিলেশন (Ventilation) এসব এখন জলভাত। এগুলির সঠিক প্রয়োগে আমরা মৃত্যুর সঙ্গেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

ব্রেন ডেথ ও অঙ্গদান : জীবন-মৃত্যুর মেলবন্ধন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ, কিছু

সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং কলকাতা পুলিশের সম্মিলিত উদ্যোগে 'ব্রেন ডেথ' ঘোষণার খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেইসব ব্যক্তিদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অন্য মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে কিডনি ও লিভার প্রতিস্থাপনের কাজ করা সম্ভব হয়েছে। কলকাতার IPGMER অর্থাৎ এসএসকেএম হাসপাতালে ও অন্য কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে শুধু এ রাজ্যেই নয়, অন্য রাজ্যের রোগীকেও এই পরিষেবার আওতায় আনা গিয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের কলকাতা পুলিশ ও সড়ক পরিবহণ পরিকাঠামোর উন্নয়নও ঘটেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচার। প্রসারিত হয়েছে শুভ চেতনার। তার ফলেই সম্ভব হয়েছে অনেকের স্বপ্নপূরণ।

কলকাতা পুলিশের 'নজরদারি' ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে বেশ কয়েকবছর ধরেই। ঘরে বসেই কলকাতা পুলিশ-এলাকার সমস্ত পথ-ঘাটের যানবাহন চলাচল নজর করা যাচ্ছে। ওই ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল অতিরিক্ত ওসি (ট্রাফিক কনট্রোল) অঞ্জন সাবুই-এর সঙ্গে। ২০১৬-এর ২৫ ডিসেম্বর ও ৩ নভেম্বর এই ঘরে বসেই অঙ্গদান সংক্রান্ত 'গ্রিন করিডর' কনট্রোলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি সেই দিনগুলোর কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এই উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে স্বর্গীয়। এমন কাজের সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছে এবং তিনি সফলভাবে করতে পেরেছেন—এটাই তাঁর জীবনের অনেক বড়ো কথা। শুধু তাঁর একার কথা নয়, এইভাবে একটি 'বড়ো টিম-ওয়ার্ক'-এর ফলে 'ব্রেন ডেথ' ঘোষণার পর এই কলকাতা শহরে একের পর এক 'অঙ্গদান ও গ্রহণ'-এর মাধ্যমে অনেকেই নতুন জীবন পাচ্ছেন। সেই 'টিম ওয়ার্ক'-এর নিগূঢ় বন্ধন টের পেলাম এই ক্রোড়পত্র তৈরি করতে গিয়ে। আইপিজিএমইআর-এর ডিরেক্টর মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা তথা এ রাজ্যের অঙ্গদান সংক্রান্ত বিষয়ের নোডাল অফিসার-চিকিৎসক অদিতিকিশোর সরকার, কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক ভি সলোমন নেসাকুমার—এঁদের সঙ্গে মহাকরণের সম্পাদকীয় শাখা থেকে দু-একটা ফোনে যোগাযোগ করতেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই সরকারি সম্পাদকীয় শাখাও 'টিম-ওয়ার্ক'-এ জড়িয়ে পড়ল। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে গেলাম এই ব্যস্ত মানুষদের কাছে। সকলের কণ্ঠস্বরেই ছিল—তাঁদের এই কাজের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করার আহ্বান। আরও বেশি মানুষকে এই কাজে যুক্ত করে ফেলার উদ্যমের ছোঁয়া। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আদান-প্রদান তো আছেই। আছে এই কাজের 'মহত্বের গভীরতা' উপলব্ধি করার পাশাপাশি এর প্রকাশমুখিতার বিস্ময়কর উত্তাপ। কাজ তো কাজই। সরকারি কর্মসংস্কৃতির গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হয়তো এভাবেই সম্ভব। সার্বিক পরিকাঠামোর উন্নয়নই রাজ্যের বর্তমান স্বপ্ন। সমন্বয়ের এই সাফল্য-ই ধীরে ধীরে স্বপ্নকে বাস্তবে অনুবাদ করবে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মা-মাটি-মানুষের সরকার যে উন্নতি ঘটিয়েছে তার সুফল সকলেই পাচ্ছেন। যেমন

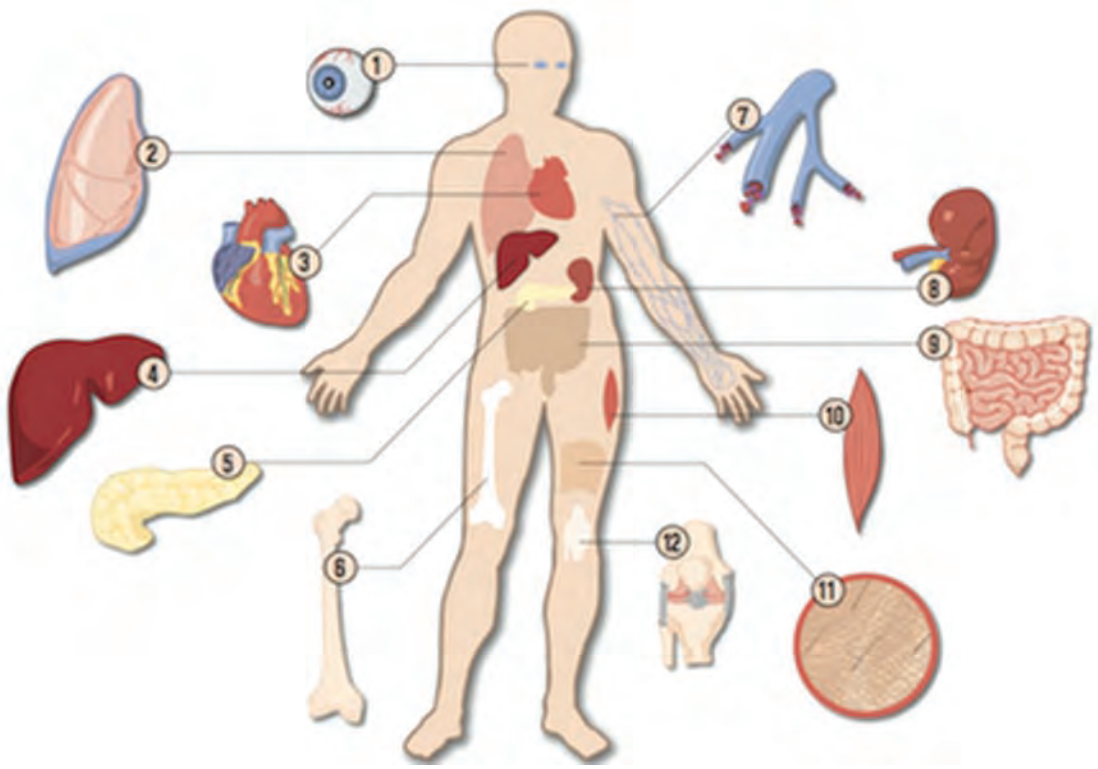

ন্যায্যমূল্যে ওষুধ, বিনা খরচে সরকারি হাসপাতালে ব্যয়সাধ্য অপারেশনের সুযোগ। বিনাব্যয়ে চিকিৎসা-পরিষেবা পাচ্ছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কমপক্ষে ৪৫ লক্ষ পরিবারের সদস্যদের 'স্বাস্থ্যবীমা'র সুযোগও দিচ্ছে সরকার। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন তাই অপরিহার্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। তারই পাশাপাশি 'ব্রেন ডেথ ও অঙ্গদান'-এর জন্য 'গ্রিন করিডর'-এর ব্যবস্থা করা। স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগগুলিকে যুক্ত করার উদ্যোগ সরকারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতার ইঙ্গিত বহন করে।

স্বাস্থ্যভবনে বসেই অদিতিকিশোর সরকার, যিনি এই কাজের মূল উদ্যোক্তা, জানালেন যে রাজ্যের হাসপাতালগুলির চিকিৎসকদেরও এ ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করার কাজ চলছে। তিনি আরও বললেন যে 'লাল ফিতের বন্ধন' থেকে এই মহান কর্মযজ্ঞকে তিনি মুক্ত রাখতে চান। সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসা-পরিষেবার পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় গ্রিন করিডরের মাধ্যমে তিনি আরও অনেক মানুষকে নতুন জীবন দিতে চান। ২৪ ঘণ্টার যে কোনও সময় তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা যায়।

একই সুর শোনা গেল কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক—ভি সলোমন নেসাকুমার-এর কণ্ঠে।

কলকাতা পুলিশের আয়ত্তাধীন অঞ্চলের মধ্যে বর্তমানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে যত দ্রুত সম্ভব আহত বা মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থার

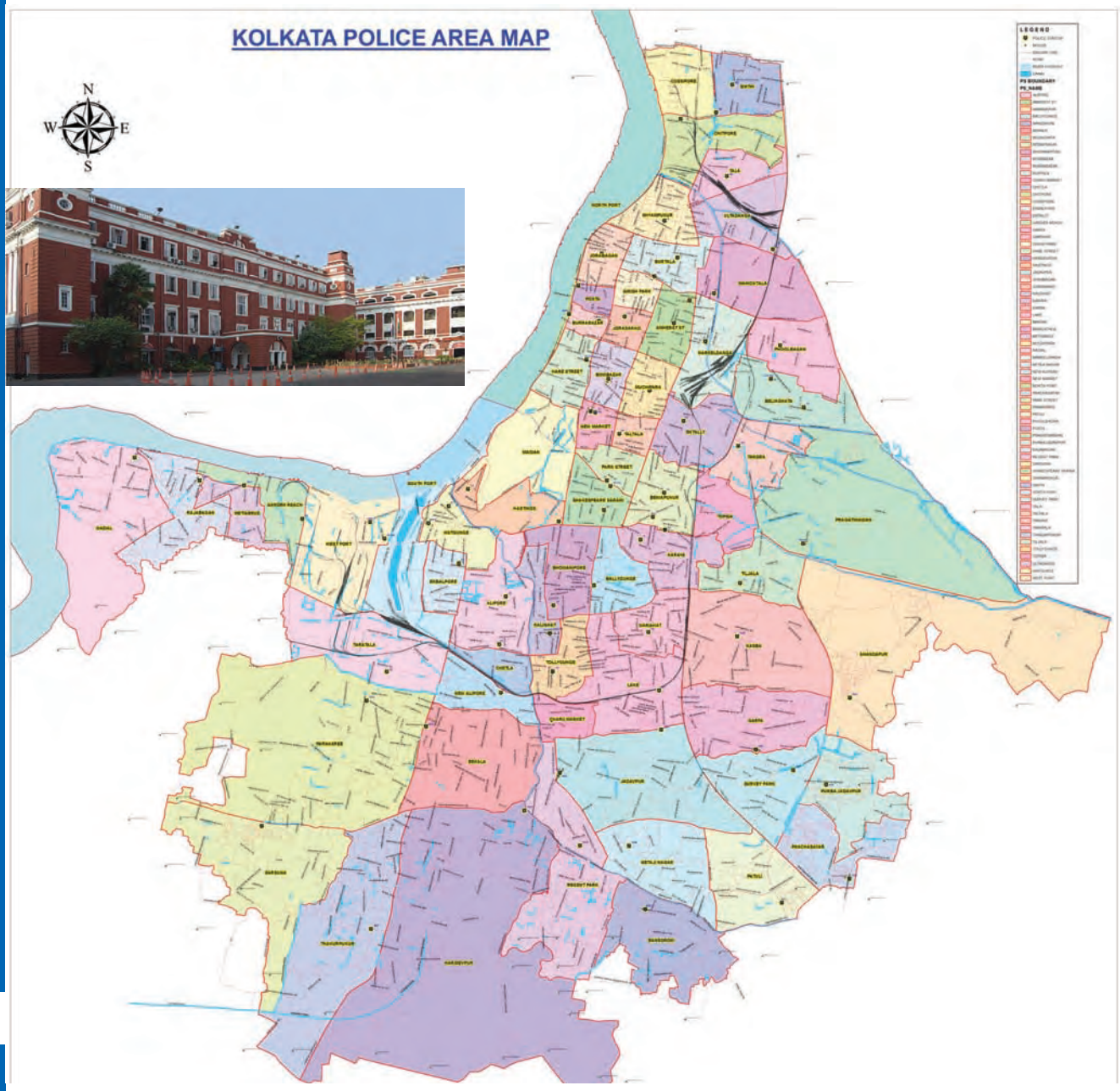

উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের দুর্ঘটনায় 'ব্রেন ডেথ' অর্থাৎ 'মস্তিষ্ক মৃত্যু'-র ঘটনাও ঘটে। আহত ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় আনার পাশাপাশি 'ব্রেন ডেথ'-এর ঘটনা ঘটে থাকলে সেই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা ইচ্ছুক থাকলে 'অঙ্গদান'-এর কাজও দ্রুত শুরু করা যেতে পারে। অল্পবয়সীদের 'ব্রেন ডেথ' হলে তাদের অনেক অঙ্গ প্রতিস্থাপিত করা যায় অন্যের দেহে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক কনট্রোল-এর উন্নত নজরদারি ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে, একদিকে যেমন দুর্ঘটনা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে প্রাণহানি কমানোর পাশাপাশি নতুন জীবনদানের ক্ষেত্রেও নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত প্রয়াস। 'মস্তিষ্ক মৃত্যু' ও 'নতুন জীবনদান' যেন একই মুদ্রার 'দুপিঠ' হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র ও কলকাতা পুলিশ-এর যৌথ উদ্যোগের পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠনও এ বিষয়ে এগিয়ে আসছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক কনট্রোলের ডিসি-র কাছ থেকেই জানা গেল উপরোক্ত তথ্য। এও জানা গেল যে, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি কর্মশালারও আয়োজন করেছে।

আশা রাখি, 'রক্তদান', 'চক্ষুদান'-এর মতো 'মস্তিষ্ক মৃত্যু ও অঙ্গদান' নিয়ে শিক্ষাঙ্গনেও সচেতনতা গড়ে তোলার কাজও শীঘ্রই গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হবে।

কলকাতা মহানগরের মধ্যে আপাতত এই কর্মকাণ্ড সাফল্য পেয়েছে অনেকাংশে কলকাতা পুলিশের জন্য। মহানগরের এই সাফল্যে রাজ্যবাসী খুশি। প্রয়োজন 'গ্রিন করিডর' তৈরির জন্য রাজ্যের সর্বত্র পুলিশি ব্যবস্থাকে মজবুত ও উন্নত আধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত করা। এতে সময় লাগবে। কিন্তু আমরা আশাবাদী।

রাজ্যে শুরু হল এক নতুন স্বপ্নভোর। 'ব্রেন ডেথ'-এ যিনি মারা গেলেন তিনি অঙ্গদান করে বেঁচে থাকলেন আমাদের মধ্যে। 'জীর্ণ বস্ত্র' ছেড়ে চলে যাওয়ার পালা শেষ হল। যেতে হবে। যাবো তো সবাই। যদি কিছু দিয়ে যেতে পারি, কিছু রেখে যেতে পারি— তার চেয়ে আনন্দের আর কিছু রইল না। এভাবেই 'জীবন-মৃত্যু'র মেলবন্ধন ঘটে চলবে।

—সুপ্রিয়া রায়

মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে জীবনের জয়যাত্রা

সেই দশ বছর বয়স থেকেই যন্ত্রণা নিত্যসঙ্গী। তবু লড়াই করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেননি সুরভি। চেয়েছিলেন আমৃত্যু মানুষের সেবা করে যেতে। বেছে নেন নার্সিং-এর পেশা। আর যেন তাই মাত্র ২২ বছর বয়সে মারা যাওয়ার সময়েও নতুন করে বাঁচার আশা জাগিয়ে দিয়ে গেলেন একাধিক অপরিচিত মানুষের মধ্যে। যাঁদের চোখে দেখা দূরস্থান—তাঁদের কথা শোনেনওনি কোনওদিন। বড়দিনের রাতে তাঁদের জন্যই রেখে গেলেন জীবনের সেরা উপহার।

উপহার যাঁরা পেলেন তাঁদেরই একজন ৫৭ বছরের রেলজা উবালিক। বাড়ি তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে। ডাক্তারি পরিভাষায় তাঁর রোগের নাম হেপাটোসেলুলার কারসিনোমো। ভিন রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হল রেলজাকে, তাঁর দেহেই প্রতিস্থাপিত হল সুরভির দেহের যকৃৎ। কেন সুদূর সেই তামিলনাড়ু থেকে উড়িয়ে আনতে হল রেলজা-কে?

‘কারণ, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অন্য কোনও o+ve সম্ভাব্য গ্রহীতার খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর সুরভির এই অমূল্য দান নষ্ট করতে মন চায়নি আমাদের’—বলছিলেন, এ রাজ্যে অঙ্গদান সংক্রান্ত বিষয়ের নোডাল অফিসার ডাঃ অদিতিকিশোর সরকার। তিনি এবং তাঁর দলবল এতটা সক্রিয় ছিলেন বলেই ব্যর্থ হয়নি সুরভির বাবার ইচ্ছা। নিজের বড়ো মেয়ের অস্তিত্বকে অন্যের দেহে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা।

আর তাই মেয়ের ব্রেন-ডেথের সংবাদেও মনোবল হারাননি আসানসোলের এই বাসিন্দা। আসানসোল বিসি কলেজের কাছেই মোবাইল রিচার্জের দোকান তাঁর। কোথা থেকে পেলেন এত মনের জোর?

অদ্ভুত শান্ত শোনাল অশোকবাবুর স্বর। —‘সেই ২০০৪-এ ব্রেন টিউমার ধরা পড়েছিল ওর। চেন্নাইতে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপচার করাতে হয়। মাথায় স্টেন্ট বসে। কিন্তু তারপরেও বারবারই ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হত—ব্লকেজ সরানোর জন্য।’ কারণ অস্ত্রোপচারের পরে হাইড্রোসেফালাস হয়ে যায় সুরভির। মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক পরিমাণে ফ্লুইড জমে যায় এই অবস্থায়। ‘সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরে আসত ও। ভেবেছিলাম, এবারও তেমনটাই হবে। কিন্তু হল না। ১৪ ডিসেম্বর—অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। পরের

সুরভি বরাট

দিন অস্ত্রোপচার। কিন্তু সেই অস্ত্রোপচার আর সফল হল না।' এর পরেই কোমায় চলে যান বাইশের এই তরুণী।

অশোকবাবু বলছিলেন, '১০ দিন আরও রাখা হল—ভাবলাম যদি কোমা থেকে ফিরে আসে।'

আর ফেরেননি সুরভি। ২৫ ডিসেম্বর 'ব্রেন ডেথ' ঘোষণা করা হল তাঁর। দ্বিতীয়বার ভাবেননি অশোকবাবু।

'মেয়ে তো চলেই গেল। আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে কী লাভ? বরং ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য কারও জীবন ফিরিয়ে দেবে—তাঁদের মধ্যেই বেঁচে থাকবে আমার মেয়েটা।'

অসম্ভব মনের জোর ছিল। অসুস্থতার মধ্যেও নিজের স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেছিলেন সুরভি। এরপর পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নার্সিং-এর প্রশিক্ষণ নেন। শেষ চার মাস দুর্গাপুরে আই কিউ সিটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নার্স হিসাবে চাকরিও করছিলেন।

সুরভির একটি কিডনি দেওয়া হয়েছে অ্যাপোলোর এক রোগী, হাওড়ার বাসিন্দা বিজয়কুমার ভূত-কে। আর দ্বিতীয় কিডনিটি প্রতিস্থাপনের জন্য পাঠানো হয় এসএসকেএম হাসপাতালে—৩২ বছরের পরিতোষ নস্করের জন্য।

আর তখনই কলকাতায় ফের তৈরি হল গ্রিন করিডর। স্বাস্থ্য দপ্তর ও কলকাতা পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় সুরভির কিডনি নিয়ে উৎসবের রাতে ১২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া গেল মাত্র ১০ মিনিটে। কীভাবে এই অসাধ্য সাধন করা গেল? কী এই গ্রিন করিডর?

লালবাজারে নিজের ঘরে বসে কলকাতা পুলিশের ডিসি (ট্রাফিক) ভি সলোমন নেসাকুমার যখন বললেন—'continuous green', মুহূর্তে সহজবোধ্য হয়ে উঠল 'গ্রিন করিডর' শব্দটার অর্থ। গ্রিন করিডর মানে আলাদা কোনও 'পথ' বা করিডর তৈরি করা নয়। গ্রিন করিডর মানে সবুজ সংকেত। অর্থাৎ গন্তব্য পর্যন্ত গোটা রাস্তার সব-কটি সিগনালই যেখানে সবুজ। পথে

সেদিন দায়িত্বে ছিলেন যিনি, গোটা ঘটনা শোনা যাক তাঁরই মুখে। সুরভির কিডনি নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স আর স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি গাড়ির আগে আগে মোটরবাইকে 'পাইলটিং' করছিলেন তিনি, সার্জেন্ট কল্যাণ দে। সাউথ ট্রাফিক গার্ড থেকে সদ্যই ২২ ডিসেম্বর বদলি হয়ে

লালবাজারে ট্রাফিক কনট্রোল রুমের নজরদারি ব্যবস্থা

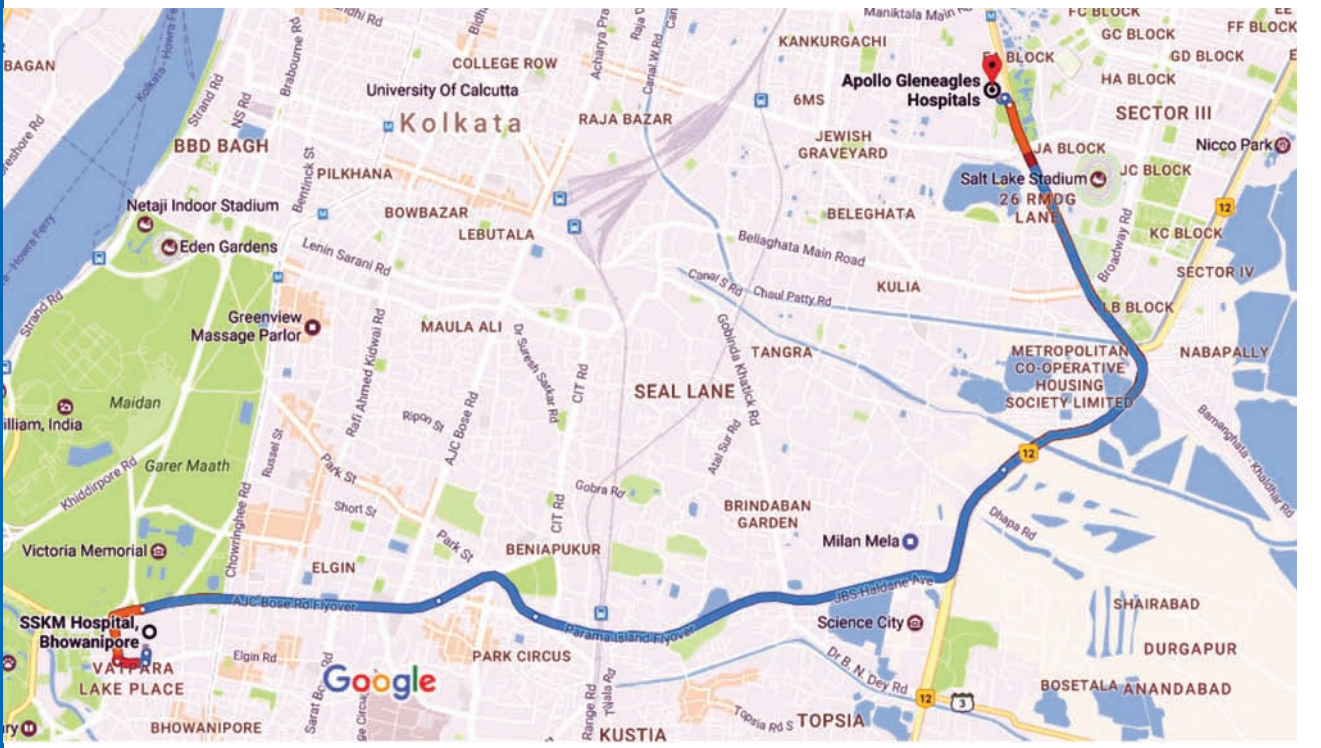

অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে এসএসকেএম। ব্যস্ত সময়ে এই ১২ কিলোমিটার পথে সময় লাগে প্রায় ৪০–৪৫ মিনিট। 'গ্রিন করিডর'-এ সময় লাগলো ৯–১২ মিনিট।

এসেছেন উল্টোডাঙা ট্রাফিক গার্ড-এ।

আর ২৫ ডিসেম্বরই এল এই মহাকার্যের গুরুভার। '২৫ তারিখ দুপুর দুটোয় ডিউটি ছিল। আমাকে বলা হল পাইলটিং করতে হবে—যেতে হবে অ্যাপোলো হাসপাতাল। সেই মতো আমি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ঠিক হল—সাড়ে তিনটেয় তৈরি থাকতে হবে। তারপর বলা হল সাড়ে পাঁচটা। তারপর আরও অনেকবার সময় বদলে বদলে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রাত ১০টা ১৮-য় আমরা বেরোতে পারলাম। পিজি হাসপাতালের দুজন ডাক্তারও ছিলেন। মোটরবাইকে এভাবে পাইলটিং করা কিন্তু খুব শক্ত। তার উপরে ডাক্তারবাবু আর কনট্রোল রুমের মধ্যে আমিই সেদিন একমাত্র সেতু।'

—এই পর্যন্ত একটানা বলে থামলেন কল্যাণবাবু। এদিনও গলায় মিলেছিল উত্তেজনার আঁচ।

—'সব সিগন্যাল সবুজ হল। গাড়ি অ্যাপোলো থেকে বেরিয়ে বাইপাস ধরল। এরপর মা ফ্লাইওভার—সেখান থেকে নেমে পার্ক সার্কাস সাত মাথার ক্রসিং—তারপর এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভার—ফ্লাইওভার থেকে নেমেই বাঁদিকে এসএসকেএম পোস্ট অফিস গেট। ঘড়িতে তখন ঠিক রাত ১০.২৮।'

কেমন ছিল সেদিনের অভিজ্ঞতা? কল্যাণবাবুর কথায়, '৮ বছরের উপর চাকরি করছি। এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। সময়মতো অরগ্যান পৌঁছে দেওয়ার পর মনে হল—এই প্রথম একটা কাজের মতো কাজ করতে পারলাম। যখন বার বার সময় বদলে যাচ্ছিল, আমিও ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলাম। কিন্তু কাজটা শেষ করার পর অদ্ভুত একটা শান্তি পেলাম। যাঁর ২২ বছরের মেয়ে চলে গেল, তাঁকে তো সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। কিন্তু তারই অঙ্গ এখন বহু মানুষের প্রাণ বাঁচাল। এখানেই সার্থকতা।'

সেদিন গ্রিন করিডর-এ

কল্যাণবাবু অবশ্য এই কৃতিত্ব ভাগ করে নিতে চান তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে। কারণ তাঁর মতে, রাস্তায়

দাঁড়িয়ে সেদিন যাঁরা নিজেদের কাজ করেছেন, ২৫ ডিসেম্বর রাতে রাস্তা ফাঁকা রেখেছেন—তাঁদের কৃতিত্ব সবার থেকে বেশি।

সত্যিই কল্যাণবাবু একা ছিলেন না সেদিন। লালবাজার ট্রাফিক কনট্রোল রুমে বসে কথা হচ্ছিল ট্রাফিক কনট্রোলের অতিরিক্ত ওসি অঞ্জন সাবুই-এর সঙ্গে। অঞ্জনবাবু জানালেন, নজরদারি পদ্ধতিতে ক্যামেরা একটা বড়ো হাতিয়ার। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ৯০০-র বেশি ক্যামেরা বসেছে। যে কোনও রাস্তার ছবি যে কোনও সময়ে একেবারে আপনার চোখের সামনে। এর জন্যই তো এত সহজে এত বড়ো কাজটা করা সম্ভব হল।

অঞ্জনবাবুর কথায়, 'আমাদের এই দলগত প্রচেষ্টায় একটা মানুষ প্রাণ ফিরে পেল—এখানেই আমাদের কষ্ট সার্থক। ডাক্তারবাবুরা তো ভগবান। তাঁদের কাজে যে আমরাও এবার শরিক হতে পারলাম এটা ভেবেই ভালো লাগছে।'

তবে এটাই প্রথমবার নয়। এর আগেও একযোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর আর কলকাতা পুলিশ।

এর আগেও কলকাতার রাজপথে তৈরি হয়েছে গ্রিন করিডর।

সেটা ছিল ৪ নভেম্বর। ইতিহাস তৈরি করল কলকাতা। বাংলার ইতিহাসে সেই প্রথম চিকিৎসার প্রয়োজনে তৈরি হল গ্রিন করিডর।

পাইলট কার নিয়ে সেদিন পথের দায়িত্বে ছিলেন সার্জেন্ট রাজকিরণ সাউ—বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত। পথে ভিআইপি-দের সঙ্গী হয়েছেন বহুবার। রেড রোডে প্রতিমার শোভাযাত্রাতেও পাইলটিং করেছেন। কিন্তু এবার?

'এই অভিজ্ঞতা অনন্য—এই অভিজ্ঞতার কোনও তুলনা চলে না।' —বলছিলেন, বছর ৩১-এর রাজকিরণ—'কলকাতা পুলিশের তরফে এই কাজের সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই গর্বিত।' একজন মানুষ মারা গেলেও যে আর একজনের প্রাণ বাঁচানো যায়—এই কথাটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সরকার।'

ঠিক কী হয়েছিল এর আগে?

৩০ অক্টোবর, রবিবার সন্ধ্যায় অঙ্ক টিউশন থেকে বাড়ি ফিরছিল বসিরহাটের বাসিন্দা স্বর্ণেন্দু রায়—বসিরহাট টাউন হাইস্কুল থেকে এবারই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল তার। পথে দুর্ঘটনা। গুরুতর আহত ওই কিশোরকে স্থানীয় মানুষজন প্রাথমিকভাবে বসিরহাট স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান। স্বর্ণেন্দুর বাবা-মা, চন্দ্রশেখর ও সুজাতা নিজেদের একমাত্র ছেলেকে এরপর অ্যাপোলো গ্লেনেগালস-এ নিয়ে আসেন। যদি কোনও মিরাক্যাল হয়—হয়নি। সারা রাত ধরে অস্ত্রোপচার করেও মস্তিষ্ক থেকে জমাট বাঁধা রক্ত সরানো যায়নি। সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে কোমায় চলে যায় স্বর্ণেন্দু।

শেষ হয়ে গেল সব আশা। নিভে গেল সব আলো। কিন্তু এর পরেও অন্যের জীবনে আশার আলো জ্বেলে দিতে এগিয়ে এলেন সব হারানো এই বাবা-মাই। চোখের জল মুছে জানালেন, ছেলের অঙ্গদান করতে চান তাঁরা। 'মাধ্যমিকে ৮০%-এর উপরে নম্বর পেয়েছিল'—মায়ের উদাস দৃষ্টি হারিয়ে গেল দূরে।

স্বর্ণেন্দু রায়

রাজ্যের অঙ্গদান বিষয়ক নোডাল অফিসার অদিতিকিশোর সরকার ও তাঁর সহযোগীরা দ্রুত কাজে নেমে পড়েন। প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমতি দেওয়া হয়।

দিল্লি থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজন চিকিৎসককে উড়িয়ে আনা হয় অ্যাপোলো হাসপাতালে। ততক্ষণে এসএসকেএম-এর চিকিৎসকেরা স্বর্ণেন্দু রায়ের কিডনি সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। উত্তরপাড়ার

রুবি সরদার

বাসিন্দা রুবি সরদারের দেহে কিডনি প্রতিস্থাপিত হয় অ্যাপোলোতেই। এরপর অন্য কিডনিটি নির্দিষ্ট ফ্লুইডে রেখে আইস বক্সে চাপিয়ে তৈরি করে ফেলা হয় এসএসকেএম-এ পাঠানোর জন্য।

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে তখন দাঁড়িয়ে কলকাতা। সন্ধ্যায় ব্যস্ত রাস্তা সামাল দেওয়ার কাজে প্রস্তুত হচ্ছিলেন উল্টোডাঙা ট্রাফিক গার্ডের ওসি তন্ময় উপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ৩ নভেম্বর তখনই বেজে ওঠে তাঁর ফোন। সমস্ত শুনে দ্রুত ছকে ফেলেন কাজের নকশা। ঠিক এর পরেই কেরিয়ারের দুরূহতম কাজটি করতে পথে বেরিয়ে পড়েন রাজকিরণ।

—এমন কাজ যার দায়িত্ব আগে কখনও কোনওদিন পাননি কোনও অফিসার।

রাত ১২টা বেজে ১৭ মিনিট। অ্যাপোলো ছেড়ে লাল রঙের জিপসিতে পথ দেখাতে দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন রাজকিরণ। তাঁর চোখ একবার পথে আর পরমুহূর্তে নিজের ঘড়িতে।

প্রত্যেকটা মুহূর্ত তখন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পিছনের অ্যাম্বুলেন্সে রয়েছে সেই কিডনি এসএসকেএম-এ যার অপেক্ষায় রয়েছেন একজন রোগী এবং তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে। কাঁটায় কাঁটায় রাত ১২টা ২৮। 'মা' উড়ালপুল দিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেলেন রাজকিরণ—হয়ে গেলেন ইতিহাসের অঙ্গ।

তন্ময়বাবুর কথায়, —'ওরিজিনেটিং পয়েন্ট আমার আওতায় ছিল। অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল থেকে বেরনোর অনেক আগেই আমরা গড়িয়ামুখী সমস্ত যানের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলাম—যাতে ওদের সামনে কোনও গাড়ি না চলে আসে। অন্য ট্রাফিক গার্ডগুলোও সেই মতো গাড়ির চলাচল বন্ধ করে রেখেছিল। ভগবানের আশীর্বাদ, এমন একটা মহৎ কাজে আমরা সফল হতে পেরেছি।'

চিকিৎসকরাও কামারহাটির বাসিন্দা নিলোফার আরার দেহে সেই কিডনি প্রতিস্থাপন করেন কোনও সময় নষ্ট না করেই। নিলোফারের নিজের কিডনিটি নষ্ট হওয়ায় বাদ চলে গিয়েছিল আগেই।

অন্যদিকে, স্বর্ণেন্দুর দেহ থেকে যকৃৎ সংগ্রহ করার কাজ ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে। রাত ২টো ১৪ মিনিট নাগাদ চিকিৎসকদের কাজ শেষ হয়। সেই লিভার

নিয়ে অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে গাড়ি বেরোয় রাত ২টো ২৪-এ, আর একইভাবে মাত্র ১০ মিনিটেই তা এসএসকেএম-এ পৌঁছে দেন রাজকিরণ।

সেখানেই ভোর পাঁচটা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করা হয় সালকিয়ার বাসিন্দা সংযুক্তা মণ্ডলের দেহে—প্রতিস্থাপিত হয় স্বর্ণেন্দুর দেহের যকৃৎ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে ব্রেন ডেথ এবং অঙ্গদানের একটা ছোটো ইতিহাস আছে। ১৯৯৪ সালে এদেশে The Transplantation of Human Organs and Tissues Act কার্যকরী হয়। এরপর ২০১২ সালে নদিয়ার বাসিন্দা বিমল কর্মকারের ব্রেন ডেথ হয়। তাঁর পরিবার রাজি হওয়ায় তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়েছিল দুই রোগীর দেহে। সম্ভবত এটিই এক্ষেত্রে পূর্ব ভারতে প্রথম উদাহরণ।

এরপর ২০১৬-র মে মাস পর্যন্ত সেভাবে এই ধরনের কোনও ঘটনা সামনে আসেনি।

ওই বছর ২৭ জুন গড়িয়ার পঞ্চসায়রের বাসিন্দা ৭১ বছর বয়সী শোভনা সরকারের মস্তিষ্ক কাজ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সক্রিয় ছিল। শোভনার ৮৪ বছরের স্বামী অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী রবীন্দ্রকুমার এবং পুত্র প্রসেনজিৎ এগিয়ে আসেন শোভনার শেষ ইচ্ছা কার্যকর করতে। নানারকম পদ্ধতি ও অনুমোদন পর্ব সেরে তাঁর কিডনি দুটি দুই রোগীকে দেওয়া গিয়েছিল।—এঁদের একজন কেয়া রায় এবং অন্যজন শেখ ফিরোজউদ্দিন।

এরপর ২০১৬-তেই ২৬ জুলাই। দমদমের বাসিন্দা সমর চক্রবর্তী ভুগছিলেন ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এবং কিডনির অসুস্থতায়।

ইনফ্রা সেরিব্রাল হ্যামারেজ নিয়ে উত্তর কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু তিনি কোমায় চলে যান। এরপর সমরবাবুকে অ্যাপোলো গ্লেনেগালস্-এ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে ব্রেন ডেড বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর লিভার প্রতিস্থাপিত হয় ৪৬-এর মাধুরী সাহার দেহে। সমরবাবুর কর্নিয়াও নেওয়া হয়, কিন্তু ডায়াবেটিস থাকায় এবং হিমোডায়ালিসিস চলায় তাঁর কিডনি সংগ্রহ করা যায়নি।

অ্যাপোলো হাসপাতাল গ্রুপ-এর প্রেসিডেন্ট এবং পূর্বাঞ্চলীয় সিইও ডাঃ রূপালি বসু জানিয়েছেন, এভাবে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়ায় গত এক বছরে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। সরকার ভীষণভাবে এগিয়ে এসেছে। এমনকি, ই-মেল-এ অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে। একইভাবে সচেতনতা বাড়ছে সাধারণের মধ্যেও।

শোভনা সরকার

কেয়া রায়

অদিতিকিশোর সরকার জানিয়েছেন, জাতীয় স্তরে National Organ and Tissue Transplant Organisation তৈরি হওয়ার পর আঞ্চলিক স্তরে এসএসকেএম-এ তৈরি হয়েছে ROTTO—পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা—এই চার রাজ্য এর অন্তর্গত। ROTTO-র জন্য অধিকর্তা, যুগ্ম অধিকর্তা, ট্রান্সপ্লান্ট কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি পদে নিয়োগ করা হবে। আপাতত কার্যকরী অধিকর্তা হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আইপিজিএমইআর-এর অধিকর্তা মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অদিতিবাবুর কথায়, 'মানবসম্পদের জন্য ৭৬ লক্ষ এবং পরিকাঠানোগত উন্নয়নের জন্য ৬৭ লক্ষ টাকা এসে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। কাজ চলছে জোর কদমে।'

স্বর্ণেন্দুদের এই দান যেন ব্যর্থ না হয়—ব্রেন ডেথ ঘোষণা হলে শোক কাটিয়ে উঠে যত বেশি পরিবার অঙ্গদান করতে এগিয়ে আসবেন—ততই প্রাণ ফিরে পাবেন আরও একজন মুমূর্ষু। এই মুহূর্তে দরকার সচেতনতা। ২১ বছরের দীপশিখা পড়ছিলেন বি টেক। হঠাৎই সড়ক দুর্ঘটনায় সমস্ত সম্ভাবনার ইতি। ব্রেন ডেথ হয় দীপশিখার। এর পরে তাঁর বাবা সমর সামন্ত অনুমতি দিলে দীপশিখার দুটি কিডনি এস.এস.কে.এম. হাসপাতালের দুই রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়। ২০১৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা।

ওই বছরেরই ১৭ আগস্ট ব্রেন ডেথ হয় মল্লিকা মজুমদার নামে এক রোগীর। মল্লিকার পরিবারের সদস্যরা প্রথমে রাজি ছিলেন না। পরে চিকিৎসকদের কথায় সম্মতি দেন তাঁরাও। অন্য রোগীদের দেহে প্রতিস্থাপিত হয় তাঁর লিভার এবং ২টি কিডনি।

—সর্বাণী আচার্য

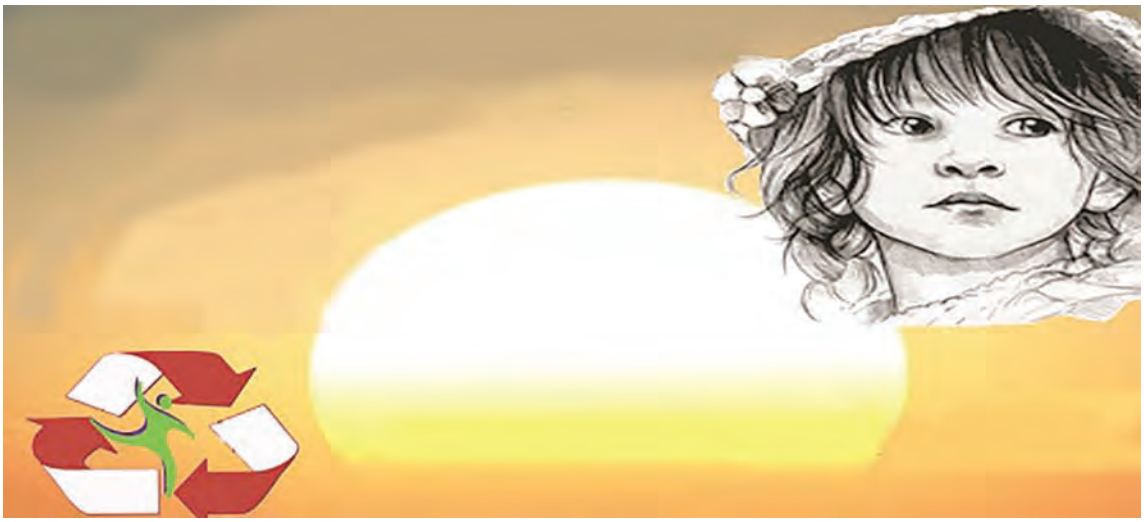

মস্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন

রাতুল দত্ত

অঙ্গদান পর্ব শেষ।

সাইরেন বাজিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সটা, হাসপাতাল থেকে।

প্রিন্সিপ্যাল অরাম চেরিয়ান তখন গেটের ঠিক কোনাটায় দাঁড়িয়ে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে আরও কিছু ছেলে মেয়ে, যারা বিশালের বয়সী, এক ক্লাসে পড়ে। কিংবা শুধু ঘটনাটা শুনেই চলে এসেছে।

বিশাল সতীশ (১৫)। কেরলের থিরুবনন্তপুরম স্কুল থেকে একজন ছাত্র হয়ত কমে গেল। সেটা নগণ্য। শত শত তরুণ প্রজন্মের মস্তিষ্কে যেন একটা দাগ কেটে গেল তার পরিবার। সেটাই বিশাল।

১৯ জুলাই, ২০১৬।

মাত্র ৬ মাস আগের ঘটনা। অন্যদিনের মত সেদিনও স্কুল থেকে ফিরছিল বিশাল। ঘাতক লরিটা ওভাবে ছুটে না এলে...

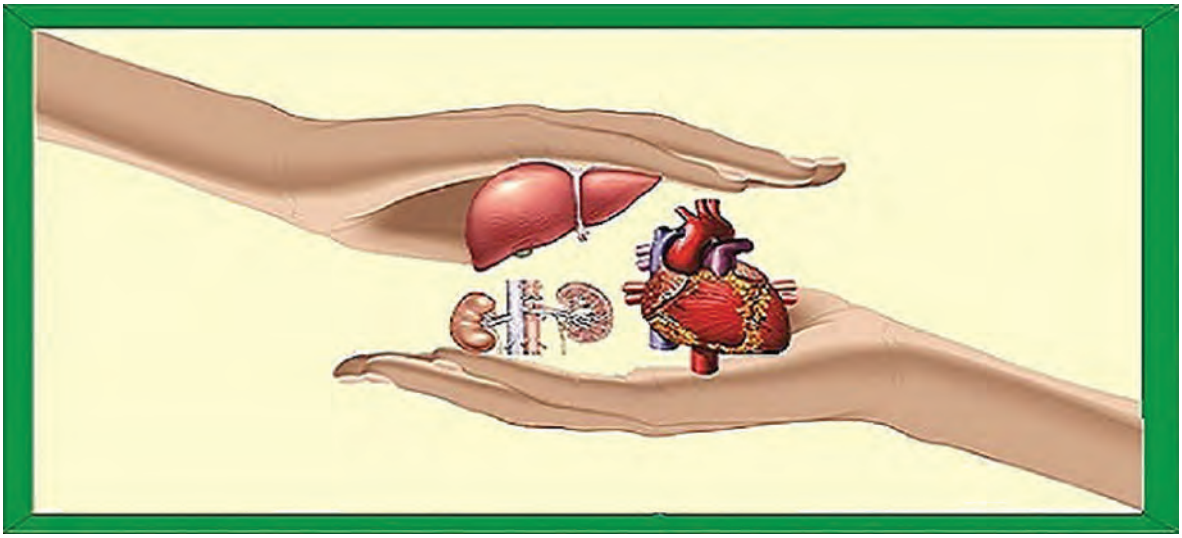

চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ। হাসপাতাল ঘোষণা করল বিশালের মস্তিষ্ক মৃত্যু ঘটেছে। বাবা, তৎক্ষণাৎ মা-র সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলেন, বিশালের হৃদপিণ্ড, যকৃৎ এবং ২টি কিডনি দান করবেন। অঙ্গীকারপত্রে যখন সই করছেন, তখনই জানা গেল ২০০ কিলোমিটার দূরে কোচিতে একজনের হৃদযন্ত্রের প্রয়োজন। বিশালের হৃদপিণ্ড হেলিকপ্টারে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেখানে। তাঁরও বয়স খুব কম, মাত্র ২৭। এদিকে যখন কোচিতে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের এই কর্মযজ্ঞ চলছে, ততক্ষণে বিশালের যকৃৎ ও কিডনি সংগ্রহও শেষ। সাফল্যের সঙ্গে তাদেরও অস্ত্রোপচার করা হয়।

অর্থাৎ একজনের মস্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গদানে নতুন জীবন ফিরে পেলেন ৪ জন। বিশালের হৃদযন্ত্র, ২টি কিডনি এবং যকৃত সফলভাবে ৪ জনের দেহে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

আসলে মস্তিষ্ক মৃত্যু বা ব্রেন ডেথ হল একটা ঘটনা এবং অঙ্গদান হল ঘটনার ফল বা পরম্পরা। একটা ধারাবাহিক আন্দোলন। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর ভারতে যত দুর্ঘটনা ঘটে তার মধ্যে প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষ মস্তিষ্ক মৃত্যুর ফলে মারা যান। অন্যদিকে অঙ্গদানের হার হল প্রায় প্রতি ২.৫ লাখে ১ জন বা প্রতি লাখে ০.৩৬ জন। শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতে এই পরিসংখ্যান বেশ বেশি, প্রতি লাখে ১.৯ জন। পশ্চিমবঙ্গও বর্তমানে বেশ এগচ্ছে। বিশেষ করে, ২০১৬র জুন থেকে ডিসেম্বর এই ৬ মাসের মধ্যে ৫টি মস্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গদানের অঙ্গীকারের ঘটনা ঘটেছে। ২৭ জুন শোভনা সরকার, ২৬ জুলাই সমর চক্রবর্তী, ৪ নভেম্বর স্বর্নেন্দু রায়, ৮ নভেম্বর কৌশিক সরকার এবং ২৫ ডিসেম্বর সুরভি বরাটের মস্তিষ্ক মৃত্যুর পর এতগুলো প্রাণ নতুন করে ফিরে পেল। এদের যকৃৎ, চোখের কর্নিয়া এবং কিডনি বেঁচে রয়েছে অন্যের দেহে।

তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন ভেসে ওঠে। কাকে বলে মস্তিষ্ক মৃত্যু? সাধারণ মৃত্যুর সঙ্গে এর পার্থক্য কী? সাধারণ মৃত্যু হলে, অঙ্গদান করা সম্ভব নয় কেন?

- **অঙ্গ কী?**

  একটি বিশেষ ধরনের দেহাংশ, যা দেহের কোন একটিমাত্র বিশেষ কাজই করে বা করতে পারে। যেমন — হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, কিডনি, যকৃৎ বা লিভার ইত্যাদি।

- **কোন কোন অঙ্গ দান করা সম্ভব?**

  অনেক অঙ্গই প্রদান করা সম্ভব। যেমন — যকৃৎ, কিডনি, অগ্ন্যাশয়, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস এবং অন্ত্র।

- **কলা বা টিস্যু কী?**

  দেহের অনেকগুলি কোষ মিলে যদি একধরনের বিশেষ কাজ করে, তাহলে তাকে কলা বা টিস্যু বলে। যেমন — অস্থি, চর্ম, চোখের কর্নিয়া, রক্তনালিকা, হৃদযন্ত্রের ভালব, স্নায়ু, টেন্ডন ইত্যাদি।

- **কোন কোন কলা প্রদান করা সম্ভব?**

  কর্নিয়া, অস্থি, হৃদযন্ত্রের ভালব, চর্ম, রক্তনালিকা, স্নায়ু, টেন্ডন।

কাকে বলে মস্তিষ্ক মৃত্যু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Uniform Determination of Death Act অনুসারে Brain Death হল— "irreversible cessation of circulatory and respiratory function"; অর্থাৎ যে মৃত্যুতে মস্তিষ্কে সমস্ত ধরণের রক্ত চলাচল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এটা বলে রাখা ভাল, মস্তিষ্ক মৃত্যুই হল কোনও ব্যক্তির আইনত মৃত্যু। এখান থেকে প্রাণ ফিরে আসার সম্ভাবনা শূন্য। আর মস্তিষ্ক মৃত্যু হল অঙ্গদানের প্রথম শর্ত।

মস্তিষ্ক মৃত্যুর ফলে স্টেম কোষের মৃত্যু এবং যাবতীয় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্নায়ুতন্ত্রের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। ফুসফুসের চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র হৃদযন্ত্র, ভেন্টিলেশন এবং অন্যান্য জীবনদায়ী পদ্ধতির মাধ্যমে চলতে থাকে। এটি একধরণের কোমার বিশেষ পর্যায়, যে পর্যায় থেকে আর মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বা প্রাণ ফিরে আসা সম্ভব নয়।

- **অঙ্গদান কী ?**

মুমূর্ষু এক ব্যক্তি যদি তাঁর নিজের শরীরের কোনও অঙ্গ দিয়ে অপর একজনের প্রাণ বাঁচাতে পারেন এবং যদি তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির দেহে সেই অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয় — তাহলে তাকে অঙ্গদান বলা হয়।

- **কত ধরনের অঙ্গ প্রদান সম্ভব ?**

i) জীবিত ব্যক্তির দেহের অঙ্গদান : একজন তাঁর নিজের জীবনসীমার মধ্যে ১টি কিডনি (দাতার দেহে ১টি কিডনিতেই ভালভাবে শারীরবৃত্তীয় কাজ চলা সম্ভব), অগ্ন্যাশয়ের কিছু অংশ (যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ চালানোর জন্য অগ্ন্যাশয়ের অর্ধেকাংশই যথেষ্ট) এবং যকৃতের কিছু অংশ (জীবিত ব্যক্তির দেহ থেকে যকৃতের সামান্য অংশ নিয়ে অপর ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে কিছুদিন পর দুজনের দেহেই পরিপূর্ণ যকৃৎ তৈরি হয়ে যায়) প্রদান করতে সক্ষম।

ii) মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহের অঙ্গদান : মস্তিষ্ক মৃত্যুর পর কোনও ব্যক্তির অনেক অঙ্গ এবং কলা প্রতিস্থাপন সম্ভব এবং প্রতিটি অঙ্গ ও কলা অপর ব্যক্তির দেহে বেঁচে থাকে।

- **অঙ্গদানের কোনো বয়সসীমা রয়েছে?**

অঙ্গদানের বয়ঃসীমা নির্ভর করে, জীবিত বা মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ বা কলা সংগ্রহ করা হচ্ছে তার বয়সের ওপর। তবে জীবিত ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ বা টিস্যু সংগ্রহ করতে গেলে ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর হতে হবে। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা তারপর ঠিক করে দেবেন, তাঁর কোন অঙ্গ প্রদানে ক্ষতি হবে না। সারা পৃথিবীতে, ৭০ এবং ৮০ বছর বয়স্ক মানুষের দেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ করে, সাফল্যের সঙ্গে প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে। কলা এবং চক্ষু প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণত বয়স কোনও সমস্যা হয় না। তবে মুমূর্ষু ব্যক্তির অঙ্গদানের মোটামুটি বয়ঃসীমা নিম্নরূপ —

কিডনি, যকৃত : ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত	কর্নিয়া, চর্ম : ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত
হৃদযন্ত্র, ফুসফুস : ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত	হৃদযন্ত্রের ভালব : ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত
অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র : ৬০-৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত	অস্থি : ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত

- **পরিবারহীন কোনও ব্যক্তির অঙ্গদান সম্ভব ?**

সম্ভব। তবে মৃত্যুর পর মুমূর্ষু অবস্থায়, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং অঙ্গীকারপত্রে সই করবেন, সে বিষয়ে কাউকে আইনত দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে। তিনিই শেষমেশ ওই ব্যক্তির অঙ্গদানের অঙ্গীকারপত্রে সই করবেন।

মস্তিষ্ক মৃত্যুর ইতিহাস :

গত শতকের '৬০-এর দশক থেকে মস্তিষ্ক মৃত্যু এবং তা নিয়ে আইনের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। একই সঙ্গে প্রায় সব দেশেই অঙ্গদানের গতি একটু করে ত্বরান্বিত হতে শুরু করে। প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে, ফিনল্যান্ড, ১৯৭১ সালে মস্তিষ্ক মৃত্যুকে আইনে পরিণত করে। এর আগে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি অবশ্য মার্কিন মুলুকের নিউজার্সিতে সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে, কখন কার শরীর থেকে 'লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম' তুলে নেওয়া হবে, তার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অধিকার ওই ব্যক্তির পরিবারের হাতে রয়েছে।

এখন যে মস্তিষ্ক মৃত্যু নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে, তার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল সে বছর যে রিপোর্ট প্রকাশ করে, তাতে একধরণের কোমার (Irreversible

Coma) কথা বলা হয়, যাতে আর প্রাণ ফিরে আসেনা। এটাই পরবর্তীকালের মস্তিষ্ক মৃত্যু বা ব্রেন ডেথ। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এটি এমন এক ধরণের কোমা, যাতে শরীরে কোন ধরণের উত্তেজনা থাকবে না। স্নায়ুতন্ত্র সম্পূর্ণ বিকল হবে। কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিন্দুমাত্র নড়াচড়া পর্যন্ত করবে না। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র সমস্ত ধরণের জীবন দায়ী সিস্টেম এবং ভেন্টিলেশন দিয়ে তাকে রেখে দেওয়া হবে, যাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সজীব রক্ত থাকে। এটি এমন এক ধরণের কোমা, যার কারণ জানা গেছে।

১৯৯৫ সালে, লন্ডনের 'রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস' (Royal College of Physicians) যে রিপোর্ট প্রকাশ করে, তাতে ব্রেন ডেথ বিষয়টি পরিবর্তন করে Brain Stem Death-এর কথা বলা হয়।

অঙ্গদান বিশ্বজুড়ে :

আমেরিকা : মার্কিন মুলুকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার মানুষ অপেক্ষা করছেন, কোনও না কোন অঙ্গের জন্য। অন্যদিকে সেখানে বছরে মাত্র ৩০ হাজার মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়। প্রতিদিন প্রায় ১৯ জন আর প্রতিবছর প্রায় ৬০০০ মানুষ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অভাবে সে দেশে, মারা যান। ১৯৮৮-২০০৬ সালের মধ্যে মার্কিন মুলুকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাত্রা দ্বিগুণ হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তাঁদের জন্য চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। The Uniform Anatomical Gift Act, 1987 এবং পরবর্তীকালে এই আইনের পরিমার্জিত সংস্করণ অনুসারেই বর্তমানে সে দেশে যাবতীয় অস্ত্রোপচার চলে। আবার Living Doner Protection Act 2016 অনুসারে, যে কোন সংস্থার কর্মীদের, অঙ্গদান করলে, ১২ মাসের মধ্যে ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি দেওয়ার বিষয়ে আইন আনার কাজও সে দেশে শেষ পর্যায়ে।

ইউরোপ : ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেয়ন (EU) দেশগুলির মধ্যে অঙ্গদানের প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে এবং সচেতনতাও যথেষ্ট। তবে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পার্থক্য বেশ। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, EU-এর ২৪ দেশের মধ্যেই কোনও না কোনও ভাবে অঙ্গীকারের আইনে প্রচলিত রয়েছে। আবার ব্রিটেনে

- **অঙ্গীকারের মাধ্যমে কীভাবে একজন অঙ্গদাতা হয়ে উঠতে পারি ?**

অঙ্গদান নিয়ে ভারতে আইন তৈরি হয়েছে ২০১৪ সালে। তৈরি হয়েছে জাতীয় স্তরে, এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সংস্থা National Organ And Tissue Transplant Organisation (NOTTO নয়াদিল্লির সফ্দরজঙ্গ হাসপাতালে। আঞ্চলিক স্তরে, কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তৈরি হয়েছে ROTTO; পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং সিকিম এসেছে এর আওতায়। আবার রাজ্যস্তরে, SOTTO তৈরি হয়েছে এই হাসপাতালেই। অন্যদিকে বিহার ও ওড়িশায় যে এইমস হাসপাতাল রয়েছে, সেখানেই তাদের রাজ্যস্তরের সংস্থা, SOTTO কাজ করছে।

- **অঙ্গীকার করেও পরে মত পরিবর্তন?**

হ্যাঁ, সেটাও সম্ভব। কেউ যেমন অঙ্গদানের অঙ্গীকার করার পরেও বাড়ির লোকের কোনও অনুমতি ছাড়া কিছুই কাটাছেঁড়া সম্ভব নয়। ঠিক তেমনই, জীবিতাবস্থায় কোনও বয়সে অঙ্গদানের অঙ্গীকার করেও, মন পরিবর্তন করা যায়। এ ব্যাপারেও সেই NOTTO, ROTTO বা SOTTO সংস্থাতেই যোগাযোগ করতে হবে।

- **সফল অঙ্গ প্রতিস্থাপন হলে জীবন ফিরে পাবেন, ভারতে এই চাহিদা কেমন?**

যেহেতু, নানা অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছেই, তাই ভারতে এই মুহূর্তে অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও অঙ্গদান ব্যাপক মাত্রায় প্রয়োজন, পরিসংখ্যান বাড়ছেই। সঠিক, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কিছু নেই। সম্ভবও নয়। কারণ এটা একটা আত্মসচেতনতামূলক কাজ। একটা সীমা বলা যেতে পারে মাত্র।

প্রতি বছর কিডনি প্রয়োজন, ২ লক্ষ ৫০ হাজার। যকৃৎ বা লিভার প্রয়োজন — ৮০ হাজার। হৃদপিণ্ড প্রয়োজন — ৫০ হাজার এবং কর্নিয়া প্রয়োজন — ১ লক্ষ।

- **কোনো দাতা যদি সংক্রামিত রোগী হন, কী করবেন ?**

কেউ অঙ্গদানের ইচ্ছে প্রকাশ করলেই তা সম্ভব হবে বা তাঁর অঙ্গ নেওয়া হবে — এমনটা নয়। বরং সক্ষম অঙ্গদাতার দেহ থেকে রক্ত নিয়ে দেখা হয়, তাদের দেহে সংক্রামিত রোগ রয়েছে কিনা। বিশেষ করে হেপাটাইটিস এবং এইচ আই ভি-র জীবাণু আছে কিনা পরীক্ষা নেওয়া হয়।

তবে বিরলতম ঘটনাও যে ঘটে না এবং এই দুই সংক্রামিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরও অঙ্গদান বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয় না — এমনটা নয়। যদি অঙ্গদাতা এবং অঙ্গগ্রহীতা দুজনরেই এই দুইয়ের কোন রোগ থাকে এবং তার দান গ্রহণ বিষয়ে দুই পরিবারের সম্মতি থাকে, তাহলে অঙ্গদান সম্ভব। খুব কড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অঙ্গদান সম্পূর্ণ সমাজসেবা মূলক কাজ হিসেবে ধরা হয় এবং এর নির্দিষ্ট আইন নেই। যদি কেউ অঙ্গ প্রদান করতে ইচ্ছুক হন, ন্যাশনাল অর্গান ডোনেশন রেজিস্টার-এ নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। স্কটল্যান্ডে আবার অঙ্গীকার ছাড়াই সরাসরি অঙ্গদান করা যায়। অস্ট্রিয়াতে আবার যেকোনও ধরণের মৃত্যুর সময় অঙ্গদান বাধ্যতামূলক। জার্মানিতে অবশ্য অঙ্গীকার করবেন কিনা সে ব্যাপারে পরিবারের পছন্দ-অপছন্দের সুযোগ রয়েছে।

জাপান : পশ্চিমের দেশগুলির তুলনায় জাপানে অঙ্গদান ও অঙ্গ প্রতিস্থাপনের হার খুবই কম। এর অন্যতম কারণ হল, ১৯৬৮ সালের একটি ঘটনা। একটি অঙ্গ প্রতিস্থাপনকে ঘিরে প্রবল আলোড়ন হয় এবং তারপর ৩০ বছর, মস্তিষ্কে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সর্বশেষে ১৯৯৭ সালে আইনের মাধ্যমে অঙ্গদান বৈধতা পায়।

শ্রীলঙ্কা : ছোট দেশ। অঙ্গদান এত বেশি হারে সম্ভব না হলেও চক্ষুদানে শ্রীলঙ্কা পৃথিবীর বহু দেশকে পথ দেখাতে পারে। ১৯৮৭ সালেই সেদেশে Human Tissue Transplantation Act No. 48 চালু হয়েছে। প্রতি বছর শ্রীলঙ্কা থেকে ৫৭টি দেশে প্রায় ৬০ হাজার কর্নিয়া পাঠানো হয়।

ইজরায়েল : একটি নতুন ধরণের পলিসি গ্রহণের মাধ্যমে ২০০৮ সাল থেকে অঙ্গদানের প্রবণতা অনেকগুণ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অঙ্গদানের বিষয়ে একটি কার্ড সেদেশে প্রচলিত আছে। যাদের কাছে এই কার্ড থাকবে, তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা পরিষেবা দেওয়া হবে। এমনকী দুজন রোগী হাসপাতালে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভর্তি হলে, যার ওই কার্ড থাকবে, তাঁকে আগে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হবে।

ইরান : পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে অঙ্গ বিক্রি বৈধ। হয়ত এর ফলে, বা তার কারণে ইরানে অঙ্গের চাহিদা বেশ কম। Dialysis and Transplant Patients Association নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেদেশে খুব ভাল কাজ করে। যাঁরা অঙ্গ দান এবং গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা মূলত এখানেই নাম লেখান। অঙ্গ কেনা বেচার ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের এখানে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

ভারতে অঙ্গদান :

চক্ষুদান এবং কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ যেমন— হৃদযন্ত্র, যকৃৎ, কিডনি, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি দানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সচেতনতা বাড়ছে। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে তামিলনাড়ু। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন তথা অঙ্গদান এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন একটু পরে শুরু হলেও ২০১৬ সালেই বেশ কয়েকটি ঘটনার অন্যান্য রাজ্যের নজর কেড়েছে। The Transplantation of Human Organs Act, 1994 অনুসারে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তাদের নিজের মত করে পরিকাঠামো তৈরি করছে। ২০১১ সালে এই আইনের পরিমার্জনার পর ২০১২ সালেই মস্তিষ্ক মৃত্যুর পর অঙ্গদানের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।

● **কোনদিন রক্তদান না করেও অঙ্গদান আদৌ সম্ভব?**

অনেকে যেমন ইচ্ছে করে রক্তদান করেন না, তেমনি ইচ্ছে থাকলেও রক্তদান সম্ভব হয় না। যেমন — অনেকের অ্যানিমিয়া বা হেপাটাইটিস হতে পারে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কোনও কারণে রক্তদান না করতে বলতে পারেন। ঠান্ডা লাগতে পারে। কোনও ওষুধ চলতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তি কোনদিনই অঙ্গদান করতে পারবেন না।

● **অঙ্গদান এবং মরণোত্তর দেহদান — এই দুই ভাবনার পার্থক্য কী?**

আইনগত পার্থক্য সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। কারণ অঙ্গদানের বিষয়টি পড়ে Transplantation of Human Organs Act (THOA 1994) আইনের আওতায়। মরণোত্তর দেহদান পড়ে Anatomy Act 1984-এর আওতায়।

এ তো গেল আইনের জটিলতা। খোলা মনে ভাবলে দেখা যাবে, মরণোত্তর দেহদান হল, মৃত্যুর পরের বিষয়। অর্থাৎ যেখানে হৃদস্পন্দন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা বিশেষ করে অ্যানাটমির ছাত্রছাত্রীদের মরণোত্তর দেহ হল মহার্ঘ্য বস্তু। কারণ দেহদান করেন ক'জন!

অন্যদিকে মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটে যাওয়া কোনো ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ করে অন্যের অঙ্গাংশে প্রতিস্থাপন করলে তাকে অঙ্গদান বলা হয়।

তবে এটাও জেনে রাখা ভাল, অঙ্গদানের পর কোনও দেহ স্বাস্থ্যশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায় না। শুধু গবেষণায় লাগে।

● **অঙ্গ প্রতিস্থাপন কী ?**

এক ব্যক্তির দেহ থেকে (জীবিত বা মুমূর্ষু) অঙ্গ সংগ্রহ করে অপর জীবিত ব্যক্তির দেহে বসানো হলে তাকে অঙ্গ প্রতিস্থাপন বলা হয়।

● **অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কোন কোন রোগ নিরাময় সম্ভব ?**

নীচের কিছু কিছু রোগ, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নিরাময় সম্ভব।

রোগ	অঙ্গ
হৃদযন্ত্রের সমস্যা	হৃদযন্ত্র
ফুসফুসের সমস্যা	ফুসফুস
কিডনির সমস্যা	কিডনি
যকৃতের সমস্যা	যকৃৎ

রোগ	অঙ্গ
ডায়াবেটিস	অগ্ন্যাশয়
কর্নিয়াজনিত	চোখ
হৃদযন্ত্রের ভাল্ভ সমস্যা	হৃদযন্ত্রের ভাল্ভ
ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়া	চামড়া

● **অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সম্যক ধারণা কে দেবে?**

যিনি কোনও রোগীর চিকিৎসা করছেন এবং প্রয়োজনে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি দেখবেন, সেই চিকিৎসক এবং তাঁর সঙ্গে অঙ্গ প্রতিস্থাপন কো-অর্ডিনেটর বিষয়টি ব্যবস্থা করে দেবেন। মূলত এনারাই মস্তিষ্কের মৃত্যু হওয়া কোনও ব্যক্তির বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলেন এবং সেই পরিবার অঙ্গদানে সম্মত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করেন। একই সঙ্গে তিনি ওই রোগীকে ভেন্টিলেশনে রেখে কীভাবে ওই অঙ্গগুলি সংগ্রহ করা যায়, সে বিষয়টি দেখাশোনা করেন।

● **অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়ে কোনো জীবনবিমা বা বয়ঃসীমা আছে?**

কিছুদিন আগে পর্যন্ত অঙ্গ প্রদান, সংগ্রহ এবং প্রতিস্থাপনের বিষয়টি ভারতে জীবনবিমার আওতায় ছিল না। বর্তমানে কিছু সংস্থা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে রোগীকে দেখাশোনা এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি বিমার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে বয়স এবং সুস্থ থাকা, অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর।

এরপর ক্রমেই অঙ্গদান এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের হার ভারতে বাড়তে শুরু করে। ২০১৩ সালে জাতীয় স্তরে অঙ্গদানের হার লক্ষ প্রতি ০.২৬ জন দাঁড়ায়। ২০১৫ সালের প্রাপ্ত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, মস্তিষ্কে মৃত্যুর পর অঙ্গদান বেড়ে হয়েছে, প্রতি লক্ষে ০.৫ জন।

● **দাতা এবং গ্রহীতার পরিবার কি একে অপরকে জানতে পারে ?**

যদি জীবিত ব্যক্তির দেহের যকৃতের অংশ বা অগ্ন্যাশয়ের অংশ অপর ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপিত করা হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দুটি পরিবার একে অপরকে জানতে বা পরিচিত হতে পারেন।

কিন্তু মৃত ব্যক্তির কর্নিয়া সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপন বা মস্তিষ্ক-মৃত্যুর পর অঙ্গ সংগ্রহ করে অপর ব্যক্তির দেহে অপারেশনের পর বসানো হলে, কে অঙ্গদান করলেন তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হয়। এটাই চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়ম।

তবে দুই পরিবার ইচ্ছা করলে অনেক সময়, যিনি অঙ্গপ্রাপ্তিতে উপকৃত হলেন, তাঁর লিঙ্গ এবং বয়স অপর পরিবারকে জানাতে পারেন। টিসু প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই দাতার নাম বা পরিচয় জানা যায় না।

এক্ষেত্রে অঙ্গ প্রতিস্থাপন কো-অর্ডিনেটরের একটা ভূমিকা রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে, দুই পরিবারকে যাবতীয় তথ্য দিলে, অনেক সময় চিঠিপত্রে ধন্যবাদ বিনিময় করা হয়।

● **দান-করা অঙ্গ দ্বারা কতটা সফল প্রতিস্থাপন সম্ভব ?**

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেকগুলি ফ্যাক্টর এক্ষেত্রে কাজ করে। যেমন—কিডনির ক্ষেত্রে রক্ত গ্রুপের সঙ্গে টিস্যু ম্যাচিং একটা বড়ো বিষয়। এতে অনেকটা বেশি সময় যায় এবং পদ্ধতিও জটিল।

● **দান-করা অঙ্গ কোনো বিদেশি পেতে পারেন ?**

Transplantation of Human Organ Act, 1994 অনুসারে রাজ্য — আঞ্চলিক — দেশীয় — ভারতীয় বংশোদ্ভূত—বিদেশি এভাবে পেতে পারেন।

● **প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে?**

কোনও জীবিত ব্যক্তির অঙ্গের কর্মক্ষমতা শূন্যের কাছে এনে পৌঁছলেই তাঁকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বাঁচানো যাবে এমন নয়। মোদ্দা কথা হল, এই রোগীর শরীরের যাবতীয় ইতিহাস দেখা হবে। এরপর তাঁকে জাতীয় স্তরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এমন হতে পারে, যেদিন নাম নথিভুক্ত হল, সেদিনই অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ডাক এল। আবার উল্টোটাও হতে পারে যে, দীর্ঘ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে।

আসলে অঙ্গের চাহিদা এবং যোগানে মধ্যে বিশাল পার্থক্য। অনেক ধরনের রোগীর অনেক ধরনের অঙ্গের প্রয়োজন হয়। এজন্যই মস্তিষ্কের মৃত্যু এবং অঙ্গদান দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ হচ্ছে।

● মস্তিষ্ক মৃত্যু এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সময়ের ব্যবধান

এক কথায় বলা যায়, যত দ্রুত প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়, ততই ভাল। তবে নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রতিস্থাপনের নির্দিষ্ট ও সর্বোচ্চ সময়সীমা রয়েছে। যেমন—

অঙ্গ	সর্বোচ্চ সময়
হৃদযন্ত্র	৪-৬ ঘণ্টা
ফুসফুস	৪-৮ ঘণ্টা
অন্ত্র	৬-১০ ঘণ্টা

অঙ্গ	সর্বোচ্চ সময়
যকৃত	১২-১৫ ঘণ্টা
অগ্ন্যাশয়	১২-১৪ ঘণ্টা
কিডনি	২৪-৪৮ ঘণ্টা

চিকিৎসাশাস্ত্রে মস্তিষ্ক মৃত্যু ঘোষণার পদ্ধতি

Transplantation of Human Organ Act অনুসারে হাসপাতালে ভর্তি থাকা কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্ক মৃত্যু হয়েছে কিনা বুঝতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতগুলি পদক্ষেপ নেবেন। (১) হাসপাতালের সামগ্রিক দায়িত্বে থাকা সুপার (২) যে চিকিৎসক ওই ব্যক্তির চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন (৩) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ঠিক করে দেওয়া একজন স্নায়ুবিদ্যা বিশারদ ও যকৃৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মূলত এরাই কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ পরিক্ষার পর মস্তিষ্ক মৃত্যুর ঘোষণা করেন।

কী সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা?

(১) প্রথমেই তাঁরা দেখবেন, মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ হয়েছে কেন। কী তার ইতিহাস। মাথায় কী গুরুতর চোট লেগেছে? মস্তিষ্কে টিউমার বা রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। কিংবা সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে কিনা দেখে বিস্তারিত রিপোর্ট লিখবেন এবং পরীক্ষা করবেন, মস্তিষ্কের স্টেম কোষ মৃত্যুর কারণ। একই সঙ্গে হঠাৎ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, গুরুতর মানসিক আঘাতে কিংবা মেথাকোয়ালোন-মেপ্রোবামেট-নিউরোপ্যারালাইটিক জাতীয় ওষুধ-ট্রাইক্লোরোইথিলিন ইত্যাদি জাতীয় ওষুধের প্রয়োগে যে 'ব্রেন স্টেম ডেথ' হয়নি, সেটাও নির্ধারণ করবেন।

(২) ভীষণ তীব্র আলো বা হঠাৎ আলোতেও চোখের মণি নড়াচড়া করছে কি না দেখতে হয়। কারণ মস্তিষ্ক মৃত্যু হলে সমস্ত ধরনের কর্ণিয়ার রিফ্লেক্স বন্ধ হয়ে যায়।

(৩) কোমার সঙ্গে মস্তিষ্ক মৃত্যুর পার্থক্য বুঝতে Oculo-vestibular Reflex-এর পরীক্ষা করা হয়। এই পদ্ধতিতে রোগীকে ৩০ ডিগ্রি কোণে শুইয়ে, দু-কান পরিষ্কার করে ২০-৫০ মিলিলিটার বরফ জল, কান দিয়ে প্রবেশ করানো হয় এবং দেখা হয় কোনওভাবে চোখ ওঠানামা করছে কিনা। একে Doll's Reflexও বলা হয়। কোমার ক্ষেত্রে সাধারণত ঠাণ্ডা-বরফ জলে চোখ নিচের দিকে এবং গরম জলে ওপরের দিকে উঠবে। কিন্তু মস্তিষ্ক মৃত্যুতে তা ঘটবে না।

(৪) রোগীকে কোমা এবং ভেন্টিলেশন একই সঙ্গে দুটোতেই থাকতে হবে। অর্থাৎ সমস্ত ধরনের জীবনদায়ী পদ্ধতিতে শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর চেষ্টা চলবে।

(৫) ইনজেকশন বা স্যালাইনের মাধ্যমে শরীরে কোনওভাবে অ্যাট্রোপিন ১-২ মিলিগ্রাম প্রবেশ করিয়েও দেখতে হবে, হৃদযন্ত্রের ধুকপুকানি মিনিটে ৫ বা তার বেশি বাড়ছে কিনা। মস্তিষ্ক মৃত্যু হলে এই পরীক্ষাতেও হৃদযন্ত্রের ধুকপুকানি বিন্দুমাত্র বাড়বে না।

(৬) অ্যাপনিয়া পরীক্ষা। তাপমাত্রা, শরীরে তরলের সাম্যতা এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের ব্যালান্স একটি নির্দিষ্ট সীমায় রেখে বিশেষ চিকিৎসক ওই রোগীর ভেন্টিলেশন খুলে দেবেন এবং পালস্ অক্সিমিটার জুড়ে দেবেন। এরপর ট্রাকিয়াতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন পাঠিয়ে দেখা হবে, কোনো শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা। অর্থাৎ, অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন হচ্ছে কিনা। মস্তিষ্ক মৃত্যুতে, এভাবে শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করালেও কোনো পরিবর্তন হবে না। ৬-৮ মিনিট এই পরীক্ষার পর আবার ভেন্টিলেশন চালু করে দেওয়া হবে।

ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জীর অনুপ্রেরনায় পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন এবং ট্রান্সপারেন্সি) অ্যাক্ট ২০০৭ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলাটরি কমিশন (WBCERC) তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ১৭ই মার্চ, ২০১৭-র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই সংস্থার প্রতিস্থাপন হয়। WBCERC একটি নিয়ন্ত্রক সুপারভাইসরি এবং অভিযোগ প্রতিবিধানকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি পরিষেবা প্রদানে এটি করলে অথবা প্রতিষ্ঠান চালাতে অযৌক্তিক বা অনৈতিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই কমিশনের ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা রয়েছে। এই সংস্থার হাসপাতালের অন্তবিভাগ এবং বহিবিভাগে রোগী চিকিৎসার খরচ সংক্রান্ত আইন প্রনয়নের ক্ষমতাও রয়েছে। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে রোগীকে পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা বজায় রাখে।

WBCERC-তে ১৩ জন সদস্য রয়েছে এবং এর চেয়ারপার্সন কলকাতা হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এই কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা চিকিৎসাজগত, পুলিশ এবং জনপ্রশাসনের সাথে যুক্ত।

নতুন আইনের সার কথা

- জরুরি ব্যবস্থায় রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফেরানো যাবে না।
- রোগীর মৃত্যু হলে দেহ আটকে রাখা যাবে না।
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারের কাছ থেকে চিকিৎসা ব্যয় আদায়ের ব্যবস্থা রাখতে পারবেন।
- সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রেই নানাবিধ খরচের তালিকা প্রকাশ্যে টাঙানো থাকবে।
- চিকিৎসক ও নার্স তথা সেবক-সেবিকাদের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক।
- রোগীর ক্ষতি হলে, সেই গাফিলতিতে, হেলথ রেগুলেটরি কমিশনের নির্দেশমতো ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সর্বাধিক ৬ মাসের মধ্যে দিতে হবে।
- চিকিৎসকদের কনসালটেন্সি এই আইনের আওতার বাইরে থাকবে। তবে সেখানে স্পষ্ট লিখে দিতে হবে, ডক্টরস কনসালটেন্সি।
- রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনো চিকিৎসা কেন্দ্র এই রাজ্যে চলবে না।
- রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন কর্মরত বিচারপতি বা অবসরের মাত্র কয়েক মাস বাকি, এমন বিচারপতি।
- পরিবারের অনুমতি ছাড়া ভেন্টিলেশনে দেওয়া যাবে না।
- সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালে 'গ্রিভ্যান্স সেল' চালু করতে হবে।
- ই-প্রেসক্রিপশন এবং ই-রেকর্ডস চালু করতে হবে।
- ১৩ জন সদস্য নিয়ে রেগুলেটরি কমিশন।
- রেকর্ড নষ্ট করলে জরিমানা।

অভিযোগ নিষ্পত্তি করার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

- অতি নগন্য বা বিনা শারীরিক উপস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা।
- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান/ শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান।
- ই-মেল/ এসএমএস (SMS)-এর মাধ্যমে জানানো এবং ব্যবস্থাগ্রহনের মাধ্যমে রোগীর সমস্যা দূর করা।
- উচ্চ গুণমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করা।

প্রদত্ত সুবিধা :

- বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম গুলির দ্বারা নেওয়া অতিরিক্ত বিল, চিকিৎসার গাফিলতি এবং পরিষেবা প্রদানে ত্রুটি থাকলে এখানে অভিযোগ জানিয়ে প্রতিবিধান পাওয়া সম্ভব।
- সঠিক চিকিৎসা খরচ এবং বিলিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনা।
- সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা প্রদান সুনিশ্চিত করে আরও বেশি সংখ্যক লোকের উন্নত গুনমানের চিকিৎসা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চগুণমানের পরিষেবা প্রদান এবং রোগীদের সাথে সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে ভরসা বাড়ানো।

অভিযোগগুলির অবস্থা (৩১ মে, ২০১৮ পর্যন্ত) :

প্রাপ্ত অভিযোগ : ২২২

শুনানির সংখ্যা : ১৪৭

প্রদত্ত আদেশ : ৯০

শুনানিতে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : ১৩

পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন

৩২ বি বা দী বাগ, স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১

ওয়েবসাইট : www.wbcerc.gov.on

ফোন : (০৩৩) ২২৬২৮৪৪৭

ছুটির দিন বাদে, কমিশনের অফিস, প্রতি সোম-শুক্র,
সকাল ১০টা-বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা

জেলার ক্ষেত্রে, প্রতি জেলার জেলাশাসক অভিযোগ গ্রহণ করবেন।

মা ও শিশুর কল্যাণে

‘বাংলা মাতৃপ্রকল্প’

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। সুস্থ সবল শিশু মানেই সুস্থ সবল জাতি। আর সুস্থ শিশুর জন্মের জন্য গর্ভবতী মহিলাদের সুস্থ রাখা একান্ত প্রয়োজন। একথা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের সমাজে আজও মহিলাদের স্বাস্থ্য, খাওয়াদাওয়া এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রামের দিকে নজর দেওয়া হয় না। ভারতে প্রতি তিনজন মহিলার মধ্যে একজন মহিলা অপুষ্টিতে ভোগেন। প্রতি দু’জন মহিলার মধ্যে একজন রক্তাল্পতায় ভোগেন। যে মা নিজে অপুষ্টির শিকার তাঁর পক্ষে কম জন্ম-ওজনের (low birth weight) শিশুর জন্ম দেওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। একজন শিশুর যথার্থ পুষ্টির সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে। মা যদি সঠিক পুষ্টি না পায় তাহলে গর্ভস্থ শিশু অপুষ্টিতে ভুগবে এবং জন্মের পরে সারাজীবন দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে নানা শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হবে।

মা এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই চালু হয়েছে বাংলা মাতৃ প্রকল্প। যে প্রকল্পের অধীনে গর্ভবতী মায়েদের অর্থসাহায্য করা হবে যাতে সন্তানের জন্মের আগে এবং পরে মায়েরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম এবং পুষ্টি পান। আমাদের সমাজে আর্থিক দুরবস্থার কারণে অনেক মহিলাকেই গর্ভাবস্থাতেও রোজগারের চেষ্টা করতে হয়। ঘর-গেরস্থালির কাজের পাশাপাশি, বাইরের কাজ করার ফলে তাঁরা গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পান না। আবার সন্তানের জন্মের পর, শরীরে না বইলেও তাঁরা কাজে যোগ দিতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতে 'বাংলা মাতৃপ্রকল্প' তাঁদের জন্য খুবই উপকারী হবে। এর ফলে তাঁরা নিশ্চিন্তে কাজ থেকে ছুটি নিতে পারবেন। আবার তাঁদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে না। কাজ থেকে ছুটি পাওয়ার ফলে মায়েরা যেমন সুস্থ সবল হয়ে উঠবেন, তেমনই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় পাবেন।

অর্থাৎ এই প্রকল্প মা এবং শিশু দুজনের জন্যই উপকারী। আশা করা হচ্ছে, এই প্রকল্পের সাহায্যে আমাদের রাজ্যে প্রতি বছর আট লক্ষ গর্ভবতী মহিলা উপকৃত হবেন।

বাংলা মাতৃপ্রকল্প কী?

'বাংলা মাতৃপ্রকল্প' এমন একটি প্রকল্প যাতে গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী মায়েরা সরাসরি সরকারের থেকে অর্থ সাহায্য পাবেন। তবে এই প্রকল্পের কিছু শর্ত আছে। মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করলে, প্রথম জীবিত শিশুর ক্ষেত্রে, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়ের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৫০০০ টাকা ঢুকবে।

কীভাবে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে?

- গর্ভবতী মায়ের ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসে সিঙ্গল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। এই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর লিঙ্ক করতে হবে। বাংলা মাতৃপ্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্য এএনএম অথবা আশা কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় ১৫০ দিনের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করালে প্রথম কিস্তির ১০০০ টাকা দেওয়া হবে।
- গর্ভবতী মহিলা অন্তত পক্ষে একটি প্রাক্ প্রসব পরীক্ষা করালে দ্বিতীয় কিস্তির ২০০০ টাকা গর্ভাবস্থার ১৮০ দিন বাদে পেতে পারেন।
- শিশু জন্মের নথিভুক্তিকরণ এবং শিশুর প্রথম পর্যায়ের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হলে, প্রসূতি মা তৃতীয় কিস্তির ২০০০টাকা পাবেন।
- এসসি (SC) / এসটি (ST) / বিপিএল (BPL) পরিবারভুক্ত মহিলারা জননী সুরক্ষা যোজনার সুবিধা যথারীতি পাবেন।
- তৃতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার জন্য শিশুর জন্মের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টিকাকরণ সম্পূর্ণ করতে হবে।

কারা এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন?

সব গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মা। তবে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার, সরকার-অধীনস্থ সংস্থার নিয়মিত কর্মচারী বা যাঁরা অন্য কোনও আইনে একই ধরনের সুবিধা পান, তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

যাঁরা ০১.০১.২০১৭ বা তারপরে গর্ভবতী হয়েছেন বা প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন।

MCP কার্ডে লেখা LMP ডেট অনুযায়ী গর্ভাবস্থার ডেট ও স্টেজ গণনা করা হবে।

গর্ভপাত/মৃত শিশুর ক্ষেত্রে কী হবে?

এই প্রকল্পের অধীনে কেবল একবার আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে।

গর্ভপাত/মৃত শিশুর ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট টাকা পরবর্তী গর্ভাবস্থায় পাওয়া যাবে।

শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে কী হবে?

যদি দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনও শিশুর মৃত্যু হয় এবং তার মা এই প্রকল্পের পুরো টাকা পেয়ে থাকেন, তাহলে এই প্রকল্পের অধীনে আর টাকা পাওয়া যাবে না।

গত এক (মার্চ, ২০১৮) মাসে আমাদের রাজ্যে এই প্রকল্পে ২৪ হাজার ৪৫৭ জন মহিলা উপকৃত হয়েছেন। মা এবং শিশুর কল্যাণে এই প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর আশাবাদী।

আপনি মা হতে চলেছেন?

যাঁরা এইচআইভি আক্রান্ত, তাঁরা যাতে নিজের জীবন সুরক্ষিত রাখতে ও সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারেন, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাপনা সরকারি হাসপাতালে পাওয়া যায়।

একটি সুন্দর রোগমুক্ত ফুটফুটে শিশুর জন্ম দেওয়াটা নিশ্চয়ই আপনার স্বপ্ন। আপনি নিশ্চয়ই আপনার নাম নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নথিভুক্ত করিয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই রক্তচাপ, রক্তে হিমোগ্লোবিন আর সুগারের মাত্রা দেখে নিয়েছেন। প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের পরীক্ষাও করিয়েছেন। টিটেনাসের টিকাও নিশ্চয়ই নিয়েছেন। **কিন্তু শিশুর শরীরে এইচআইভি ও সিফিলিসের মতো রোগ প্রতিরোধের জন্য, নিজের পরীক্ষা করিয়েছেন কি?**

যদি না করে থাকেন, নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবশ্যই নিজের এইচআইভি ও সিফিলিসের পরীক্ষা করান এবং নিজের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত হোন। আপনার শিশুর স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করুন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সন্তানকে উপযুক্ত প্রতিষেধক (নেভারপিন) যথাযথ সময়ে দেওয়া সম্ভব।

যাঁরা এইচআইভি ও সিফিলিস আক্রান্ত নন, তাঁরা নিকটবর্তী হাসপাতালের আইসিটিসি বা সুরক্ষা ক্লিনিকে গিয়ে জেনে নিন কী করে ভবিষ্যতেও নিজেকে এইচআইভি ও সিফিলিস-মুক্ত রাখা যায়।

যাঁরা এইচআইভি আক্রান্ত, তাঁরা যাতে নিজের জীবন সুরক্ষিত রাখতে ও সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারেন, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাপনা সরকারি হাসপাতালে পাওয়া যায়।

এইচআইভি আক্রান্ত জানতে পারলে, আপনি সত্বর এআরটি সেন্টারে যোগাযোগ করুন। এখানে বিনা খরচে সারা জীবনের জন্য এআরটি ওষুধ দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক অসুবিধার জন্য যথাযথ পরামর্শদান করা হয়।

মনে রাখবেন, তাড়াতাড়ি এআরটি শুরু করলে ও নিয়মিত এআরটি ওষুধ খেলেই আপনি নিজেও সুস্থ থাকবেন আর সন্তানের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুলাংশে কমে যাওয়া সম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সন্তানকে উপযুক্ত প্রতিষেধক (নেভারপিন) যথাযথ সময়ে দেওয়া সম্ভব। এই প্রতিষেধক জন্ম থেকে ন্যূনতম ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত দেওয়া দরকার। জন্মের পর প্রথম ছয়মাস শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সন্তানের বয়স যখন ছয় সপ্তাহ, তখন বাচ্চাকে অন্যান্য নিয়মমাফিক টিকাকরণের ব্যবস্থা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালের মধ্যে মায়ের থেকে সন্তানের এইচআইভি ও সিফিলিসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

গর্ভবতী মহিলার দেহ থেকে সন্তানের দেহে

এইচ আই ভি সংক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে বাংলা

ডাঃ সুমন গাঙ্গুলী

পি পি টি সি টি কনসালট্যান্ট, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এড্‌স্‌ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা

গর্ভবতী মহিলাদের এইচ.আই.ভি. পরীক্ষার ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গে গত দু-বছরে চোখে পড়ার মতো উন্নতি হয়েছে। আমাদের রাজ্য, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং ভিলেজ হেল্‌থ নিউট্রিশন ডে-তে গর্ভবতী মহিলাদের এইচ.আই.ভি. পরীক্ষা করার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প আজ দৃষ্টান্তমূলকভাবে সাফল্য লাভ করেছে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিও এখন এটি অনুসরণ করছে। প্রাথমিকভাব ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার (আই.সি.টি.সি)-গুলিতেই এইচ.আই.ভি. পরীক্ষা করা হত। গর্ভবতী মহিলারা এখানে এলে তবেই এইচ.আই.ভি. পরীক্ষা করা হত। কিন্তু এর ফলে গর্ভবতী মহিলাদের মাত্র ৪০%কে এই পরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হত। ২০১০ সালে বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্তরে এইচ.আই.ভি. পরীক্ষা শুরু হয়।

প্রাথমিক সাফল্যের পরেও ন্যাকো থেকে কিটের জোগান কম থাকায় প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। পরীক্ষার কিট সাপ্লাই পুনরায় শুরু হলে ২০১২ সালে প্রকল্পটি আবার চালু হয়। এই দফায় আরও তিনটি জেলায় প্রকল্প শুরু করা হয়, যার ফলে ১০% বেশি গর্ভবতী মহিলাকে পরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়। ২০১৫-১৬ সালের শেষে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আর্থিক সাহায্য এবং স্টেট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ব্যুরোর টেকনিকাল সহায়তায় সারা রাজ্যব্যাপী এই প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পে গর্ভবতী মহিলার পরীক্ষার হার, ২০১৫-১৬-তে যা ছিল ৫০%, তা ২০১৬-১৭-তে বেড়ে ৮৭% হয়। ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষে এটি আরও বেড়ে ৯৯.২% হয়। এই কর্মসূচি অনুযায়ী ভিলেজ হেল্‌থ অ্যান্ড নিউট্রিশন ডে-তে এ. এন. এম.-রা এই পরীক্ষা করেন এবং আর.সি.এইচ. রেজিস্টার ও মাদার চাইল্ড প্রোটেকশন কার্ডে এর বিবরণ নথিভুক্ত থাকে। দূরবর্তী এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য রাজ্য

ভিডিওতে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা এবং প্রকল্পের উন্নতির জন্য কড়া নজরদারির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

বেসরকারি স্তরে গর্ভবতী মহিলাদের এইচ. আই. ভি. পরীক্ষার তথ্য নথিভুক্ত করা এবং নজরদারির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। WBSAP & CS-এর উদ্যোগে ৮৫০টিরও বেশি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাদের পরিষেবা দিচ্ছে এবং রিপোর্ট করছে। এখনো পর্যন্ত ৫টি নার্সিংহোমে, এইচ. আই. ভি. পজিটিভ গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব হয়েছে। বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভবতী মহিলাদের এইচ. আই. ভি. পরীক্ষার রিপোর্ট করার জন্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা একটি সারকুলার জারি

সূচক	২০১৪-১৫ তথ্য	২০১৫-১৬ তথ্য	২০১৬-১৭ তথ্য	২০১৭-১৮ তথ্য
মোট নথিভুক্ত গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা	১৮,৪১,০৯০	১৭,৫৭,৬২২	১৭,৪৯,৪৪৩	১৬,৬৬,১৯৬
এইচ. আই. ভি. পরীক্ষা হওয়া গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা	৮,৮০,৩৫৯	৮,৮৯,০০৭	১৫,২৫,২৮৩	১৬,৫৩,১৬৫
পরীক্ষার হার %	৪৭.৮২	৫০.৫৮	৮৭.১৯	৯৯.২২

করেছেন। বেসরকারি চিকিৎসকদের জন্য রাজ্যস্তরে একটি PPTCT সংক্রান্ত আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে।

আমাদের রাজ্য NUHM পরিকাঠামোর মধ্যেও গর্ভবতী মহিলাদের এইচ. আই. ভি. পরীক্ষা চালু করেছে। সম্প্রতি, উত্তর ২৪-পরগনার আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টারে এইচ. আই. ভি. পরীক্ষা চালু হয়েছে, যার উদ্দেশ্য সারা রাজ্যে এই ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া।

এখানে ফার্স্ট টিয়ার এইচ. আই. ভি. সুপারভাইজার পরীক্ষা করবেন। তারপর এইচ. আই. ভি. রিঅ্যাকটিভ গর্ভবতী মহিলাদের নিকটবর্তী আই. সি. টি. সি. কেন্দ্রে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া হবে। রাজ্য সরকার সারা রাজ্য জুড়ে NUHM-এর মেটারনিটি হোমে এই পরীক্ষা পরিষেবা চালু করেছে।

এইভাবে গর্ভাবস্থায় একজন মহিলা যে যে জায়গায় যাবে, তার সবকটিতেই এইচ. আই. ভি. পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে যে কোনো জায়গা থেকেই এই সুবিধা পাওয়া যায়।

রাজ্য সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল, SNCU এবং নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে (NRC) ভর্তি হওয়া যে শিশুদের এইচ. আই. ভি.-র মতো লক্ষণ দেখা যায় তাদের এইচ. আই. ভি. আক্রান্ত শিশুকে চিহ্নিত করা এবং তার জীবনধারণের ব্যবস্থা করা এবং তার বাবা-মার এইচ. আই. ভি. পরীক্ষা করা।

এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে।

এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার PPTCT নিয়ে প্রচার করছে রেডিও, লিফলেট, পোস্টার, ব্যানারের মাধ্যমে। এইসব কিছুই করা হচ্ছে ২০২০ সালের মধ্যে শিশুদের মধ্যে এইচ. আই. ভি. নির্মূল করার লক্ষ্যে।

বর্তমানে মায়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল প্রকল্প যেমন PMSMA (প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান)-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল PPTCT; গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত পুস্তিকা 'আমি মা হতে চলেছি'-তেও এইচ. আই. ভি. পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে।

PPTCT-র ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর কিছু উদ্ভাবন, রাজ্যের সাফল্যে অনেক সাহায্য করেছে। এস. এম. এস.-ভিত্তিক লজিস্টিক ব্যবস্থা, প্রকল্পের সুষ্ঠু প্রয়োগে বিভিন্ন সাহায্য করেছে। এস. এম. এস.-এর মাধ্যমে এইচ. আই. ভি. আক্রান্ত মহিলাদের বার্তা পাঠানোর ফলে তাদের বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা শক্তিশালী হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ একটি সফ্‌টওয়্যার তৈরি করেছে, যার সাহায্যে পজিটিভ গর্ভবতী মহিলাদের এবং তাঁদের সন্তানদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং সময়ে সময়ে উপভোক্তা এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের এস. এম. এস. পাঠানো হচ্ছে, যাতে তাঁরা সঠিক সময়ে পরিষেবা পেতে পারেন।

২০১৭-১৮-তে ৯৯.২% গর্ভবতী মহিলার এইচ. আই. ভি. পরীক্ষা করা হয়েছে। ৪৩০ জন গর্ভবতীর রিপোর্ট পজিটিভ পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৩০৯ জন নতুন করে আক্রান্ত। এইচ. আই. ভি. আক্রান্তের হার ০.০৩%, এর মধ্যে ৯৭.১%-কে এ. আর. টি. (অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি) দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান রিপোর্ট অনুযায়ী, এইচ. আই. ভি. আক্রান্ত মায়ের থেকে শিশুর সংক্রমণের হার ৫ শতাংশের কম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ অন্য রাজ্যদের থেকে যথেষ্ট এগিয়ে আছে এবং শিশুদের মধ্যে এইচ. আই. ভি. দূরীকরণ প্রকল্পে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে।

এইভাবে রাজ্য সরকার ২০২০ সালের মধ্যে শিশুদের এইচ. আই. ভি. নির্মূল করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

সাপ্তাহিক আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সম্পূরণ প্রকল্প

[Weekly Iron & Folic Acid Supplementation
Programme for Adolescents (WIFS)]

আমাদের রাজ্য-সহ ভারতের ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ রক্তাল্পতায় ভোগেন। আর ৪০ শতাংশেরও বেশি প্রাক্-বিদ্যালয় শিশু রক্তাল্পতার শিকার। ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কিশোরী এবং ৪০ শতাংশ কিশোর রক্তাল্পতা নিয়ে বড়ো হচ্ছে আমাদের দেশে। দেশে মাতৃ-মৃত্যুর ২০ শতাংশেরও বেশি অবদান এই রক্তাল্পতারই।

রক্তাল্পতা

কিশোরীদের ক্ষেত্রে - < ১১ গ্রাম/১০০ মিলিলিটার ও কিশোরদের ক্ষেত্রে - < ১২ গ্রাম/১০০ মিলিলিটার, রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা থাকলে তা রক্তাল্পতার লক্ষণ।

রক্তাল্পতার কারণ

মূল কারণগুলি হল –

(১) বাল্যাবস্থা থেকে কৈশোরে উত্তরণের সময় অতিরিক্ত মাত্রায় আয়রন ও ফলিক অ্যাসিডের চাহিদা।

(২) চাহিদার তুলনায় খাবারের অপ্রতুল জোগান।

(৩) ক্রিমিজনিত রক্তক্ষরণ।

(৪) কিশোরীদের ক্ষেত্রে মাসিক রজক্ষরণ

(৫) কিশোরী অবস্থায় মাতৃত্ব (ভয়ঙ্কর রক্তাল্পতার কারণ)।

রক্তাল্পতার ফল

(১) শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা হ্রাস।

(২) দুর্বল শারীরিক গঠন।

(৩) অপরিপক্ক ও দুর্বল মানসিক গঠন।

(৪) কিশোরী মায়ের রক্তাল্পতার জন্য, সময়ের আগেই প্রসবের প্রবণতা বাড়ে ও কম ওজনের শিশুর জন্ম হয়।

রক্তাল্পতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন একটি প্রকল্পের

সময়ের প্রয়োজনে গর্ভবতী মায়েদের জন্য আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ির সংস্থান আমাদের দেশে অনেকদিন আগেই শুরু হয়। তা সত্ত্বেও রক্তাল্পতা হেতু মাতৃ-মৃত্যুর সংখ্যার বড়ো বেশি হেরফের ঘটানো যায়নি।

এই ধ্রুব সত্যকে মান্যতা দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের জন্য এই 'সাপ্তাহিক আয়রন ও ফলিক

অ্যাসিড সম্পূরণ প্রকল্প'। কারণ, এরাই ভবিষ্যতের মা ও বাবা। এদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে পারলে এরাই ভবিষ্যতের সুস্থ মা ও বাবা হতে পারবে। রক্তাল্পতাহেতু মাতৃ-মৃত্যু এবং নবজাতকের মৃত্যুমিছিল হ্রাস করা যাবে।

আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সম্পূরণ প্রকল্প (WIFS)

(১) এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, দেশের সকল কিশোর-কিশোরীদের এর আওতায় আনা।

(২) স্কুলের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল কিশোর-কিশোরীদের ও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে নথিভুক্ত সকল স্কুলছুট কিশোরীদের সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে (সোমবার) একটি করে 'আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি' (নীল রঙের) সেবন করানো।

(৩) স্কুলে শিক্ষক ও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে অঙ্গনওয়ারি কর্মীগণ প্রতি শনিবার প্রতিটি কিশোর/কিশোরীকে একটি করে 'আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি' (নীল রঙের) সেবন করাবেন ও মাসান্তে নির্দিষ্ট ফর্মে নিজ নিজ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন।

কেন কিশোর-কিশোরীদের জন্য 'আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সম্পূরণ প্রকল্প' (WIFS)

কারণ,

(১) আমাদের দেশে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কিশোরী এবং ৪০ শতাংশ কিশোর রক্তাল্পতায় ভোগে।

(২) ২০ শতাংশেরও বেশি মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয় আর এদের মধ্যে ১৬%-এরও বেশি সন্তান ধারণ করেন।

(৩) দেশে মাতৃ-মৃত্যুর ২০ শতাংশেরও বেশি অবদান এই রক্তাল্পতারই।

প্রকল্পের লক্ষ্য

(১) বংশানুক্রমিক রক্তাল্পতার প্রবণতা কমানো এবং মানব সম্পদের উৎকর্ষতা বাড়ানো।

(২) কিশোর-কিশোরীদের (১০-১৯ বছর) রক্তাল্পতার প্রবণতা কমানো এবং তজ্জনিত মাতৃ ও শিশু-মৃত্যু হ্রাস।

(৩) শরীরে লৌহভাবজনিত রক্তাল্পতা কমানোর জন্য সকল কিশোর-কিশোরীদের স্কুল ও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে 'আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি' সেবন করানো।

(৪) কৃমিঘটিত রক্তাল্পতা রোধে, বছরে দুবার কৃমিনাশক বড়ি সেবন করানো (স্কুল ও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে) [Biannual Albendazole (400 mg) for de-worming (NDD)]

'আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড' (নীল রঙের) এবং 'অ্যালবেনডাজোলের' মাত্রা

- আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি (নীল রঙের) : আয়রন-১০০ মিলিগ্রাম, ফলিক অ্যাসিড-৫০০ মাইক্রোগ্রাম।
- অ্যালবেনডাজোল – ৪০০ মিলিগ্রাম।

'আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড' (নীল রঙের) এবং 'অ্যালবেনডাজোল'-এর সেবনের নিয়ম

(১) বড়ি দুটি কখনই খালি পেটে খাওয়া যাবে না।

(২) বড়ি দুটি সবসময়ই ভরা-পেটে খেতে হবে (খাবারের সঙ্গে খেলে ভালো, অন্তত পক্ষে খাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে)।

(৩) এই বড়ি দুটি সেবনে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই কম (নেই বললেই চলে)।

(৪) খুব কম ক্ষেত্রেই গা গোলানো, হালকা মাথাধরা, কালো পায়খানা, ঈষৎ কোষ্ঠকাঠিন্য—এইসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

প্রকল্পের পরিচালনা

- স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নারী ও শিশু কল্যাণ—এই তিনটি দপ্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় WIFS প্রকল্পটি পরিচালিত হয়।

প্রকল্পের যৌথ কাঠামো

- **স্বাস্থ্য দপ্তর :** প্রকল্প তৈরি, উইফস, অ্যালবেনডাজোল বড়ি ও ফর্মের জোগান। প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান।
- **শিক্ষা এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর :** প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণ ও প্রতিবেদন প্রদান।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নারী ও শিশু কল্যাণ এই তিন দপ্তরের যৌথ দায়িত্ব

স্বাস্থ্য দপ্তর :

(১) প্রকল্পের নিয়মাবলি ও কারিগরি সহায়তা।

(২) আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি (নীল রঙের) ও অ্যালবেনডাজোল বড়ির জোগান।

(৩) সহযোগী দপ্তরের নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রশিক্ষণ, প্রকল্পের কাজের যৌথ তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও পরামর্শপ্রদান।

(৪) নিয়মিত 'কনভারজেন্স' মিটিং-এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

শিক্ষা দপ্তর :

(১) প্রতি সোমবার (উইফস-ডে) স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল কিশোর-কিশোরীদের 'উইফস' বড়ি খাওয়াবেন ও বছরে ২-বার অ্যালবেনডাজোল বড়ি খাওয়াবেন।

(২) নোডাল শিক্ষক/শিক্ষিকা তথ্য সংরক্ষণ করবেন ও মাসান্তে নির্দিষ্ট ফর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন।

(৩) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'উইফস' বড়ি ও ফর্ম সংগ্রহ করবেন।

(৪) এসআই ও ডিআই গণ নিজ নিজ স্তরের 'কনভারেজন্স' মিটিং-এ যোগদান ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

(৫) প্রকল্পের কাজের তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও পরামর্শপ্রদান।

নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর :

(১) অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে অঙ্গনওয়ারি কর্মীগণ প্রতি শনিবার (উইফস ডে) ১০ থেকে ১৯ বছরের সকল স্কুলছুট কিশোরীদের 'উইফস' বড়ি খাওয়াবেন ও বছরে ২বার অ্যালবেনডাজোল (ক্রিমিনাশক) বড়ি খাওয়াবেন।

(২) নির্দিষ্ট ফর্মে তথ্য সংরক্ষণ করবেন ও মাসান্তে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন।

(৩) ডিপিও এবং সিডিপিও নিজ নিজ স্তরের 'কনভারজেন্স' মিটিং-এ যোগদান ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন এবং প্রকল্পের কাজের তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

জোগান সরবরাহের হিসাব

(ক) স্কুলের জন্য :

(১) আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি (নীল রঙের) [১ বছরের জন্য] [(ষষ্ঠ থকে দ্বাদশ শ্রেণির সকল কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা + সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা) x ৫২] + ২০ শতাংশ অতিরিক্ত (বাফার)।

(২) জাতীয় কৃমিনাশক দিবসের জন্য অ্যালবেনডাজোল বড়ি [১ বছরে ২-রাউন্ডের জন্য] [ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সকল কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা x ৫২] + ১০ শতাংশ অতিরিক্ত (বাফার)।

(খ) অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের জন্য :

(১) আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি (নীল রঙের) [১ বছরের জন্য] [(১০-১৯ বছরের সকল স্কুলছুট কিশোরীর সংখ্যা x ৫২) + ৫২] + ২০ শতাংশ অতিরিক্ত (বাফার)।

(২) জাতীয় কৃমিনাশক দিবসের জন্য অ্যালবেনডাজোল বড়ি [১ বছরে ২-রাউন্ডের জন্য] [(১০-১৯ বছরের সকল স্কুলছুট কিশোরীর সংখ্যা x ৫২) + ১০ শতাংশ অতিরিক্ত (বাফার)।

প্রকল্প-প্রতিবন্ধকতা রোধে কী কী করতে হবে

(ক) প্রয়োজনীয় রসদের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ

(১) আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি (নীল রঙের)।

(২) জাতীয় কৃমিনাশক দিবসের জন্য অ্যালবেনডাজোল বড়ি।

(৩) প্রতিবেদনের ফর্ম।

(খ) অভিসৃতি সভা (কনভারজেন্স মিটিং) ও অংশগ্রহণ

(১) স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের নিজের নিজের দায়বদ্ধতা অনুসারে সম্মিলিতভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল করবেন।

(২) দায়বদ্ধ প্রত্যেকেই 'কনভারজেন্স' মিটিং-এ যোগদান ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

(গ) জনসংযোগ

(১) 'উইফস' প্রকল্প নিবিড় জনসংযোগের উপর নির্ভরশীল।

(২) সংবাদমাধ্যম সম্প্রচার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

(৩) স্থানীয়ভাবে স্থানীয়-ভাষায় অনূদিত পোস্টার, প্রাচীরপত্র, প্রচারপত্র ইত্যাদি জনসংযোগের শক্তিশালী মাধ্যম।

(৪) জনসমাজে সভা, সমিতি, সেমিনার এবং স্কুলে ক্যুইজ/পোস্টার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি খুবই উপযোগী মাধ্যম।

ডাঃ ভূষণ চক্রবর্তী
সহ-অধীক্ষক (স্কুল হেল্‌থ)

[লেখাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত *'সবার জন্য স্বাস্থ্য'*, আগস্ট ২০১৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত]

গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ‘ওয়েটিং হাট’— পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি উদ্ভাবনী পদক্ষেপ

সুন্দরবনের তিনটি নদীবেষ্টিত ব্লকে বাড়িতে প্রসবের হার ৬৩%-৮৭% ছিল এবং এখানকার মহিলারা খুব কম ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষিত নার্স-এর সহযোগিতায় বাচ্চা প্রসবের সুযোগ পেতেন। এই কারণে রাজ্য সরকার গর্ভবতী মহিলাদের জন্য হাসপাতাল চত্বরে ‘ওয়েটিং হাট’ তৈরির পরিকল্পনা করেছে।

স্বাস্থ্যসূচকের অন্যতম দিক নির্দেশক—মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব প্রভৃতি নির্ধারণে মাতৃত্বকালীন জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপলব্ধতা এবং ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত সাবধানতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ) পশ্চিমবঙ্গে ২০১০-১২ সালে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার (MMR) ছিল ১১৭, ২০১৪-১৬ সালে (SRS ২০১৮) সেটি কমে হয়েছে ১০১। এই রাজ্যে ২০১১-১২ সালে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ছিল ৭২%, ২০১৭-১৮ (HMIS তথ্য) সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৫%। পরিকাঠামোর বুনিয়াদি সূচকগুলির উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলের গর্ভবতী মহিলাদের কাছে সন্তান প্রসবের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং জটিল সমস্যাগুলির সময়মতো তদারকি করা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা খুবই প্রকট সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীবেষ্টিত দ্বীপ—গোসাবা, পাথরপ্রতিমা এবং সন্দেশখালি -২ অঞ্চল গুলিতে যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার এখনো খুব কম। এই সব অঞ্চলের বেশিরভাগ প্রসব এখনো অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীমায়েদের হাতে হয়ে থাকে, যার ফলে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং রোগ খুব বেশি।

আ) গর্ভবতী মহিলাদের জন্য 'ওয়েটিং হাট' নির্মাণ : উপরি উল্লিখিত সুন্দরবনের তিনটি নদীবেষ্টিত ব্লকে বাড়িতে প্রসবের হার ৬৩%-৮৭% ছিল এবং এখানকার মহিলারা খুব কম ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষিত নার্স-এর সহযোগিতায় বাচ্চা প্রসবের সুযোগ পেতেন। এই কারণে রাজ্য সরকার গর্ভবতী মহিলাদের জন্য হাসপাতাল চত্বরে 'ওয়েটিং হাট' তৈরির পরিকল্পনা করেছে।

ই) গর্ভবতী মহিলাদের জন্য 'ওয়েটিং হাট' নির্মাণের উদ্দেশ্য : রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বাড়ানো এবং গর্ভবতী মহিলাদের সময়মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

ঈ) ভাবনায় বৈচিত্র্য : ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতাল, দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের গোসাবা গ্রামীণ হাসপাতাল এবং বসিরহাট স্বাস্থ্যজেলার সন্দেশখালি -২ ব্লকের খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে এই 'ওয়েটিং হাট' তৈরি করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে শতাধিক দ্বীপ রয়েছে যেগুলি ছোটো-বড়ো নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই নদীগুলি বর্ষায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাওয়ার মূল ভরসা হল সাধারণ নৌকা বা যন্ত্রচালিত নৌকা। বেশিরভাগ দ্বীপেই সন্ধের পর নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাতের দিকে নৌকায় চলাচল বিপজ্জনক হলেও জরুরি প্রয়োজনে এই দ্বীপবাসীদের হাতে-প্রাণ-রেখে তা করতে হয়।

উ) 'ওয়েটিং হাট'-এর দ্বারা গর্ভবতী মহিলারা কীভাবে উপকৃত হতে পারেন : গর্ভবতী মহিলাদের – বিশেষত যাদের ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে- তাদের চিকিৎসা প্রদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়াবার জন্য 'ওয়েটিং হাট'-এর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সন্তান প্রসবের ৭—১০ দিন আগে থেকেই গর্ভবতী মহিলাদের ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে 'ওয়েটিং হাট'-এ

রাখা হয়। 'ওয়েটিং হাট'-এ থাকার সময় গর্ভবতী মহিলাদের বিনামূল্যে ওষুধ, খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা প্রদান করা হয়। বাচ্চা প্রসবের সময় হলে গর্ভবতী মহিলাকে গ্রামীণ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

পি.পি.পি. প্রণালীতে কার্যকারিতা

এই তিনটি গ্রামীণ হাসপাতালের ভিতর একটি ভবনের মধ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলছে এবং সেগুলি 'ওয়েটিং হাট' হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈরি। 'ওয়েটিং হাট'গুলিতে বিকল্প বিদ্যুতের জোগান দেওয়ার জন্য 'ইনভার্টার'-ও বসানো হয়েছে। এগুলির পরিচালন-ভার ইতিমধ্যেই 'বেসরকারি সহযোগী' (Private Partner)–দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই 'ওয়েটিং হাট'-গুলি পরিচালনের জন্য তারা আর্থিক সহায়তাও পেয়ে থাকে।

- **নদীবেষ্টিত ৩টি ব্লকে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা**

  আরো বেশি সংখ্যক গর্ভবতী মহিলাদের 'ওয়েটিং হাটে' আসার জন্য উৎসাহিত করতে সরকারের তরফ থেকে তাদের 'ওয়েটিং হাট'-এ আসার খরচও দিয়ে দেওয়া হয়।

- **আশাব্যঞ্জক সাড়া**

  ৩টি 'ওয়েটিং হাট' জুন, ২০১৬ থেকে কার্যকরী রয়েছে এবং এগুলি প্রায় সারা বছরই ভর্তি থাকে।

আগামীর লক্ষ্য

প্রাথমিক সাফল্যের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার – রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকায় আরো ৯ (নয়)টি 'ওয়েটিং হাট' ছাড়াও রাজ্যের আরো ৮টি জায়গায় – চাকুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতাল, রতুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তেঘড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ফারাক্কা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহিষাদল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শক্তিপুর

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র – গর্ভবতী মহিলাদের জন্য 'ওয়েটিং হাট' নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

- **এই প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল :-**

  তৈরি হওয়ার পর থেকে এখনো প্রায় ৩০০০ মহিলা এই পরিষেবা ব্যবহার করেছেন এবং এর ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বেড়েছে।

  আশা করা যায়, আগামী দিনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধিতে 'ওয়েটিং হাট' বিশেষ সহায়ক হবে। এর পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং নিরাপদ মাতৃত্ব সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এটি বড়ো ভূমিকা নিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গম এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের জন্য 'কমিউনিটি ডেলিভারি সেন্টার' (CDC)

- স্বাস্থ্যসূচকের অন্যতম দিক নির্দেশক – মাতৃত্বকালীন মৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি প্রভৃতি নির্ধারণে মাতৃত্বকালীন জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপলব্ধতা এবং ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত সাবধানতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গে ২০১০-১২ সালে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার (MMR) ছিল ১১৭, ২০১৪-১৬ সালে (SRS ২০১৮) সেটি কমে হয়েছে ১০১। রাজ্যে ২০১১—১২ সালে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ছিল ৭২%, ২০১৭-২০১৮ (HMIS তথ্য) সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৫%।

- সুন্দরবন এলাকায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে শতাধিক দ্বীপ রয়েছে যেগুলি ছোটো-বড়ো নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই নদীগুলি বর্ষায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাওয়ার মূল ভরসা হল সাধারণ নৌকা বা যন্ত্রচালিত নৌকা। বেশিরভাগ দ্বীপেই সন্ধের পর নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাতের দিকে নৌকায় চলাচল বিপজ্জনক হলেও জরুরি প্রয়োজনে এই দ্বীপবাসীদের হাতে-প্রাণ-রেখে তা করতে হয়।

- একই রকম উত্তরবঙ্গের মালবাজার এবং কালচিনি এলাকার চা-বাগান এলাকার কিছু অংশে রয়েছে

দুর্গম অঞ্চলগুলি দুর্গমতার জন্য। ওই অঞ্চলের গর্ভবতী মহিলাদের সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য অপ্রশিক্ষিত ধাত্রী মায়েদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হত। এর ফলে মাতৃত্বকালীন অসুস্থতা এবং মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটত।

- কমিউনিটি ডেলিভারি সেন্টার (CDC) তৈরির উদ্দেশ্য—সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গের দুর্গম চা বাগান এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়ানো এবং গর্ভাবস্থার জটিল সমস্যাগুলির সমাধান।

পিপিপি পদ্ধতিতে 'কমিউনিটি ডেলিভারি সেন্টার'-এর (CDC) পরিচালনায় দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনে এবং উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকায় নিম্নলিখিত ১৪টি সিডিসি, পিপিপি পদ্ধতিতে চালু রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি সিডিসি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

ক্রমিক নং	জেলা	ব্লক	সিডিসি-র স্থান
১	বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা	হিজলগঞ্জ	দুলদুলি, বৈলানি, গোবিন্দমাটি
২		সন্দেশখালি-২	জেলা পরিষদ ভবন, মণিপুর, বয়েরমারি
৩	ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলা	পাথরপ্রতিমা	রাখালপুর, হেরম্বগোপালপুর, শ্রীনারায়ণপুর, সুমদাময়ী সেবা সদন
৪		কাকদ্বীপ	জুমায় নস্কর
৫	জলপাইগুড়ি	মাল	ডামডিম টি এস্টেট, রুঙ্গা মুক্তি এস্টেট
৬	আলিপুরদুয়ার	কুমারগ্রাম	রায়ডাক টি এস্টেট

বাছাই করা NGO/ বেসরকারি অংশীদারেরা নিজেদের পরিকাঠামো ব্যবহার করে সিডিসি-তে প্রসবকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। সাধারণ প্রসবের সময় প্রয়োজনীয় ডাক্তার এবং নার্স এরাই সরবরাহ করে থাকে। যে সংস্থা সিডিসি টি চালাচ্ছেন সরকার থেকে তাকে এই সিডিসি-তে হওয়া প্রত্যেক প্রসবের জন্য ৫০০০ টাকা দিয়ে থাকে।

- গর্ভবতী মহিলারা কীভাবে CDC দ্বারা উপকৃত হন : যে সমস্ত গর্ভবতী মহিলা গর্ভাবস্থার সময় চিকিৎসার জন্য সিডিসি-তে যান তারা জননী ও শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন যেমন—বিনামূল্যে ডাক্তারি পরামর্শ, বিনামূল্যে ওষুধ, বিনামূল্যে খাবার এবং রোগীকে রেফার করা হলে বাড়ি থেকে সেই হাসপাতাল পর্যন্ত যাতায়াতের খরচও পেয়ে থাকেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মায়েদের শিশুর জন্ম দিতে যাতে কোনো খরচ না হয় তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। যে সমস্ত গর্ভবতী মহিলা জননী সুরক্ষা যোজনা-এর সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত তাদেরকে সেটা দেওয়া হয়।

- সিডিসি-র সাফল্য :

  এই ১৪টি সিডিসি-তে প্রতি বছর গড়ে ৪০০০—৫০০০ প্রসূতির স্বাভাবিক প্রসব হয়ে থাকে।

- সিডিসি চালু হওয়ার সম্ভাব্য প্রভাব :

  সিডিসি চালু হবার পর থেকে ইতিমধ্যেই ৩২,০০০ গর্ভবতী মহিলা এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। সিডিসি-নিরাপদ মাতৃত্ব সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়েছে। ভবিষ্যতে এটি এম এম আর এবং আই এম আর কমাতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। এইভাবে প্রসূতি ও শিশুর মত্যুহার হ্রাস পাবে।

সংক্ষেপে সিডিসি-র সাফল্য

জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার জন্য 'মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট' (MMU) :

জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবনের যে সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকার স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানকার জনগোষ্ঠীকে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডিসেম্বর ২০১১/জানুয়ারি ২০১২ সালে 'মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট' পরিষেবা চালু করা হয়।

লক্ষ্য :

জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকা, নদীঘেরা সুন্দরবন এবং উত্তরবঙ্গের বন্ধ রুগ্‌ণ চা-বাগান শ্রমিকদের বাড়িতেই স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

মোবাইল মেডিক্যাল টিম

প্রত্যেক 'মোবাইল মেডিক্যাল টিম'-এ থাকে

১) একজন এম বি বি এস ডাক্তার

২) একজন জে এন এম/এ এন এম নার্স

৩) একজন ফার্মাসিস্ট

৪) একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান

৫) একজন এক্স-রে টেকনিশিয়ান

- মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবা :

এম এম ইউ সপ্তাহে ৬ দিন, ৬টি ভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রত্যেকদিন কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা করে হয়। সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্যালয় (GPHQSC) অথবা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম এম ইউ শিবিরগুলি হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি এম এম ইউ-র মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে।

১) প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য (RCH) পরিষেবা :

- ANMI, স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রেরিত বা নিজে থেকেই শিবিরে উপস্থিত হওয়া মা এবং শিশুকে বিনামূল্যে ডাক্তারি পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া শিশুর জন্মের আগে ও পরে মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হয়।
- ছোটোবেলার সাধারণ অসুখ—যেমন, ডায়রিয়া, এ আর আই/নিউমোনিয়া প্রভৃতির চিকিৎসাও এখানে করা হয়।
- আর টি আই/এস টি আই-এর চিকিৎসা এবং পরামর্শদান।
- বয়ঃসন্ধিক্ষণের মেয়েদের এবং যে মহিলারা মা হতে চলেছেন তাদের পরামর্শদান।
- পরিবার পরিকল্পনা (CC & OP) বিষয়ে পরামর্শদান।

২) রোগ নিরাময়কারী পরিষেবা :

- স্বাস্থ্য শিবিরে আসা সমস্ত মানুষের ছোটোখাটো অসুখের চিকিৎসা। টিবি, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, শরীরে আয়রন ঘাটতি, এস টি আই/আর টি আই, বয়ঃসন্ধিকালের অ্যানিমিয়া, গর্ভাবস্থার সমস্যা, অসুস্থ নবজাতক, ডায়রিয়া, গুরুতর পুষ্টির অভাব প্রভৃতির দ্রুত চিহ্নিতকরণ এবং অন্যান্য স্থানীয় সংক্রামক অসুখ, অসংক্রামক অসুখ যেমন—উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং চোখের ছানির চিকিৎসা।
- জটিল সমস্যা রেফার করে দেওয়া।

৩) রোগ নির্ণয় :

- TC, DC, ESR, হিমোগ্লোবিন, রুটিন ইউরিন, মল প্রভৃতি পরীক্ষার সুবিধা এখানে পাওয়া যায়।
- ম্যালেরিয়ার এবং যৌনাঙ্গে ট্রাইকোমোনাস সংক্রমণ আটকানোর জন্য মলম (smear)।
- এক্স-রে।

জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকা, উত্তরবঙ্গ এবং নদীঘেরা সুন্দরবন এলাকায় বর্তমানে ৪৯টি এম এম ইউ কার্যকর রয়েছে।

গত ৩ বছরে এম এম ইউ গুলির সাফল্য :

ক্রমিক নং	অর্থবর্ষ	অনুষ্ঠিত শিবির	মোট আগত রোগী	মোট ল্যাব পরীক্ষার সংখ্যা	মোট এক্স-রে করা হয়েছে
১	২০১৭-১৮	১৫,৩৭৩	১,৭০,১০,০০০	২,১২,৩৮১	৫২,২৫৮
২	২০১৬-১৭	১৭,১৮৫	১৯,৮৭,২৩০	২,২৭,২০৬	৫৬,২৭০
৩	২০১৫-১৬	১১,৫৪৭	১৩,৬১,৫১১	১,২৮,১৫৮	৩৩,২৯৬

প্রতিবেদন সৌজন্য: আইইসি ডিভিশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট

রাজ্যের যেসব দুর্গম এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছয় না, সেইসব এলাকার বাসিন্দাদের জন্য ডিসেম্বর ২০১১/জানুয়ারি ২০১২ থেকে ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্যপরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিম

প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিমে থাকবেন :

১) একজন এম বি বি এস

২) একজন জি এন এম /এ এন এম (নার্স)

৩) একজন ফার্মাসিস্ট

৪) একজন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং

৫) একজন এক্স-রে টেকনিশিয়ান

ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট কী কী পরিষেবা দেয়

১) প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য :

- এ এন এম অথবা স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা মা ও শিশুকে ক্যাম্পে পাঠান। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষ নিজে থেকেও ক্যাম্পে আসেন। ক্যাম্পের চিকিৎসকরা তাঁদের প্রজনন ও শিশুর যত্ন প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দেন।
- ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি শৈশবের সাধারণ রোগের চিকিৎসা করা হয়।
- আর টি আই/এস টি আই-এর চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং করা হয়।

- বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরী এবং প্রজননক্ষম বয়সের মহিলাদের চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং করা হয়।
- অস্থায়ী পদ্ধতিতে পরিবার পরিকল্পনা করা হয়।

২) রোগ নিরাময়কারী পরিষেবা :

- মেডিক্যাল ক্যাম্পে যারা আসবে তাদের ছোটখাটো অসুস্থতার চিকিৎসা করা।
- টিবি, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কম আয়োডিন, আর.টি.আই./এস.টি.আই., বয়ঃসন্ধিকালে রক্তাল্পতা, গর্ভপাতের ঝুঁকি, অসুস্থ নবজাতক, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, হাইপারটেনশন, ডায়াবিটিস, ছানি প্রভৃতি রোগের দ্রুত চিহ্নিতকরণ।
- জটিল রোগের ক্ষেত্রে রেফার করা।

৩) রোগ নির্ণয়

- টি সি, ডি সি, ই এস আর, হিমোগ্লোবিন, মূত্র, মল প্রভৃতি পরীক্ষা।
- এক্স-রে

ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটের সূচি :

ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটগুলি সপ্তাহের ৬ দিনে ৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে যাবে এবং দিনে অন্তত ৬ ঘণ্টা কাজ করবে।

ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটগুলির ভৌগোলিক এলাকা :

- বর্তমানে সুন্দরবনের নদীতীরবর্তী এলাকা, জঙ্গলমহল, ডুয়ার্স ও দার্জিলিংয়ের বন্ধ/রুগ্‌ণ চা বাগান এবং মালদা ও উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় ৫২টি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট কাজ করছে।

প্রতিবেদন সৌজন্য : আইইসি ডিভিশন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আশা

স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সক্রিয় সেতু

গ্রামের মানুষের কাছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে অ্যাক্রেডিটেড সোশ্যাল হেল্‌থ অ্যাকটিভিস্ট বা আশা (ASHA) কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচির অধীনে ASHA হলেন স্বেচ্ছাসেবী, যাঁরা জনগোষ্ঠী এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার মধ্যে সেতুর কাজ করছেন। ২০০১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে প্রতি ১০০০ জনসংখ্যাপিছু ১ জন ASHA থাকবেন। প্রত্যেক ASHA ৮০০—১২০০ জনকে পরিষেবা দেন। ২০০৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে ২২টি ব্লক, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৮টি ব্লক, তৃতীয় পর্যায়ে ৭৫টি ব্লক, চতুর্থ পর্যায়ে ১০০টি ব্লক এবং পঞ্চম পর্যায়ে ৯৮টি ব্লককে কর্মসূচির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালানো হয়েছে এমন ১১৫টি ব্লককে প্রথম চারটি পর্যায়ের অন্তর্গত করা হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে মোট ৬১,০০৮ জন ASHA নিয়োগ করার কথা। যার মধ্যে ৫৪,৪১৪ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বাকি পদগুলির জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে।

আশা (ASHA)-র ভূমিকা এবং তাঁর কাজ

আশা (ASHA) একজন বিবাহিতা/বিবাহবিচ্ছিন্না অথবা বিধবা মহিলা যিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবী যিনি জনগোষ্ঠী ও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করছেন। এইক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পরিষেবা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ নেই। ASHA-র মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের বাড়িতেও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়েছে। একজন সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে তাঁর গ্রামের জনগোষ্ঠীর উন্নততর সুস্থ জীবনের জন্য ASHA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে। তাছাড়াও তাঁরা দরিদ্র ও অনগ্রসর মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা সচেতনতা গড়ে তোলার কাজটি করেন।

আশা (ASHA)-র কাজের মধ্যে থাকে প্রধানত ছ-টি বিষয়—

(১) গ্রামস্তরে মিটিংয়ের আয়োজন করা

(২) বাড়িতে বাড়িতে ভিজিট করা

(৩) সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভিজিট করা

(৪) ভিলেজ হেল্‌থ অ্যান্ড নিউট্রিশন ডে (VHND)-তে অংশগ্রহণ করা

(৫) গর্ভবতী মহিলাদের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ও ভর্তি করানো এবং

(৬) পরিষেবার রেকর্ড বজায় রাখা

ASHA মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে ভূমিকা পালন করেন তার মধ্যে আছে—

- ১২ সপ্তাহের মধ্যে ANM দ্বারা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অথবা ভিলেজ হেল্‌থ অ্যান্ড নিউট্রিশন ডে (VHND)-তে গর্ভবতী মহিলার নাম নথিভুক্তকরণ চিহ্নিত করা।
- নিজের এলাকায় নথিভুক্ত সব গর্ভবতী মহিলার সম্পূর্ণ গর্ভকালীন পরিষেবা নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের জন্য গর্ভবতী মহিলাদের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া।
- মাতৃমৃত্যুর ব্যাপারে ANM-কে জানানো (স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মৃত্যু ছাড়া)।
- নবজাতকদের ৪২ দিন পর্যন্ত দেখা (বাড়িতে প্রসবের ক্ষেত্রে ১ম দিন, ৩য় দিন, ১৪তম দিন, ২১তম দিন, ২৮তম দিন ও ৪২তম দিন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের ক্ষেত্রে ৩য় দিন, ১৪তম দিন, ২১তম দিন, ২৮তম দিন ও ৪২তম দিন।)
- একবছরের মধ্যে সমস্ত শিশুর প্রাথমিক টিকাকরণ সম্পূর্ণকরণ নিশ্চিত করা।
- ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে শিশুদের টিকাকরণ সম্পূর্ণকরণ নিশ্চিত করা।
- সক্ষম দম্পতিদের বিয়ের অন্তত দু-বছর পরে গর্ভধারণ করা।
- সক্ষম দম্পতিদের কাউন্সেলিং করে ১ম ও ২য় সন্তানের মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান নিশ্চিত করা।
- কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা।

আশা (ASHA)-দের প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্য পরিষেবায় ASHA-দের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তাঁদের কয়েক দফা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় ধাপে ধাপে দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়ানোর কাজে এই প্রশিক্ষণ তাঁদের সাহায্য করে। প্রশিক্ষণের শেষে ASHA বাড়িতে নবজাতকদের পরিষেবা দেওয়ার দক্ষতা অর্জন করেন। স্বাস্থ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করা তাঁদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আশা (ASHA) কর্মসূচির সাফল্য

পশ্চিমবঙ্গে মাতৃমৃত্যুর হার ১০১ (২০১২-র SRS অনুযায়ী), শিশুমৃত্যুর হার ২৫ (২০১৭-র সেপ্টেম্বরের SRS অনুযায়ী), সম্পূর্ণ টিকাকরণের হার ৮০%। (২০১২-১৩-র DLHS-4 অনুযায়ী) এই সূচকগুলিই বলে দেয় অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি ASHA-দের অবদানের ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় কত উন্নতি হয়েছে।

আশা (ASHA)-দের সাইকেল বিতরণ

দূরবর্তী এলাকায় স্বাস্থ্যপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার ২৩টি ব্লকে ১৯৯৩ জন ASHA-কে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য জুড়ে ৪৫,২৯৯ জন ASHA-কে সাইকেল দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা ধার্য ছিল।

মাসিক কাজের ভিত্তিতে উৎসাহভাতা ও সাম্মানিক বেতন

আশা (ASHA)-রা প্রতিটি কাজের ভিত্তিতে উৎসাহভাতা পান। এছাড়াও তাঁরা প্রতি মাসে স্থায়ী সাম্মানিক হিসাবে ২০০০ টাকা পান। ২০১৩ সালে ওই সাম্মানিক ছিল ১৩০০ টাকা। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেটে ASHA-দের স্থায়ী সাম্মানিক বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব

সংখ্যালঘু, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির প্রতিনিধিত্ব এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ASHA-দের নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখা হয়, তিনি যেন স্থানীয় মহিলা হন এবং কর্মক্ষেত্রের প্রধান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। এর ফলে মুসলিম তপশিলি জাতি/উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেই জনগোষ্ঠীর মহিলারাই নির্বাচিত হন।

ASHA কর্মসূচি এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন

ASHA কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হল মহিলাদের ক্ষমতায়ন। বাধ্যতামূলক আবাসিক প্রশিক্ষণের পর একজন ASHA আর্থিক উপার্জনে সক্ষম হন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন যে তাঁরাও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সংসারের জন্য কিছু অবদান রাখতে পারেন। এই উপলব্ধিই তাঁদের ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অধিকাংশ মহিলাই, ASHA হিসাবে পরিবারে এবং পরিবারের বাইরে আরো বেশি সম্মান পান, কারণ তাঁরা আর্থিক উপার্জনে সক্ষম। বর্তমানে ASHA-দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁরা নিজেরাই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করছেন, যা তাঁদের ক্ষমতায়নের পথকে আরও সুগম করেছে।

লেখাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'সবার জন্য স্বাস্থ্য', জুন, ২০১৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ এবং পশ্চিমবঙ্গে FSSA আইন, ২০০৬ বলবৎকরণ

সাফল্য এবং সাম্প্রতিক সময়ে নেওয়া কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ :

'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্টান্ডার্ডস অ্যাক্ট' FSSA, ২০০৬ অনুসারে প্রবর্তিত আইন এবং বিধিগুলি এই রাজ্যে ২০১১ সালের আগষ্ট মাস থেকে চালু হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য খাদ্যদ্রব্য তৈরির বিজ্ঞানসম্মত বিধি সুনিশ্চিত করা। এই আইন প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সরকারি পদগুলিও পূরণ করা হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের লাইসেন্স প্রদান এবং নথিভুক্তকরণ—

- সব জেলাতেই 'অনলাইন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান এবং নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের প্রথম ৬টি রাজ্যর মধ্যে অন্যতম যারা তাদের :
- ই-ট্রেজারি (e-treasury/payment gateway –GRIPS) FSSAI-এর-'ফুড লাইসেন্সিং অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম' (FLRS)-এর সঙ্গে যুক্ত করছে।
- ৩১ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত – ১.৮৬ লক্ষ 'ফুড বিজনেস অপারেটর' (FBO) তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছে। গত বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে নথিভুক্তকরণের সংখ্যা ৬১.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে ৮ম স্থান অধিকার করেছে।
- FBO-র আবেদন করলে তাঁদের আবেদন যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুরাহা হয় সেটিও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

নমুনা সংগ্রহ, নজরদারি এবং পরিদর্শন

- নিয়মিত খাদ্যদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষা করে, তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
- FBO গুলি নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়, সেগুলি

যথেষ্ট পরিষ্কার এবং অন্যান্য বিধি মেনে চলছে কিনা জানার জন্য।

- সচেতনতা বাড়াতে এবং নথিভুক্তহীন FBO গুলির নথিভুক্তকরণের জন্য কলকাতা পৌরনিগম এলাকায় নির্দিষ্ট বাজারভিত্তিক নজরদারি চালানো হয়।
- কোনো একটি বিশেষ পণ্যের সংবেদনশীলতা এবং আশু প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে পণ্যভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেওয়া হয়।

মাছে ফর্মালিন ব্যবহার

- মাছে ফর্মালিন ব্যবহারের খবর আসতেই কলকাতার ১১টি গুরুত্বপূর্ণ বাজার থেকে ২০১৮-র জুলাই মাসে মাছের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কোনো নমুনাতেই ফর্মালিন পাওয়া যায়নি।

খাদ্য পরীক্ষাগার

- পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরি বর্তমানে NABL-এর মান্যতা পেয়েছে। পূর্ব ভারতে সরকার পরিচালিত এটিই সম্ভবত একমাত্র ল্যাবরেটরি যার এই ধরনের মান্যতা রয়েছে।
- উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির প্রয়োজনে শিলিগুড়িতে আঞ্চলিক 'ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি' তৈরি করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এটি কাজ শুরু করেছে।
- WBPHL অন্তর্গত 'ফুড মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি'-র মানোন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।
- অকুস্থলেই খাদ্যদ্রব্যের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি কলকাতা পৌরনিগমকে প্রদান করা হয়েছে।

প্রচার এবং প্রশিক্ষণ

- এই উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'ফুড সেফটি' সংক্রান্ত পোস্টার ও হোর্ডিং টাঙানো হয়েছে। FSSAI আইন নিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সচেতন করতে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিধাননগর পৌরনিগম সম্প্রতি FBO-দের জন্য নথিভুক্তকরণ ক্যাম্পও করেছে।
- FSS-আইন, ২০০৬-এর ৭০ নং ধারা অনুসারে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ 'ফুড সেফটি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল' গঠন করা হয়েছে। অফিসার নিয়োগ করে এখানে নিয়মিত শুনানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রতিবেদন সৌজন্য: আইইসি ডিভিশন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গে পুর স্বাস্থ্য মিশন

শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে অত্যন্ত দ্রুত এবং বিপুল আকারে হচ্ছে, তা লক্ষণীয়। ১৯০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে শহুরে জনসংখ্যা ছিল ১২.২ শতাংশ সেখানে ২০১১ সালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.৮৭ শতাংশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ২০১৩ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অংশ হিসাবে শুরু হল জাতীয় পুর স্বাস্থ্য মিশনের (NUHM) ক্রিয়াকলাপ।

NUHM-এর মূল উদ্দেশ্য হল উচ্চ মানের এবং সুষম প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। শহরাঞ্চলের বাসিন্দা বিশেষত বস্তিবাসী এবং অন্যান্য বিপন্ন মানুষ (যেমন কাগজকুড়ানি, ভিক্ষুক, গৃহহীন, বৃদ্ধ, অসংগঠিত কর্মী, দিনমজুর, রিকশাচালক, যৌনকর্মী ইত্যাদি)-দের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং যতদূর সম্ভব তাদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছিয়ে তাদের স্বাস্থ্যের মান উন্নত করাই এই মিশনের অন্যতম লক্ষ্য।

জাতীয় পুর স্বাস্থ্য মিশন স্থানীয় পৌরনিগম ও পৌরসভার দ্বারা রূপায়িত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭টি পৌরনিগম এবং ৮২টি পুরসভা এই (NUHM)-এর ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করছেন। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর পুর স্বাস্থ্য মিশন-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে আছেন। প্রতিটি শহরের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তাকে মান্য করে NUHM-এর একটি পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

পুর প্রাথমিক—স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Urban Primary Health Centre)

প্রতি ৩০ থেকে ৫০ হাজার জনসংখ্যাপিছু একটি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকবে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বড়ো শহরের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ভিড় বাড়বে না। পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সাধারণত বস্তি বা বস্তিসদৃশ এলাকার মাঝখানে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

এখানে যে যে পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যায়, সেগুলো হল—

- বহির্বিভাগে চিকিৎসা
- রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত, মল-মূত্র সহ অন্যান্য প্রাথমিক পরীক্ষা
- ওষুধ ও জন্মনিরোধক সরবরাহ
- মা ও শিশুর টিকাকরণ

- ডায়াবেটিস, রক্তচাপসহ অসংক্রামক রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা
- মহামারি রোধে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং
- যথাসম্ভব গ্রহীতার দোরগোড়ার স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া

একটি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে যে কর্মী থাকবেন তারা হলেন—

- দুজন ডাক্তার (একজন Full Time ও একজন Part Time)
- দুজন নার্স
- একজন ফার্মাসিস্ট
- একজন ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান
- ৪-৫ জন ANM (প্রতি ১০০০০-এ একজন ANM)
- একজন ক্লার্ক
- একজন গ্রুপ-ডি কর্মী

উল্লেখযোগ্য হল, এখানে কোনো অন্তর্বিভাগীয় পরিষেবা প্রদান করা হয় না।

Urban Community Health Centre—

যেসব শহরে বা নগরে ৫ লাখের বেশি জনসংখ্যা, সেখানে প্রতি আড়াই লাখের জনসংখ্যার জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করা হবে। এই হাসপাতালগুলিতে ৩০-৫০টি বেডের ব্যবস্থা থাকবে। যেখানে অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসা দেওয়া হবে।

মাতৃসদন (Maternity Home)—

এছাড়া পৌরনিগম বা পৌরসভা দ্বারা চালু থাকা মাতৃসদনগুলিকে উন্নত করাও NUHM-এর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির (Special Outreach Camp)—

জাতীয় পুর স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে প্রতি UPHC-তে

প্রতিমাসে ৩টি করে দূরবর্তী অঞ্চলে শিবির করা হয়।

যে এলাকায় যে বিশেষ রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার প্রয়োজন বা যে রোগের চিকিৎসার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তার ওপর শিবির-এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

যে এলাকার সমস্যা নিয়ে ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে, শিবিরটি সেই এলাকার মধ্যে গিয়ে আয়োজন করতে হবে। প্রয়োজনে কোনো বিশেষ শ্রেণির লোকেদের নিয়েও একটি বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা যেতে পারে। যেমন—বরিষ্ঠ নাগরিক, নিকাশি কর্মী বা যারা কাগজ কুড়ানি তাদের নিয়ে চর্মরোগ পরীক্ষা ও চিকিৎসা শিবির। কোনো এলাকায় প্রয়োজনে সচেতনতা শিবিরও আয়োজন করা যেতে পারে।

পুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস (Urban Health & Nutrition Day)—

বস্তিবাসী ও অন্যান্য বিপন্ন নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের সঙ্গে একযোগে পুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিভাগ আয়োজন করা হয়। UHND-তে মূলত টিকাকরণ ও শিশুর পরিপূরক পুষ্টি সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়া হয়। নবজাতকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। অন্যদিকে ০-৬ বছরের বয়সী শিশুদের বৃদ্ধির ওপর

নজর রাখা হয়। অপুষ্টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। মায়েদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুষ্টি সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়া হয়।

এছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়—

স্তন্যপান, শিশুর পরিপূরক খাদ্য, প্রাক্-প্রসব ও প্রসবের কালে মায়ের খাদ্য, ডায়ারিয়া, শ্বাসকষ্ট, শিশুর বৃদ্ধি, বয়ঃসন্ধির কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

যেহেতু NUHM হল NHM-এর অন্তর্গত একটি উপ-মিশন, তাই সমস্ত জাতীয় কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে শহর বা নগরগুলিতে। যেমন—Vector Borne Diseases Control Programme, NCDs, RNTCP, NPPCD, PCPNDT, Comprehensive Abortion Care ইত্যাদি।

জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করার জন্য এই মুহূর্তে Honorary Health Worker (HHW) আছেন। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করেন। প্রতি ২০০-৫০০ পরিবারপিছু ১ জন থাকতে হবে। আর তাদের কাজের দেখভাল করার জন্য First Tier Supervisor (FTS) আছেন।

এছাড়াও NUHM-এ রয়েছে মহিলা আরোগ্য সমিতি (MAS)। MAS জনগোষ্ঠীর স্তরে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যা সমাজের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকল্পনা নেয় ও তা রূপায়ণ করে। এখনো অবধি ৮৪২১টি MAS তৈরি হয়েছে এবং তাদের ট্রেনিং চলছে।

২০—১০০ পরিবারপিছু ১টি MAS থাকবে। MAS হল একজন চেয়ারপার্সন ও একজন সদস্যসচিব সহ স্থানীয় মহিলাদের দল। বস্তি অঞ্চলের বা অন্যান্য বিপন্ন জনগোষ্ঠী অঞ্চলের নানা স্থানীয় বিষয় যেমন—স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জল ও শৌচালয় ও অন্যান্য সামাজিক নির্ধারকগুলির ওপর MAS নজর রাখবে।

'MAS' জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর অধীনে এমন একটি জরুরি উদ্যোগ যার লক্ষ্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ পরিকল্পনা গ্রহণে, রূপায়ণে এবং পর্যবেক্ষণে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে বাড়ানো। বস্তি অঞ্চলের বা অন্যান্য বিপন্ন জনগোষ্ঠীর নানা সামাজিক নির্ধারক যেমন—স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জল ও শৌচব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে 'MAS' যৌথভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্তর থেকে 'স্থানীয় যৌথ অংশগ্রহণ' ক্রমশ স্বাস্থ্য পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণে বিশেষ সাহায্য করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সুষম প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সুপেয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচব্যবস্থা, আবাসন, প্রাথমিক শিক্ষা তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিকেও সমন্বিত করলে পুরস্বাস্থ্য মিশনের লক্ষ্য সম্পূর্ণত সাধিত হবে। সকল পুরসভা এই লক্ষ্যেই তাঁদের উদ্যোগে বিস্তৃত করবেন, এই আশা ব্যক্ত হোক।

লেখাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' জুলাই, ২০১৮ থেকে পুনর্মুদ্রিত

থ্যালাসেমিয়া
প্রয়োজন প্রতিরোধ

থ্যালাসেমিয়া একটি জিনঘটিত জন্মগত রোগ। জিনের অস্বাভাবিকতা থেকে এই রোগের ফলে রোগীর দেহে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় এবং রোগী রক্তাল্পতায় ভোগেন।

থ্যালাসেমিয়া জিন বহনকারী ব্যক্তিকে 'carrier' বা 'বাহক' বলা হয়। থ্যালাসেমিয়া জিন বহনকারী ব্যক্তি বা 'বাহক' সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনধারণ করতে পারেন। তবে দুজন 'বাহক'-এর মধ্যে বিয়ে হলে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি থ্যালাসেমিয়ার 'বাহক' হন তবে তাদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মানোর সম্ভাবনা থেকে যায়।

আমাদের রাজ্যে প্রতি ১০ জন নাগরিকের মধ্যে ১ জন থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। কোনো সহজ পদ্ধতিতে এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় না। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনতা এই রোগ প্রতিরোধে অনেকাংশে সহায়ক হতে পারে।

থ্যালাসেমিয়া রোগের উপসর্গ :

- রক্তাল্পতার জন্য শিশুর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
- জন্ডিস
- ক্লান্তি এবং ঘুমঘুম ভাব
- খিদে না হওয়া
- বুকে ব্যাথা
- শ্বাসকষ্ট
- বয়স অনুযায়ী সঠিক বৃদ্ধি না হওয়া
- দ্রুত হৃদস্পন্দন
- হাড়ের ক্ষয় বা বিকৃতি
- প্লীহা বড় হওয়ার কারণে পেট বড় দেখানো।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের উপায় :

দু'জন থ্যালাসেমিয়া জিনের 'বাহক'-এর বিয়ে হলে তাদের সন্তানের কেবলমাত্র এই রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই বিয়ের আগে কেবল কোষ্ঠী বিচার না করে, রক্ত পরীক্ষা করে অবশ্যই জেনে নিন আপনি থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা। থ্যালাসেমিয়ার বাহক সম্পূর্ণ সুস্থ। তাই বাহক নির্ণয়ে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আপনি থ্যালাসেমিয়ার 'বাহক' না হলে নির্ভয়ে একজন 'বাহক'কে বিয়ে করতে পারেন—এক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়া

রোগাক্রান্ত শিশু জন্মানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পাত্র-পাত্রী দুজনেই যদি থ্যালাসেমিয়ার 'বাহক' হন, সেক্ষেত্রে তাদের বিয়ে না করাই শ্রেয়। কারণ এদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা :

এই রোগের মূল চিকিৎসা হল রক্ত সঞ্চালন (blood transfusion) এবং বিশেষ এক প্রকার ওষুধ। এর সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত শিশুকে ফলিক অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়াম দেওয়া হয়। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে আয়রন ট্যাবলেট খাইয়ে কোনো লাভ হয় না বরং এতে রোগীর ক্ষতি হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তকে পুরোপুরি সুস্থ করতে বলে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনই (Bone Marrow Transplant) একমাত্র চিকিৎসা। বর্তমানে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জন্য অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন কেবলমাত্র কলকাতায় অবস্থিত দুটি নোডাল সেন্টারে করা হয়ে থাকে—

১. আইএইচটিএম কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

২. নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে প্রতিবছর ৮ই মে 'বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস' পালিত হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবছর ওই দিনটিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়। পদযাত্রা, শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে নাটক, রক্তদান শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে দিনটিতে পালিত হয়।

থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়তে বিয়ের আগে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করান। আপনার সচেতনতাই এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার।

রাজ্যের থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির নাম :

১. আই.এইচ.টি.এম., কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
২. নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
৩. আর.জি.কর. মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
৪. কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
৫. স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতা
৬. আইপিজিএমইআর–এসএসকেএম হাসপাতাল, কলকাতা
৭. বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
৮. বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
৯. মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
১০. মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
১১. নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
১২. এম.জে.এন. জেলা হাসপাতাল, কোচবিহার জেলা
১৩. জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল
১৪. বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল, দক্ষিণ দিনাজপুর
১৫. তমলুক জেলা হাসপাতাল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা
১৬. নদিয়া জেলা হাসপাতাল
১৭. সিউড়ি জেলা হাসপাতাল, বীরভূম
১৮. দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতাল, পুরুলিয়া
১৯. হুগলি জেলা হাসপাতাল
২০. ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
২১. উলুবেড়িয়া সাব-ডিভিশন হাসপাতাল, হাওড়া
২২. বারাসাত জেলা হাসপাতাল, উত্তর চব্বিশ পরগনা।

লেখাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত
'সবার জন্য স্বাস্থ্য' জুন, ২০১৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

সর্পাঘাত

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের যে কয়েকটি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তার অন্যতম হল সাপে কাটা ও তার চিকিৎসা। জনসাধারণের মধ্যে নানা ভ্রান্ত ধারণার জন্য এখনো সাপের কামড়ের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা যা মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে তা সবসময় নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এদেশে প্রত্যেক বছর প্রায় ৩৫,০০০-৫০,০০০ মানুষ মারা যায় সাপের কামড়ে। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রে সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশি।

এখনও সব সাপে কাটা রোগী প্রথমে হাসপাতালে না এসে ওঝা, গুণিনের কাছে যায়। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে রোগীদের গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কয়েক ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় নষ্ট হয়।

ভারতে ২৫০ প্রজাতির সাপ আছে, তার মধ্যে ৫২টি প্রজাতির সাপ বিষধর। পশ্চিমবঙ্গে কে বলমাত্র ৬টি প্রজাতির বিষধর সাপ পাওয়া যায় যার মধ্যে তিনটি প্রজাতি ৯৯% সাপের কামড়ে মৃত্যুর জন্য দায়ী।

বিষধর সাপে কাটা রোগীর প্রথম ১০০ মিনিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চন্দ্রবোড়া সাপে কাটলে যদি দেরি করে এভিএস দেওয়া হয় তার কিডিনির সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যেহেতু সাপে কাটা ঘটনা সবচেয়ে বেশি গ্রামাঞ্চলে ঘটে সেজন্য গ্রামীণ হাসপাতালেই যত শীঘ্র সম্ভব এভিএস দিতে হবে। এজন্য ওই সমস্ত হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের এই চিকিৎসার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন।

সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় সাপটি চেনা অপরিহার্য নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাপটি চেনা সম্ভব হয় না।

সাপের বিষক্রিয়ার লক্ষণ — বিষধর সাপের কামড়ে জায়গাটা ফুলে যাবে, ব্যথা হবে এবং ফোলা ক্রমশই বাড়তে থাকে। কামড়ের দাগের সংখ্যা দিয়ে বিষক্রিয়ার পরিমাণ বোঝা যায় না। কালাচের কামড়ে কোনো ব্যথা বা ফোলা হয় না। কাঁকড়া বিছের হুলেও তীব্র ব্যথা হয় কিন্তু ফোলা হয়ই বললে চলে।

বিষ ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ—

- ক্রমবর্ধমান ফোলাই প্রধান লক্ষণ।
- চোখের পাতা পড়ে আসবে।
- রোগী চোখে ঝাপসা দেখবে।
- রোগী ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়বে।
- কথা জড়িয়ে যাবে।
- গলা বন্ধ হয়ে যাবে।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তপাত হয়ে থাকে। যেমন—রক্ত প্রস্রাব, মাড়িতে রক্তপাত ইত্যাদি হতে পারে। প্রস্রাবের পরিমাণ কমতে থাকে, এমনকি একেবারে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। প্রচণ্ড পেটের ব্যথা হতে পারে।

নার্ভবিষ ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ—

- শিবনেত্র বা Ptosis—চোখের পাতা ঢুলে আসে।
- ফণাধর সাপের কামড়ে ৩০ মিনিটের মধ্যে শুরু হয়।
- কালাচ সাপের ক্ষেত্রে ২ থেকে ২৪ ঘণ্টাও লাগে।

নিওস্টিগমিন কালাচের কামড়ে কাজ করে না। কোবরার কামড়ে কাজ করে। কালাচ সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে এট্রপিন ও নিওস্টিনমিন ইনজেকশন কাজ করে না। এক্ষেত্রে ইনজেকশন ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট (Calcium gluconate) এভিএসের সঙ্গে দেওয়া হলে ভালো ফল দেয়। সাধারণত নিউরোপ্যারালিসিস ৫-৭ দিনে সেরে যায়।

কি করা উচিত—

- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে যাওয়া প্রয়োজন।

- রোগীকে শান্ত থাকতে বলতে হবে। অযথা আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই।
- কোনো বাঁধা জিনিস যেমন—চুড়ি, হাতঘড়ি খুলতে হবে।
- কামড়ের জায়গাটি যতটা সম্ভব স্থির রাখতে হবে।
- সম্ভব হলে স্প্লিন্ট ব্যবহার করে নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে।
- ডাক্তারবাবুকে সব খুলে বলুন।
- সাপে কামড়েছে না অন্য কিছু।
- যদি সাপেই কামড়ায় সেটি বিষধর না বিষহীন সাপ, যদি কেউ সাপ দেখে থাকেন।
- বিষের প্রতিক্রিয়ায় রোগীর কী কী রোগলক্ষণ দেখা দিচ্ছে।
- পথে আসার সময় কামড়ের জায়গায় ফোলা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ঠিক কত সময় আগে রোগী বলছেন যে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। কত সময় পর্যন্ত কথা বলত পেরেছেন।

কি করা উচিত নয়—

- কোনওরকম বাঁধন বা ব্যান্ড লাগানো উচিত নয়।
- বরফ লাগাবেন না। এতে টিস্যুর ক্ষতি হতে পারে।
- গরম সেঁক দেওয়া উচিৎ নয়।
- পেটে বিষ বার করার চেষ্টা করা উচিত নয়।
- টেনে বা পাম্প করে বিষ বার করার চেষ্টা করবেন না।
- কামড়ের জায়গায় কোনোরকম ছোপ বা কেমিক্যাল লাগাবেন না।
- জায়গাটা পোড়ানোর চেষ্টা করবেন না।
- রোগী নিজে দৌড়ে বা সাইকেল চালিয়ে হাসপাতালে আসবেন না। যদি গাড়ি না পাওয়া যায় মোটর সাইকেলে চাপিয়ে সঙ্গে একজন রোগীকে ধরে নিয়ে হাসপাতালে আসতে হবে।

সাপে কাটার আধুনিক চিকিৎসা—

বর্তমানে সাপের কামড়ের চিকিৎসার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য 'সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ'। মানে রোগের লক্ষণ দেখে চিকিৎসার পদ্ধতি মেনে চলা হয়। এতে সাপটি চেনা জরুরি নয়।

আগে সাপে কাটা রোগী অযথা জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হত। বর্তমানে গ্রামীণ সমস্ত ডাক্তারদের প্রতি বছরই সর্পাঘাতের চিকিৎসার ব্যাপারে নিয়মিত ট্রেনিং এবং এই ব্যাপারে পুস্তিকা দেওয়া হচ্ছে। ফলে গ্রামীণ হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তাররাই সর্পাঘতের উপযুক্ত চিকিৎসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই করতে পারছেন। অযথা রেফার করা হচ্ছে না। সাপ বা সন্দেহজনক কিছু কামড়ালে সেই রোগীকে চিকিৎসা করা দরকার যে বিষয়ে একটি ফ্লো চার্ট তৈরি করা হয়েছে। ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় এই চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই সহজ। এই ফ্লো চার্ট একটি ৬ ফুট বাই ৪ ফুট বোর্ড আকারে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে টাঙানো থাকে।

এছাড়া সর্পাঘাতের চিকিৎসার জন্য যাদের ডায়ালিসিস এবং বিশেষ ভেন্টিলেশন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তারও ব্যবস্থা অনেক মেডিক্যাল কলেজ, জেলা হাসপাতাল এবং সদর হাসপাতালে উপলব্ধ আছে। পশ্চিমবঙ্গে ডায়ালিসিস ৩৪টি হাসপাতালে, এইচ ডি ইউনিট (HDU)-২৪টি সদর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (SDH) এবং সি·সি· ইউনিট (CCU)-৪১টি বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপলব্ধ।

সাপের কামড়ের একমাত্র জীবনদায়ী ওষুধ এভিএস যা ঘোড়ার সেরাম থেকে তৈরি। তাই এর থেকে

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এইজন্য এভিএস যুক্ত স্যালাইন চলবার সময় সতর্ক নজর রাখতে হবে।

বর্তমানে এভিএস চালুর আগে ১/৪ মিমি অ্যাড্রেনালিন চামড়ার তলায় দিয়ে দেওয়া হয়। যদি কোনোরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার লক্ষণ চোখে পড়লেই সিরিঞ্জে টানা অর্ধেক (0.5 ml)-আই এম (পেশিতে) দিতে হবে। এই সময় স্যালাইন সাময়িক বন্ধ রাখতে হয়। ৭-৮ মিনিটের মধ্যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া চলে যায়।

মনে রাখতে হবে—

বিষের লক্ষণ হিসাবে কোথাও সাপ চেনা কিংবা কামড়ে দাগ দেখা অর্থহীন। প্রথম ১০টি এভিএস দেওয়ার সময় কোন জাতীয় সাপ বা কী জাতীয় বিষ তা জানার দরকার নেই। সবক্ষেত্রে একই চিকিৎসা এমনকি শিশুদের ক্ষেত্রেও ওই ১০টি এভিএস দিতে হয়।

কোনো অবস্থাতেই ১০টি এভিএস না দিয়ে কোনো রোগীকে রেফার করা যাবে না। এভিএস দেওয়া হলে সেই রোগীকে অবশ্যই ৪৮ ঘণ্টা ভর্তি রাখতে হবে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় কিনা দেখার জন্য। একমাত্র প্রচুর ফোলা বা পচন থাকলেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে, অবশ্যই প্রথম ডোজ এভিএস (১০টি) দেওয়ার পর।

এভিএস রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালেই বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

ফণাযুক্ত সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য এখন প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও হাসপাতালে অ্যাট্রোসিন এবং নিওস্টিগমিন ইনজেকশন উপলব্ধ।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে বাঁধন কোনো উপকার করে না। চন্দ্রবোড়া কামড়ের পর শক্ত বাধনের জন্য বহু ক্ষেত্রে রোগী প্রাণে বাঁচলেও হাত-পা পচনের জন্য কেটে ফেলতে হয়েছে বা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সাপে কাটা আটকানোর উপায় :

কয়েকটি বিশেষ সাবধানতা

(১) মেঝেতে না ঘুমিয়ে অন্তত একটা দড়ির খাটিয়ায় রাত্রে ঘুমানো আর মেঝেতে ঘুমালেও রাত্রে মশারির ভেতর ঘুমালে বিশেষ করে কালাচ সাপের কামড় এড়ানো যায়।

(২) অন্ধকার রাস্তায় না হাঁটাই সব থেকে ভালো। নিতান্তই যদি অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে হয় একটা লাঠি বা গাছের ডাল নিয়ে রাস্তায় ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ করে হাঁটলে সাপ রাস্তা থেকে সরে যায়।

(৩) সন্ধের পর রাতে একটি টর্চলাইট ও পা ঢাকা জুতো বহু বিপদ থেকে বাঁচায়।

(৪) বাড়ির আশেপাশে ঝোপঝাড় ও আবর্জনামুক্ত রাখা বেশি জরুরি।

ডাঃ নিমাইচন্দ্র মণ্ডল

সহকারী স্বাস্থ্য অধিকর্তা – স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লেখাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' আগস্ট, ২০১৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

আগে সাপে কাটা রোগী অযথা জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হত। বর্তমানে গ্রামীণ সমস্ত ডাক্তারদের প্রতি বছরই সর্পাঘাতের চিকিৎসার ব্যাপারে নিয়মিত ট্রেনিং এবং এই ব্যাপারে পুস্তিকা দেওয়া হচ্ছে। ফলে গ্রামীণ হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তাররাই সর্পাঘতের উপযুক্ত চিকিৎসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই করতে পারছেন।

মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতার মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব

এসএসকেএম হাসপাতালে অসুস্থ নবজাতক শিশুর পরিচর্যা ইউনিট।

এসএসকেএম হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে
মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫ অক্টোবর, ২০১৮। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্‌বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।